তন্ত্রাভিলাসী চিকিৎসক

ডাঃ সুবীর চট্টোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা-৭৩

□ প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৯

□ প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

□ কম্পোজ : রঘুনাথ প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

□ মুদ্রক : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং
২০৯ এ বিধান সরণী/ কলিকাতা- ৭০০ ০০৬

□ প্রচ্ছদ : প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা

তন্ত্র সম্পর্কে নয়, 'তন্ত্রাভিলাসী চিকিৎসক' বইটির ভূমিকা লিখছি। সুতরাং তন্ত্র বিষয়ে কিছু বলব না। বলার প্রয়োজনও নেই কারণ এই গ্রন্থে লেখক বিস্তারিতভাবে তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করেছেন। 'তন্ত্রাভিলাসী চিকিৎসক' নামটি যথার্থ। ডাঃ সুবীর চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত চিকিৎসক। মূলতঃ উনি স্নায়ু ও মনোরোগ চিকিৎসা করেন এবং কর্মসূত্রে কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে যুক্ত আছেন। ডাক্তারবাবু দীর্ঘকাল সাধনমার্গে বিচরণ ও এই বিষয়ে প্রচুর অধ্যয়ন, গবেষণা আর সেই সঙ্গে বহু সাধুসঙ্গ করেছেন। সুতরাং পরের মুখে ঝাল খাওয়া কিংবা কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা অথবা গালগল্প নয়। উনি বিধিসম্মত ভাবে বহুদিন তন্ত্রসাধনা করেছেন। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে সিদ্ধ ও যোগলব্ধ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, অবশ্য এ প্রসঙ্গও এখানে আলোচ্য নয়।

বাংলা ভাষায় তন্ত্র, যোগ ও অধ্যাত্ম বিষয়ে বইয়ের অভাব নেই। তবে সেগুলো হয় নিরস শাস্ত্রীয় পুস্তক কিংবা তন্ত্র, যোগ ও অধ্যাত্মতত্ত্ব মেশানো রসালো আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে শাস্ত্র ও রসের অপরূপ মিলন হয়েছে। ঘটনাগুলিও চমকপ্রদ, রোমাঞ্চকর ও অনেক ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। কিছু কিছু অংশ আপাতবিচারে অশ্লীল মনে হতে পারে কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের অভিধানে অশ্লীল শব্দটির কোন স্থান নেই।

এই গ্রন্থে তন্ত্র ছাড়াও অন্যান্য সাধন, ভারতীয় দর্শন, বেদ, বেদান্ত, গীতাতত্ত্ব, রাজযোগ, সমাজবিদ্যা, মনস্তত্ব, পরামনোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, চিকিৎসা ও অধ্যাত্মবাদের অনেক জটিল বিষয় খুব সহজে, সংক্ষেপে ও সাবলীল ভাষায় জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক। এ বড় কম কৃতিত্ব নয়। পৌরাণিক কাহিনীর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ এ পুস্তকের একটি সম্পদ।

'তন্ত্রাভিলাসী চিকিৎসক' বাংলাভাষায় এক অতি মূল্যবান বলিষ্ঠ সংযোজন। গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ হলে বিশ্বজুড়ে আলোড়নের সৃষ্টি হবে।

পরিশেষে একটা কথা, আজ অবধি আমি যে কটি স্বল্পসংখ্যক ভবিষ্যৎবাণী করেছি তার একটাও মিথ্যে হয়নি। 'তন্ত্রাভিলাসী চিকিৎসক' সম্পর্কে বলছি, বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাবে ও এর বহুল প্রচার অবশ্যম্ভাবী।

স্বামী শিবাত্মানন্দ

বইটিতে বর্ণিত ঘটনাবলী নিছক বানানো গল্প নয়। যা কিছু দেখেছি, শুনেছি, জেনেছি ঠিক সেই ভাবেই ভাষা ও ঘটনা অবিকৃত রেখে লেখার চেষ্টা করেছি; সে কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো কঠিন, কোথাও বা খানিকটা নিরস আবার কোন স্থানে একটু আধটু তথাকথিত অশ্লীল হলেও হয়ে থাকতে পারে কিন্তু কোন সময়ই তা মাত্রা ছাড়ায়নি। ক্ষেত্রবিশেষে নাম-ধাম গোপন, পরিবর্তন বা প্রকৃত স্থানের উল্লেখ এড়িয়ে যাওয়া, এগুলো করতে হয়েছে বিশেষ প্রয়োজনে। লেখা আকর্ষণীয় করার জন্য অংশ বিশেষ কল্পনাশ্রয়ী।

পরম শ্রদ্ধেয় পরিব্রাজক শ্রীমৎ স্বামী শিবাত্মানন্দ গিরি মহারাজজী কিছুদিন আগে এসেছিলেন। উনি উচ্চশিক্ষিত, পন্ডিত, গবেষক ও তন্ত্রসাধক। 'তন্ত্রাভিলাসি চিকিৎসক' -এর পাণ্ডুলিপিটি পড়ে উনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনুরোধ করতে করুণা পরবশ হয়ে অমূল্য ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন।

'তন্ত্রাভিলাষী চিকিৎসক' -এর পাণ্ডুলিপিটির আদ্যপ্রান্ত প্রতিলিপি ও প্রয়োজনীয় কিছু কিছু সংশোধন করেছে 'দেহ মন আত্মা' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়।

সুধীর চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

চিকন কালো রূপা সুন্দরী

চিকন কালো রূপা সুন্দরী
ত্রিপুরারি হৃদি মাঝে বিহারে...

আমার দিকে চোখ পড়তেই উদাত্ত কণ্ঠের গান থেমে গেল। রাগে ফেটে পড়লেন তান্ত্রিকাচার্য! "হারামজাদা কে তুই? এখানে এলি কি করে?"

কি করে যে এখানে এলাম সেই ফিরিস্তি দিতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। এ তান্ত্রিকের খবর এ তল্লাটে কারো অজানা নয়। কিন্তু ভয়ে কোনো মানুষ ওঁর ডেরার ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে তান্ত্রিকের আশ্রম ঘিরে অবাধে বিচরণ করে শিবাকুল, বিষধর সাপের দল, অজস্র জন্তু জানোয়ার, হরেক রকম চেনা অচেনা পাখি আর নানা জাতের পোকামাকড়।

তান্ত্রিক সর্ম্পর্কে অনেক কিছু জনশ্রুতি। উনি নাকি পিশাচসিদ্ধ। যাবতীয় সিদ্ধাই ওঁর করায়ত্ত্ব। প্রচণ্ড অলৌকিক ক্ষমতা। তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্মে সিদ্ধহস্ত (মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ ও শান্তিকর্ম) কারো ওপর চটে গেলে তার আর রক্ষে নেই। তে রাত্তির পোয়াতে না পোয়াতেই তাকে অপঘাতে পরপারে পাড়ি দিতে হবে।

তান্ত্রিকের খোঁজ করতেই গ্রামের মানুষ জড়ো হয়ে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনালেন, যত রকমের ভীতিপ্রদ হওয়া সম্ভব সে ভাবেই। কিন্তু আমার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে এক মোড়ল গোছের বুড়ো মানুষ হাত জোড় করে বললেন "হেই বাবু, ঐ ন্যাংটা কালীর দিব্যি, যাবিক নাই ওদিক পানে। জান নিয়ে ফিরতে পারবিক নাই। ঐ গুনিন তোকে গাপ্ করি দিবেক।"

ভাষা শুনে বুঝতে অসুবিধে নেই এটা মেদিনীপুর জেলার একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল। তান্ত্রিকের নিষেধ আরোপিত তাই প্রকৃত জায়গার উল্লেখ গোপন রাখতে হলো।

"ন্যাংটা কালীর দিব্যি" কথাটার কিছু তাৎপর্য আছে। তান্ত্রিকের আরাধ্যা কালী কোনো মৃন্ময়ী মূর্তি নয়। সে এক অপরূপা সুন্দরী কৃষ্ণবর্ণা যুবতী। লোকে বলে সে তান্ত্রিকের ভৈরবী। তান্ত্রিক ওকে কালী জ্ঞানে পুজো করেন। মেয়েটি নাকি সর্বদা উলঙ্গিনী থাকে। আর সে জন্যই ন্যাংটা কালী নামেই এ অঞ্চলে পরিচিতা।

পাণ্ডব বর্জিত নগ্ন-নির্জনে চিরনগ্না এক কুমারী যুবতী স্বচ্ছন্দে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ঐ লোভনীয়া মেয়েটিকে ভোগ করার ইচ্ছে কি কারো হয় না!

"তিনটে ছোঁড়া যুক্তি করি ফূর্তি মারতে গেছিল একদিন...তান্ত্রিক হেঁই হাঁক পাড়তেই তিনটেরে ভূতে ঘাড় মটকে দিছেক। ফূর্তি ঘুচিছেক জন্মের শোধ" —এই রকম এক-আধটা নয়, অনেক কাহিনীই গ্রামবাসীরা শুনিয়েছে আমাকে।

মোদ্দা কথা জীবিত মানুষ বলতে ওখানে তান্ত্রিক আর ঐ ন্যাংটা কালী। কৃষ্ণকায়া

সুন্দরী যুবতীটির রূপযৌবন আগলে রেখেছে অশরীরী ভূতপ্রেতের দল, যারা তান্ত্রিকের হাতের পুতুল। তান্ত্রিকের মুখের কথা খসতে না খসতেই কাজ। বাপ্‌রে বাপ্ অমন ভয়ঙ্কর তান্ত্রিককে ঘাঁটায় কার সাধ্যি!

তান্ত্রিক মাঝ-বয়সী। সুঠাম দেহ, মুখ ভর্তি সাদা কালো দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। মাথায় জটা। উদাত্ত কণ্ঠে প্রায় চেতনাতীত আমেজে গাইছিলেন রামপ্রসাদের প্রেমউদ্বেল ভক্তি-সংগীত 'চিকন কালো রূপা সুন্দরী....'।

সামনের বেদীতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ন্যাংটা কালী। নিথর দেবী মূর্তি যেন। বেদী ঘিরে প্রচুর মড়ার খুলি, অজস্র হাড়গোড়। সিঁদুর মাখানো। চতুর্দিকে নানা ধরনের ফুল। রক্তজবা, করবী, অপরাজিতা, আকন্দ, গন্ধরাজ, বেল, টগর, যুঁই আরো কত বুনোফুল। বেলপাতা। মস্ত লম্বা মাটির পিলসুজে প্রমাণ সাইজের একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে অনির্বাণ। ধূপধূনোর মিষ্টি মাদক গন্ধে চারদিক আমোদিত। হাতে তৈরি পাতায় ছাওয়া ছোট একটা মাটির কুঁড়ে ঘর, তান্ত্রিকের আশ্রম কাম মন্দির।

তান্ত্রিকের রঙ ফরসা। পরনে লাল পট্টবস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চোখদুটো ভাঁটার মতো। মুখশ্রী মন্দ নয়। কিন্তু প্রচণ্ড উগ্র।

ফিরে আসি প্রথম পর্যায়ে। তান্ত্রিক ভীষণ রেগে আমায় যেন চিবিয়ে খেতে এলেন; "হারামজাদা কে তুই? এখানে এলি কি করে? এতটা দুঃসাহসই বা কি করে হয়!"

সাপের মন্ত্র না জেনে সাপ ধরতে যাওয়া আর যমের মুখে মুণ্ডু ঢোকানো একই ব্যাপার—এটুকু আপ্তবাক্য জানব না এরকম কাঁচা বুদ্ধির লোক আমি নই, সুতরাং যে নামমন্ত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছি সেটা উচ্চারণ করতেই তান্ত্রিক— সর্পের উদ্ধত ফণাটি একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। অবশ্য ভয়ে নয়, বিস্ময়ে।

তান্ত্রিক হাঁ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ও তোকে পাঠিয়েছে? আমি যে এখানে আছি সেটা জানলই বা কি করে?" মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে একেবারে শান্ত স্বরে বললেন, "যাকগে! সাধকদের পূর্বাশ্রমের কথা স্মরণ করতে নেই"। এটা ওঁর স্বগতোক্তির মতোই শোনাল।

যিনি আমাকে এই তান্ত্রিকের সন্ধান দিয়েছেন তিনি দিল্লীর নামজাদা এক ডাক্তারবাবু। কর্মসূত্রে আলাপ। আমি তখন দিল্লী মেণ্টাল হাসপাতালের চিকিৎসা আধিকারিক। আমার তন্ত্রচর্চার ঝোঁক দেখে উনি বলেছিলেন, "আমার এক সহপাঠী বন্ধু, এক সঙ্গেই ডাক্তারি পাশ করেছি, একই বিষয়ে দুজনে পোষ্ট গ্রাজুয়েট করেছি স্পেশালিষ্ট হয়েছি। তারপর..."

সে এক চমকপ্রদ রহস্যময় কাহিনী। উপন্যাসকেও হার মানায়। এক ডাক্তারের তান্ত্রিকে রূপান্তরিত হওয়ার দীর্ঘ রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। সময় সুযোগ পেলে আমি বিস্তারিতভাবে লিখব। সেই কাহিনী যদি চিত্রায়িত হয় তা হলে বাংলা ছায়াছবির বন্ধ্যা দশা ঘুচে যাবে।

যাই হোক, বলব বা বলব না করেও ডাক্তার-তান্ত্রিক তাঁর পূর্বাশ্রমের বেশ কিছু

ঘটনা বলেছিলেন, তার মধ্যে ঠিক যেটুকু এখানে প্রয়োজন ঠিক সেটুকুই ওঁর ভাষাতেই লিখছি—

সাইকিয়াট্রিষ্ট হিসেবে প্র্যাকটিশ শুরু করেছিলাম। চাকরি ধাতে পোষায় না। প্রাইভেট চেম্বার খুলেছিলাম তিন জায়গায় ও মহকুমা শহরের এক বন্ধুর নার্সিং হোমে যুক্ত ছিলাম।

চিরকাল খেয়ালী মানুষ। বিয়েথা করিনি। যা রোজগার হতো মোটামুটি চলে যেত। সাধুসঙ্গের ইচ্ছা ছিল প্রবল আর সেই সঙ্গে তন্ত্রসাধনার ঝোঁক। ডাক্তারি আর সাধক সঙ্গ নিয়েই থাকতাম। ...ঐ ন্যাংটা কালীকে দেখতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। পরিণামে ডাক্তারি ছেড়ে ওকে নিয়ে নিভৃতে তন্ত্রসাধনা।

ও অবশ্য তখন ন্যাংটো ছিল না। ফ্রক পরতো। শ্যামলিনী ফুটফুটে কিশোরী। শুনেছিলাম ঐ গ্রামের এক মেয়ের নাকি কালীর ভর হয়। গ্রামবাসী ওকে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করত।

আমি গ্রামের লোকেদের বুঝিয়ে দিলাম কালীর ভর টর কিছু নয়, এটা এক ধরনের হিস্টিরিয়া জাতীয় বায়ুরোগ, মনোবিকার।

মুশকিল হলো এই, যে মেয়ে এতদিন দেবীরূপে পুজো পেয়ে আসছিল রাতারাতি সে হয়ে উঠল ঠাট্টাতামাশার পাত্রী। দেবী থেকে একেবারে পাগলি নামে অখ্যাতির চূড়ান্ত। মেয়েটির জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সে এসে দৌড়ে পড়ল আমার পায়ের ওপর, "তোমার জন্যেই আমাব এই দুরবস্থা। তুমি আমায় বাঁচাও"। শেষে নিরুপায় হয়ে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে গেলাম। তারপর চিকিৎসা ছেড়ে একেবারে পাকাপোক্তভাবে তন্ত্রমন্ত্রের জগতে। মেয়েটিকে কালী জ্ঞানে ভৈরবী হিসেবে গ্রহণ করলাম।

তন্ত্রের মূল সাধনা মধুর ভাব, অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি। সহজ কথায় দেবীকে নিজের প্রেমিকা বা স্ত্রী রূপে চিন্তা।

তান্ত্রিকের কাছে আমি দিন সাতেক ছিলাম। তন্ত্র সম্পর্কে ও তন্ত্র সাধনার অনেক গভীর রহস্য আমি ওঁর কাছে জেনেছি। কঠোর ভাবে নিষেধ আছে তাই ওঁর ভৈরবী (কালী) পূজা ও সাধনার গোপন ব্যাপারটি আমি জানাতে পারব না। ঐ মহাজ্ঞানীর কাছে কালী সম্পর্কে যে দুর্লভ তথ্য জেনেছিলাম তার কিছু কিছু এখানে লিখছি।

অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড রাজদন্তাগ্রকে শিবে
স্থাথ্য শূন্য লয়ং কৃত্বা কৃষ্ণবর্ণং বিধায়চ

এই শ্লোকের সরল অর্থ এই রকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে কালী হলেন ধ্বংসের দেবী। তিনি সংহারিণী রূপে তাঁর ভয়ঙ্কর দন্তের দ্বারা কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করছেন। এই ধ্বংসের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ যা অবশিষ্ট থাকে তা শূন্য ও অন্ধকার।

কালীকে কৃষ্ণবর্ণা হিসেবে কল্পনা করার কারণ হয়তো এই। অর্থাৎ তিনি মহাকাল। পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কালে সমস্তই বিনষ্ট হয়।

এই মহাবিশ্বে মহাশূন্যে পঞ্চাশটি শূন্য ও পৃথিবী বিরাজমান। কালিকা দেবী আদিতে আদ্যাশক্তিরূপে অবস্থিতা।

এই পৃথিবী ত্রিগুণাত্মিকা (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সেজন্য কালিকা দেবী ত্রিগুণময়ী। কালিকা পুরাণ মতে কালী হলেন শিবের আদ্যাশক্তি (হ্লাদিনী শক্তি), সে জন্য কালীকে শিবা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শিব শুভ্রবর্ণ। সত্ত্বগুণের প্রতীক। কালীর কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে রয়েছে তমোগুণের আধিক্য। শিব নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ও নিরাকার। কিন্তু যখন তাঁকে সাকার ও সগুণ (সক্রিয়) ভাবা হয়েছে তখন তাঁর আদ্যাশক্তি স্থান পেয়েছে নিজ বক্ষেই। বক্ষ হতে নির্গত আত্মশক্তি আবার বক্ষেই প্রকটমান। এ কারণেই কালিকা দেবীর পদ শিববক্ষে স্থাপিত। আবার আত্মশক্তি দেহ থেকে নির্গত হওয়ার ফলে শিবদেহ পরিণত হল 'শব' -এ। এ প্রসঙ্গে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

শিব শক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভাবিতুম
নো চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমতি

এর অর্থ এই, শিব শক্তি যুক্ত না হলে তিনি শববৎ এবং চলচ্ছক্তিহীন।

মহাকালের অমোঘ নিয়মে যা লয় পায় তাই শব। অর্থাৎ তমোগুণ প্রধান এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই এক বিশাল শব। এই যে পৃথিবী সে হচ্ছে কল্প মায়া কিংবা মায়া কল্পিত। কালক্রমে মহাপ্রলয়ে একদিন পৃথিবী ধ্বংস হবে।

শবের (শিব) বক্ষে কালীর শ্রীচরণ (প্রধানতঃ দক্ষিণ পদ—দক্ষিণাকালী) রক্তবর্ণে রঞ্জিত। শবের বুকে পা রেখে মহাকালী মহাকালের চেতনা জাগ্রত করছেন। লাল রঙ রজোগুণের প্রতীক। কালীসাধক ভক্তিভরে দেবীর শ্রীচরণ চিন্তায় মগ্ন হলে তার তমোভাব খণ্ডিত হয়ে রজোগুণ বৃদ্ধি পাবে। কালিকাদেবী তাঁর রক্তবর্ণ লাল জিহ্বা (রুদ্র) শ্বেতশুভ্র দন্ত দিয়ে কর্তন করছেন। এই চিন্তায় রজোগুণের সাধকদের সাত্ত্বিক গুণ বাড়বে। তখনই মহামায়া কালিকা দেবী সাধকের রজোগুণ বিনাশ করে চতুর্বর্গ ফল (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) প্রদান করবেন। তা যদি না হয় তবে দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ সাধকের মুন্ড ছেদন করবে এবং ওঁর কণ্ঠের মুন্ডমালার মতো সাধককে বার বার চক্রাকারে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে কষ্ট ভোগ করতে হবে।

কালিকা দেবীর আলুলায়িত মেঘপুঞ্জের মতো কালো কেশ অনন্তমায়ার প্রতীক এবং দেবীর কটিদেশস্থিত নরহস্ত-নির্মিত মেখলার অর্থ কি? হস্ত কর্মশক্তির প্রতীক। ভাল বা মন্দ যে কোনো কর্ম অর্থাৎ ভাল খারাপ কাজ যে যাই করুক না কেন তা মহাকালের গর্ভে নিহিত থাকে।

কালী কে? তিনি মহাকাল অর্থাৎ অনন্ত সময়। যা কিছু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই মহাকালীর রূপের মধ্যে বিরাজ করছে। সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস (প্রলয়), চৈতন্যময় ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ এবং বিনাশ যে ঐ একই শক্তির ভিন্নতর লীলা এবং তা বিশ্বকে বৈচিত্র্যময় রাখার প্রয়োজনে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে।

ধ্বংসকে অনিষ্ট বা অমঙ্গলকর ভাবলে চলবে না। কারণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই রয়েছে সৃষ্টির প্রেরণা। প্রলয়ের মধ্যেই অতুলনীয় সৌন্দর্য, করুণা, মহিমা আর সেই মহিমামণ্ডিত

করুণাময়ী ধ্বংসের দেবী মহাকালী। সুতরাং নিধনের মধ্যে সৃষ্টির বীজ রয়েছে ঐ কালী রূপের মধ্যেই।

কারো কারো মতে চতুর্ভূজা কালিকা দেবীর দুটি হাত পালন ও দুটি হাত নিধনের প্রতীক। অবশ্য কালী মহাকাল, প্রকৃত অর্থে ধ্বংসেরই দেবী। এই মহাকাল সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিশ্বরূপ দর্শন যোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ

আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল। এখন লোকসমূহকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।
কালীর দুটি হাতের (বামদিকের) একটিতে খড়্গ ও অপরটিতে ছিন্ন নরমুন্ড (অসুরের মুন্ড)। এই দুটি নিধনের প্রতিচ্ছবি। ডানদিকের হাতদুটিতে বর ও অভয় মুদ্রা। এখানেই দেবীর কল্যাণময় নারীমূর্তির প্রচ্ছন্ন রূপ। কি আশ্চর্য মূর্তি! পরস্পর বিরোধী দুটি ভাবের অপরূপ সমন্বয়। একদিকে আঘাত অন্যদিকে সান্ত্বনা। একদিকে ভীতি অন্যদিকে অভয়।

কালিকা দেবীর কণ্ঠদেশে পঞ্চাশৎ মুন্ডমালা সুশোভিত। মুন্ড কি? মানবদেহের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতঙ্গ, জ্ঞানশক্তির মূর্ত প্রতীক। এই পঞ্চাশটি মুন্ড পঞ্চাশৎ বর্ণ ও শব্দব্রহ্মের প্রতীক। আগেই বলেছি কালীর এলায়িত কালো কেশ অন্ধকারের মতোই রহস্যাবৃত অনন্তমায়া। এ মায়া দুর্বোধ্য। দেবীর এই অলৌকিক মায়া (মহামায়া, বিষ্ণুমায়া, ভগবতী মায়া) সর্ম্পকে শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

অথো ভগবতী মায়া দুর্বোধ্য বিজিতাত্মনাম
বিমোহয়ন্তি সংসারে নানাত্বাৎ ইন্দ্রজালবৎ

এই শ্রীময়ী মায়া দেবতাদেরও দুর্জ্ঞেয়। এই মায়া সংসারে মানুষকে নানাভাবে ইন্দ্রজালের মতো বিমোহিত করছে। এ এক চির রহস্যাবৃত অধ্যায়।

কালী কৃষ্ণবর্ণা। সমস্ত বর্ণ মানে সূর্যের মূল সাতটি বর্ণ। বেগুনি, নীল, আসমানী, সবুজ, কমলা ও লাল, কালিবর্ণের (কালো) মধ্যেই লয় পাচ্ছে। সাদা হচ্ছে মিলিত বর্ণসমষ্টি। কালো হলো বর্ণের অভাব। সুতরাং মহাকালীরূপিণী মহামায়া কালিকা দেবীর মসীবর্ণ মানে আঁধার বর্ণ প্রকৃত রঙ। পূর্বকল্প অবসানের পর ভগবান বিষ্ণু যখন কারণ সমুদ্রে অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন তখন বিশ্বব্রহ্মান্ড কি অবস্থায় ছিল? এ সম্পর্কে ঋক্‌বেদ বলছে ঃ

'তমো আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে'

আদিতে একমাত্র অন্ধকারই প্রকাশমান ছিল নিবিড়ভাবে। সেই অনাদি অন্ধকার আর সেই অন্ধকারের ঘনীভূত রূপ মহামায়া কালিকা দেবীই আদ্যাশক্তি। তবে এ রঙ কি প্রকৃত কালো?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবসুলভ সরল ভাষায় বলতেন, "কালী দূরে তাই কালো। আকাশ অনেক দূরে বলেই নীলবর্ণ। কাছে এলে সে বর্ণহীন।" তেমনি কৃষ্ণবর্ণা কালিকা দেবী সাধকের হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিতা হলে তিনি বহুবর্ণা। সে বর্ণ সাধকের নিজ মনোময় জগতের বিবিধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণময় হয়। কালী মহাকাল। অনন্ত সময়। তিনি

দিগম্বরী। দিক্ অর্থাৎ দূরত্ব, সেই মহামায়া মহাকাল মূর্তিকে দেশ কালের কোনো গন্ডীতেই সীমাবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। তাই তিনি উলঙ্গিনী।

দেবী ত্রিনয়না। বাম নয়ন চন্দ্র, ডান নয়ন সূর্য, কপালে শোভিত তৃতীয় নয়ন অগ্নি। এই তিন নয়নে তিনি ত্রিভুবন দর্শন করেন।

কলানাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ
মহাকালস্য কলানাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরাঃ
— মহানির্বাণ তন্ত্র

যিনি প্রাণীসমূহকে গ্রাস করেন তিনি মহাকাল। তুমি মহাকালকেও গ্রাস কর তাই তুমি আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি কালিকা।

এই শ্লোক থেকে মনে করা যেতে পারে যে কালী ধ্বংসের দেবী তবে এইসঙ্গে এটাও চিন্তা করা যায় যে সৃষ্টির আগেও কেবলমাত্র ইনিই বর্তমান ছিলেন। বিশ্ব অর্থাৎ ইনিই ব্রহ্মান্ড-প্রসবিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া।

শ্রীশ্রী চন্ডীতে বর্ণিত আছে দেবীশ্রেষ্ঠা দুর্গার থেকেই কালীর সৃষ্টি হয়েছে। দেবতাগণ মহাপরাক্রমশালী অসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভর কাছে পরাজিত হয়ে সেই মহাদেবী দুর্গার স্তব ও স্মরণ করছিলেন। তখন দেবী ভগবতী দুর্গা মন্দাকিনীর (গঙ্গা— স্বর্গে গঙ্গার নাম মন্দাকিনী) জলে স্নান করতে এলেন। দেবতাদের স্তব শুনে দুর্গাদেবীর দেহকোষ থেকে শিবা নির্গতা হলেন। যেহেতু ইনি পার্বতীর দেহকোষ-নির্গতা তাই তিনি বিশ্বচরাচরে কৌশিকী নামে অভিহিতা। এই কৌশিকী দেবী পার্বতীর দেহকোষ হতে নির্গতা হলে পার্বতী (দুর্গা) কৃষ্ণবর্ণা হলেন। ইনিই কালিকা নামে প্রসিদ্ধা অর্থাৎ দেবী দুর্গার এই রূপই কালী এবং তিনি হিমালয়বাসিনী।

শরীরকোষাদ কত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃততাম্বিকা
কৌষিকীতি সমস্তেষ্ ততো লোকেষু গীয়তে
তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষাভূৎ সাপি পার্বতী
কালীকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল কৃতাশ্রয়া

তারপর সেই দেবী অতি অপরূপ নারীমূর্তি ধারণ করলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের দুই অনুচর চন্ড ও মুন্ড দেবীকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে শুম্ভকে গিয়ে বলল, "মহারাজ, হিমালয়ে এক অতি সুন্দরী রমণীকে দেখলাম। অমন উৎকৃস্ট রূপ কেউ কখনো দেখেনি। অসুররাজ আপনি এই মহিলাকে জানুন ও গ্রহণ করুন।"

চন্ড-মুন্ডের কথা শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে অসুরাধিপতি শুম্ভ সুগ্রীব নামে এক দূতকে দেবীর কাছে পাঠালে সেই দূত বহুমুখে শুম্ভের ঐশ্বর্য ও পরাক্রম এবং শৌর্যবীর্যের বর্ণনা দিয়ে দেবীকে শুম্ভের পাণিপ্রার্থী হতে অনুরোধ করল। সমস্ত কিছু শুনে দেবী দুর্গা মুখে বেজায় গাম্ভীর্য এনে মনে মনে হাসতে হাসতে বললেন, "দেখো দূত, তুমি যা বলছ তা মিথ্যে নয়। তোমাদের দৈত্যরাজ ত্রিলোকাধিপতি বটে। কিন্তু মুশকিল হলো

নিজের অল্পবুদ্ধির জন্য আমি আগেই একটা প্রতিজ্ঞা করেছি। যিনি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করবেন, যিনি আমার এই দর্প হরণ করবেন, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার মতো শক্তিশালী হবেন, আমি তাঁকেই পতিত্বে বরণ করব।"

কিন্ত্বত্র যৎ পতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুর
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পয় ব্যাপোহতি
যো সে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি

দূতের মুখে দেবীর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য শুনে দৈত্যরাজ শুম্ভ ক্রোধে আত্মহারা হলো। ক্রমশঃ নানা ঘটনাচক্রের পর দৈত্যরাজের আদেশে চন্ড ও মুন্ড বিশাল সৈন্য নিয়ে দেবীকে বলপূর্বক হরণ করতে এল।

তখন দেবী দুর্গা সসৈন্য চন্ড-মুন্ডের প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হলেন। ক্রোধে তাঁর মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল ললাট দেহ হতে ভীষণদর্শন ভয়াল ভয়ঙ্কর কালিকা দেবী দুই হাতে অসি ও পাশ ধারণ করে দ্রুত নির্গতা হলেন। সেই কালিকা দেবী অতীব ভীষণা, ভয়ঙ্করী। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা। তার গাত্রমাংস শুষ্ক। তাঁর বদন বহুদূর বিস্তৃত। তিনি লোলজিহ্বা, ভীষণাকৃতি, বিচিত্র নরকপালধারিণী, নরমুন্ডমালা বিভূষিতা। তাঁর আরক্ত নয়নদ্বয় কোটরাগত। তিনি প্রচন্ড গর্জনে দিগন্ত পরিপূর্ণ করলেন।

ভ্রুকুটী কুটিলাস্যা ললাট ফলকাদ্ দ্রুতম
কালী করালবদনা বিনিস্ক্রান্তাসিপাশিনী
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা
দ্বীপিচর্ম- পরীধানা সুস্কমাংসাতি ভৈরবা
অতি-বিস্তার-বদনা জীহ্বাললনা ভীষণা
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদ্বিস্মুখা

অতঃপর সেই কালিকা দেবী মহাযুদ্ধে চন্ড-মুন্ডকে পরাজিত ও ঐ অসুরদ্বয়ের মুন্ড ছেদন করে উন্মাদিনীর মতো প্রলয় নৃত্য শুরু করলেন। তাঁর পদভরে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল প্রচন্ড ভাবে কেঁপে উঠল। যদি স্বর্গরাজ্য ধবংস হয় -এই ভয়ে ভীত হয়ে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান বিষ্ণু অমরাগণকে জানালেন যে একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব ছাড়া কালীর ঐ ভয়ঙ্করী ধ্বংসাত্মক নৃত্য কারো পক্ষেই থামানো সম্ভব নয়। দেবতারা ছুটলেন সদাশিব ভোলা মহেশ্বরের কাছে। যোগীশ্বর তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। দেবতারা আর্তস্বরে বললেন, "প্রভু, আমাদের বাঁচান। উলঙ্গিনী দেবী মহাকালীর তান্ডব নৃত্যে সৃষ্টি রসাতলে যেতে বসেছে। আপনি ওঁকে শান্ত করুন।"

শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ করুণার্দ্র চোখে দেবতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন "তথাস্তু"। ধ্যান ভেঙে শিব এলেন অকুস্থলে। ছিন্নভিন্ন অসুরদেহ পদতলে মথিত করে উলঙ্গিনী উন্মাদিনী কালিকা দেবী নৃত্যরতা। আদ্যাশক্তি মহাকালীকে শান্ত করতে মহাদেব নিজ বক্ষ কালিকা দেবীর চরণতলে পেতে দিলেন। শিব-বক্ষে পদ রাখতেই দেবী সম্বিৎ ফিরে

পেলেন। এবং শায়িত শিবকে পদতলে দেখে লজ্জায় জিভ কাটলেন। শান্ত হলেন পাগলিনী। রক্ষা পেল সৃষ্টি।

কালীতন্ত্র মতে "কাল নিয়ন্ত্রণাৎ কালী তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়িণী"—কালী কাল— নিয়ন্ত্রক ও তিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন।

তন্ত্রশাস্ত্র কালিকা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় মুখর। এ তত্ত্ব কালী নির্ভর। কালীতন্ত্রের আর একটি শ্লোকে রয়েছে—

নহি কালী সমা বিদ্যা
নহি কালী সমং ফলং
নহি কালী সমং জ্ঞানং
নহি কালী সমং তপঃ

কালীর তুল্য বিদ্যা নেই। কালীর তুল্য ফলপ্রদ কেউ নেই। কালীর তুল্য জ্ঞান নেই। কালীর তুল্য তপস্যাও নেই।

কালী কিন্তু সদা উগ্ররূপিণী নন। ওর শান্ত রূপের বর্ণনাও পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মার্কন্ডেয় পুরাণে কালী উগ্রচন্ডা কিন্তু বিষ্ণু ধর্মোত্তরে কালীর যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি শান্ত। উগ্র হোন বা শান্তই হোন কালিকা কিন্তু সদা সুন্দরী।

'মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম'

এই শ্লোকটির অর্থ উপরে কালী (নারী) নিম্নে শিব (পুরুষ) রূপ অবস্থান করছেন। এটি কামচিন্তা ও বিপরীত মৈথুন ক্রিয়ার রূপ কল্পিত হয়েছে এইরকম ভাবলে ভুল হবে। পরম পুরুষ (শিব) হলেন বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং দ্বৈতভাবে শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে পরা প্রকৃতি (মহাকালী)। এই প্রকৃতি, পুরুষের বিপরীতে সংযুক্তা হয়েছিলেন যখন সৃষ্টির প্রয়োজনে, ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) ভারসাম্যের অবস্থা নষ্ট হয়েছিল। পুরুষের (শিব) বিপরীতে সংস্থাপিতা বলেই প্রকৃতির (কালী) এই মূর্তি বিপরীতরতাতুরা ভাব উদ্দীপক।

ব্রহ্ম জড়স্বরূপ। চেতনা তার শক্তি। সুতরাং কালীমূর্তি সেই শিবশক্তির দ্বৈত লীলার রূপ। কিন্তু কালীরূপ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রকৃতি থেকে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে সেই পঞ্চভূতাত্মক বিভিন্ন বস্তুর রূপ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু যিনি জ্যোতিঃস্বরূপিণী, যিনি ব্রহ্মান্ডপ্রসবিনী অর্থাৎ যাঁর থেকে এই ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার রূপ কল্পনা কি ভাবে সম্ভব ? এ প্রসঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব মহানির্বাণ তন্ত্রে বলেছেন ঃ

অপরূপা কালীকায়া ঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতে
গুণক্রিয়াসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা

কালিকা দেবী অরূপা, নিরাকারা, তিনি মহাকালও। মহাজ্যোতির্ময়ী। গুণক্রিয়া (ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) অনুসারে তাঁর কার্যকারণ (সৃষ্টি, স্থিতি, লয়) অনুযায়ী তাঁর রূপ সমূহ কল্পনা করা হয়েছে।

প্রকৃত অর্থে তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই, প্রাকৃত কোন মূর্তিও নেই। তিনি নিত্যা। দেবগণের পরিত্রাণ (অসুর নিধন) ও নানা কার্যসিদ্ধির জন্য ভগবতী মহামায়া যখন কোন দিব্যরূপ ধারণ করেন তখনই তাঁর উৎপত্তি বা লয় হল, এরকমই বলা হয়ে থাকে। আসলে প্রয়োজনে সেই আদি শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন অর্থাৎ শক্তির রূপান্তর হয়।

দেবনাং কার্য্যাসিদ্ধর্থমাবির্ভবতি মা যদা
উৎপেন্নি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যধায়তে

—শ্রীশ্রীচন্ডী

কিংবা শ্রীশ্রীচন্ডীর অন্য একটি শ্লোকেও (মন্ত্র) এর সমর্থন মেলে ঃ

ইত্থং যদা যদা বাধা দানোবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদাবতীর্নহং করিস্যাম অরিসংক্ষয়ম

যখনই অসুর (দানব) গণ সৎকার্যে বাধা সৃষ্টি করবে তখনই আমি আবির্ভূত হয়ে শত্রু (অরি) বিনাশ করব।

তেমনি চন্ড ও মুণ্ড অসুরদ্বয়ের বধের সময় মহামায়ার কালীমূর্তি ধারণ।

ঘোর তমোগুণা কৃষ্ণবর্ণা দেবীর পদতলে শায়িত সত্ত্বগুণের আধার শুভ্রবর্ণ শিব।

মানুষের মনোজগতে যে সমস্ত সাংঘাতিক প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় সেই প্রবৃত্তি যদি কৃষ্ণকায়া কালী হন তবে মহাজ্ঞানরূপী আমাদের যে অন্তরাত্মা তিনিই শ্বেতবর্ণ শিব।

কালীর জিহ্বা কর্তন কার্যত বিহ্বল অবস্থার কল্পিত মূর্তি। অজ্ঞান জীবের হঠাৎ জ্ঞানরূপ আত্মা দর্শনে হতচকিত অবস্থা। সেই জ্ঞানস্বরূপ অন্তরাত্মাকে দর্শন করতে হলে অর্থাৎ তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধির জন্য যে সমস্ত শক্তির প্রয়োজন (বৈরাগ্য, প্রজ্ঞা, প্রেম ইত্যাদি) সেগুলো আমাদের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু অজ্ঞান মানুষ তার অহং বুদ্ধির মোহে কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা ইত্যাদি ষড়রিপু ও আটটি পাশে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে কালিমালিপ্ত করে রেখেছে। সেইজন্য কালীকে যদি রিপুময় মন হিসেবে কল্পনা করা যায় তবে তাঁর চরণতলে শায়িত রয়েছেন নির্মল জ্ঞান ও আত্মাস্বরূপ দেবাদিদেব শিব। মনের ময়লা দূর হলে সে শুভ্রবর্ণ ধারণ করবে। তবে তা সময় ও সাধন সাপেক্ষ। তাই কালী মহাকাল ও ভৈরবীরূপিণি।

যেমন মানুষের মন, নানাবিধ বিষয়আষয় ভোগ ও কামনা বাসনা চরিতার্থ করেও সেগুলোকে ছাড়তে না পেরে আঁকড়ে রাখতে চায় কালীও অসুরদের রক্ত, মাংস ইত্যাদি পান-ভক্ষণ (ভোগ) করেও অবশিষ্ট ভোগ্যবস্তু (হস্ত, মুন্ড) তাঁর অঙ্গে ধারণ করে রেখেছেন।

শিবের বুকে পা পড়তে কালী লজ্জায় জিভ কাটছেন। কালী হচ্ছেন মন। শিব আত্মা স্বরূপ। মন সদা চঞ্চল ও বহির্মুখ। সে বৃত্তি-প্রবৃত্তিতে পরিবেষ্টিত হয়ে জাগতিক সুখ-

ভোগের নেশায় বীভৎস আনন্দে নৃত্য করে চলেছে। তার অন্তরে যে আত্মা রয়েছে সে দিকে তার চোখই পড়ছে না। এই যে মায়াচ্ছন্ন মন (স্ত্রী) তার যদি ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি খুলে যায় তবে সে তার নিজ নির্মল আত্মাকে (পুরুষ—স্বামী) হঠাৎ দেখতে পেয়ে লজ্জায় জিভ কাটবে এই ভেবে যে ছিঃ ছিঃ কি মোহে এতকাল ভুলে অরূপরতনকে অবজ্ঞা করে এসেছি!

সাধনার দ্বারা অজ্ঞানের অন্ধকারকে খন্ডন করে জ্ঞানের জোতির্ময় আলোক-সরণীতে উত্তরণ ঐ কালী সাধনারই গূঢ় রহস্য।

এইবার কালী সম্পর্কে লৌকিক দিকেও একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। এক শ্রেণীর নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা কৃষ্ণবর্ণা কালী ছিলেন অনার্য উপজাতীয় প্রধানের কন্যা। কারো কারো মতে কালী সাঁওতালি মেয়ে। উগ্র প্রকৃতির মহিলা এবং আর্যবিদ্বেষী। সে আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বহু আর্য নিধন করেছিল। অসুর (অনার্য) —দের মুন্ডু কেটে কণ্ঠহার করেছিল এবং যাকে পদতলে পিষ্ট করছে সেই শ্বেতবর্ণ শিব আর্য জাতির প্রতীক।

এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতেও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের কিছু উক্তি চিন্তনীয়।

ডাক্তার— কালী তো একজন সাঁওতালি (মাষ্টারের উচ্চহাস্য)

মাষ্টার— একথা কোথায় আছে?

ডাক্তার— শুনেছি এইরকম (মাষ্টারের হাস্য)।

[প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা- ২০৮]

ডাক্তার— সাঁওতালদের হিষ্ট্রি পড়ে জানা গেছে যে কালী একজন সাঁওতালী মাগী ছিল। খুব লড়াই করেছিল (সকলের হাস্য)।

[চতুর্থ ভাগ, পৃষ্ঠা-২৪৩]

আবার কালী সম্পর্কে ইংরেজদের একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল। এক কৃষ্ণকায়া রমণী শ্বেতমানবের বুকে! লোলজিহ্বা খড়্গাধারিণী এবং ভয়াল ভয়ঙ্কর মূর্তি। তৎকালীন শ্বেতকায় শাসক শ্রেণীর ধারণা এটা হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদেব প্রতিচ্ছবি। কালী অর্থে কালা আদমি অর্থাৎ ভারতীয় আর শিব মানে শ্বেতকায় ইংরেজ। সুতরাং সাহেবরা ভেবেছিল শুভ্রবর্ণ ব্যক্তির বুকে চড়ে কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা, মানে ভারতীয়দের ইংরেজ বিদ্বেষের রূপক প্রতিচ্ছবি। এক সময় এই নিয়ে ব্রিটিশরা খুব ঝামেলা পাকিয়েছিল। কালী মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে ও কালীপূজা বন্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল। অতি কষ্টে ওদের বোঝানো গিয়েছিল যে এই ধারণাটি সঠিক নয়। কালী মূর্তির সৃষ্টি হয়েছে বহু শত বছর আগে যখন ইংরেজরা জ্ঞানের আলো দেখেনি। ওরা তখন উলঙ্গ হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। ভারতীয় আর্য সভ্যতার সূত্রপাত অনেক আগে। কালী অনার্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক। অবশ্য মূর্তি পূজা মাত্রই অনার্য সভ্যতার অঙ্গ, তবুও তারও সূত্রপাত ইংরেজ সভ্যতার ঢের আগে।

তান্ত্রিকের ডেরায় ছিলাম হপ্তাখানেক। সে সময় তান্ত্রিকের কাছ থেকে তন্ত্রসাধনা,

তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনেছি। এর মধ্যে কিছু কিছু আমার আগেই জানা ছিল তবুও তান্ত্রিকের মুখ থেকে নতুন করে শুনতে বেশ ভালই লেগেছে। আবার অজানা তন্ত্ররহস্যও জেনেছি অনেক।

তান্ত্রিক যে মহাজ্ঞানী ব্যক্তি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। উনি কঠোর সাধনাও করেছেন দীর্ঘকাল। শিবোক্ত পঞ্চমকার সাধনায় (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন ও মুদ্রা) সিদ্ধি লাভ করেছেন।

রাত্রে আমাদের আহার ছিল সামান্য কিছু মাংস, একটু সব্জী, ফলমূল। ছোটো ছোটো তিনটে আটার রুটি ও কারণ (মদ)। সেটা পান করা হতো মহাপাত্রে (মড়ার খুলির পাত্রে), অবশ্য পরিমাণে খুব অল্প। রাত্রের আহার সন্ধ্যায় পূজার পর সেরে ফেলা হতো।

খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় যে কোথা থেকে আসতো সে রহস্য কখনও উদ্ধার করতে পারিনি। তান্ত্রিককে জিজ্ঞেস করলে তিনি আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে দিতেন অর্থাৎ ঈশ্বর জোগাচ্ছেন। আর ন্যাংটা কালীকে ঐ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতো।

কারণ সেবনের পর তান্ত্রিক তন্ত্র সম্পর্কে বলে যেতেন একটানা ; অবশ্য তার আগে মৌজ করে এক ছিলিম গাঁজা টেনে নিতেন। তান্ত্রিক উপবেশন করতেন পদ্মাসনে। উদাত্ত কণ্ঠ। অপরূপ বাচনভঙ্গী, মনে হতো উপনিষদের কিংবা বৈদিক যুগের কোন মুনি-ঋষি চোখের সামনে রূপ ধরেছেন।

তান্ত্রিক যখন তন্ত্র বিষয়ে বলতেন ন্যাংটা কালী তখন ব্যস্ত থাকত নানা টুকিটাকি কাজে। ঐ একটা ঘরেই মন্দির ও গৃহস্থালীর যাবতীয় কিছু। চোখের সামনেই ঘুরত ন্যাংটো মেয়েটি। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে আমার দিকে তাকাতো আলতোভাবে, আনমনে। শূন্য দৃষ্টি। তান্ত্রিক বলে যেতেন আপন মনে। চোখ বুজে। তান্ত্রিকের কথা শুনতে শুনতে আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখতাম ন্যাংটা কালীর কাজকর্ম। উলঙ্গিনী সুন্দরী যুবতীর বিভিন্ন দেহভঙ্গিমার অপরূপ বিন্যাস আদিরসের ধারায় সিক্ত করতো আমার মন।

ঠিক রাত বারোটায় তান্ত্রিক গিয়ে ঢুকতেন সামনের জঙ্গল পেরিয়ে ছোট একটা ঝুপড়িতে। বেরিয়ে আসতেন কাঁটায় কাঁটায় ভোর চারটেয়। এই চারঘন্টা "মহাপ্রলয় ঘটে গেলেও তান্ত্রিকের সাড় পাওয়া যাবে না। তখন উনি নির্বিকল্প সমাধিতে" এই উক্তি ন্যাংটা কালীর।

তান্ত্রিক চলে গেলে আমি আর ঐ নগ্ন যুবতী গল্পগুজব করতাম। মেয়েটি কিন্তু কখনও সাধনমার্গ বা অধ্যাত্ম কোন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করত না। খুব সাধারণ কথাবার্তাই বলতো। বেশির ভাগ সময় আমার সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করতো। আমি বাউণ্ডুলে প্রকৃতির কেন? বিয়ে থা করছি না কেন? ঘরসংসার না করে এই রকম ছন্নছাড়াভাবে জীবন কাটিয়ে কি লাভ! আমার বাড়িতে কে কে আছেন? ডাক্তার হয়েও তন্ত্রসাধনা ও অধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কে এত আগ্রহ কেন? এ ধরনের হাজারো প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব আদায় করত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। কিন্তু ওর সম্পর্কে বা তান্ত্রিক সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলে সযত্নে এড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতো।

সুন্দরী নগ্ন যুবতীটির সান্নিধ্যে থেকে প্রায়ই আমার কাম প্রবৃত্তি জাগতো। আমার চোখমুখে, আমার আচরণে সে ভাব বহুবার প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ন্যাংটা কালী নির্বিকার।

আমার যৌন উত্তেজনাকে কোন রকম আমলই দিতো না সে। মাঝে মধ্যে ঠাট্টার ছলে ওর সঙ্গে একটু আধটু ফষ্টিনষ্টি করার ধান্ধাও বড় একটা ফলপ্রসূ হয়নি আমার।

সেই রহস্যময়ী উলঙ্গিনী যুবতী কামগন্ধহীনা।

প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবতাম কাম বলে কি কোন বস্তু ওর মধ্যে নেই! ওকি ঐ প্রবৃত্তি জয় করছে! কি ভাবে করলো? তান্ত্রিক না হয় তন্ত্রোক্ত যৌগিক প্রক্রিয়ায় সে ক্ষমতা পেয়েছে, তা ছাড়াও তান্ত্রিক প্রায় বৃদ্ধ। মেয়েটি তো ভরা যৌবনা!

ঘুম না আসা অবধি আমরা দুজনে গল্প করতাম। তারপর মাটিতে বিছানো একটা শতচ্ছিন্ন মাদুরে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম। পাশেই মানে একেবারে গা ঘেঁষে নিদ্রিতা একটা জলজ্যান্ত সুন্দরী নগ্ন যুবতী! আমার হৃদপিণ্ডে পরজের বিহ্বল মীড় মোচড় দিয়ে উঠতো। শরীরের প্রতিটি রোমকূপে অসংখ্য পিঁপড়ের মত উত্তেজিত করত কাম। কন্যাকুমারীর কমনীয় কোমল দেহ ('কন্যা' শব্দটি যে কন্ ধাতু থেকে উৎপন্ন টের পেতাম হাড়ে হাড়ে), বিশেষতঃ ওর মদির মাদক দুটো বড় বড় টানা টানা কাজল কালো চোখ, ওর সুপুষ্ট নিটোল স্তনযুগল, ওর সুঠাম পাছা, ওর রোমশ যোনি, এক কথায় ওর সেক্স ঠিকরানো সর্বাঙ্গ আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো।

উলঙ্গিনী মেয়েটি যখন আমার পাশে নিঃসাড়ে ঘুমোতো তখন আমার খুব ইচ্ছে জাগতো অন্তুতঃ আলতো ভাবে হাত দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ স্পর্শ করি। সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে উঠতাম। নিজের বুকের শব্দ শুনতে পেতাম কিন্তু সাহস করে ঐ বিবসনা সুন্দরীর শরীর ছুঁতে পারিনি কখনও। ভয়ে। কি জানি কি করে বসবে ও! শুধু অপলক চোখে ওর নিরাবরণ লোভনীয় তনুর দিকে তাকিয়ে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রদীপের স্বল্প আলোয় সে এক স্বপ্নময় ইন্দ্রিয়াতীত কামানুভূতি। মনে পড়ত আমারই লেখা একটি কবিতার কিছু অংশঃ

অতৃপ্তি অভাব ব্যথা ইথারের মত বাষ্পীভূত
নিচ্ছিদ্র অপার শান্তি কোটি রোমকূপে শিহরণ
আমি বিচ্যুত নই নির্বিকল্প সমাধির মোহে
আমার মুক্তি দেবী তোমার উত্তপ্ত আলিঙ্গনে

অঘটনটা ঘটলো...

একে অঘটনই বা বলি কেন! খুব স্বাভাবিক ঘটনাটি ঘটল, আমি চলে আসার ঠিক আগের রাত্রে।

আমরা গল্পগুজব করে যথারীতি শুয়ে পড়েছি পাশাপাশি। কারণের হাল্কা নেশায় বেশ একটা মদির মাদক ঝিমঝিমে আবেশ। অনেক কিছুই ভাবছি শুয়ে শুয়ে—এই রোমাঞ্চকর বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ডাক্তারের তান্ত্রিকে রূপান্তরিত হওয়ার প্রায় অবিশ্বাস্য কাহিনী। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। কঠোর সাধনা।

মানসিক রোগীণী থেকে একটি মেয়ের ভৈরবী ন্যাংটা কালীতে পরিণতির অত্যাশ্চর্য ঘটনা। সদা উলঙ্গিনী মেয়েটিকে উপভোগ করতে না পারার অতৃপ্তি...বেদনা...

একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। প্রদীপের হালকা আলোয় ঘরজুড়ে এক রহস্যময় কুহক।

হঠাৎ মনে হল বুকের ওপর ভারী কি যেন একটা চাপ! বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলাম সেই ন্যাংটো মেয়ে, সেই চিকন কালোরূপা সুন্দরী আমার বুকে মুখ ঘসছে আর অতি কামাতুরার মতো (মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'নিম্ফোম্যানিয়া' বলা হয়) একটা গোঙানি জাতীয় শব্দ করছে। সে এক ভয়াবহ উত্তেজক অনুভূতি। অদ্ভুত শিহরণ।

কিছুক্ষণ পরিবর্তিত চেতনায় আছন্ন ছিলাম। মাথার মধ্যে সমস্ত কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আঁতকে উঠে বসতে গেলাম, নগ্ন নারী উল্টে সজোরে চাপ দিয়ে আমায় ঠেলে ফেলে বুকের ওপর বসে কামার্ত চোখে আমার দিকে তাকালো। কি সাংঘাতিক চাউনি। বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় যেন। চমকে উঠলাম আতঙ্কে। জীবনে অনেক নারীর সঙ্গ করেছি কিন্তু ঐ রকম বীভৎস কামুক চোখ কখনও দেখিনি।

ওকে ঠেলে নামিয়ে দিতে গেলাম। ও জগদ্দল পাথরের মত অনড়। সম্মোহনী চোখে আমার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "ছিঃ ছিঃ তুমি না পুরুষ মানুষ! একটা কামুক মেয়েকে তৃপ্ত করতে পারবে না? তুমি কি অক্ষম?"

ওর কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য যৌন মাদকতা। কথাটা বলেই ও আমার বুকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আমায় সজোরে জড়িয়ে ধরল। উলঙ্গিনী কামোন্মত্তা নারীর উত্তপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে আমার সর্বাঙ্গে একটা আতঙ্কের ঠাণ্ডা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম।

আমার পরনে ছিল শুধু একটা লুঙ্গি। এক ঝটকায় সেটা খুলে ফেলে সে আমার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে বলল, "তুমি তো নপুংসক নও... তবে কিসের দ্বিধা! কাকে ভয়? ঐ তান্ত্রিক কে? ঐ বুড়ো ভামটাকে?..."

পরমুহূর্তেই ঐ নগ্ন মোহিনী মেয়েটি যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা করেছিল আর অশালীন শব্দতরঙ্গের ঝংকার তুলেছিলো, খুব সংযত ভাষায় লিখলেও তা 'পর্ণগ্রাফি' হয়ে যাবে। সুতরাং ঐ অংশটুকু বাদ দিয়েই লিখছি।

কিসের যে একটা জমাট বাঁধা ভয় আমায় পেয়ে বসেছিলো এতদিন পর তা আমার মনে নেই। তবে এটা ঠিক যে প্রচণ্ড একটা ভীতি আমায় লাঠিপেটা করছিলো।

কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে বলেছিলাম, "তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমি পারব না।"

"তুই একটা ক্লীব, তুই একটা ধ্বজ, তুই একটা..."।

তারপর ছাপার অযোগ্য গালিগালাজ শুরু করল কাম-উন্মাদিনী উলঙ্গিনী সেই যুবতী। ওর অশ্লীল গালিগালাজ শুনে মনে পড়ল অনেক দিন আগের কিছু ঘটনা। তখন আমি আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের ছাত্র। মাঝে মাঝে এমার্জেন্সীতে নাইট ডিউটি পড়তো। রাত দুপুরে সোনাগাছির বেশ্যাদের (যৌন কর্মী!) পুলিশ ধরে নিয়ে আসতো হাসপাতালে, মদ খেয়ে প্রকাশ্যে মাতলামি করার অভিযোগ পোক্ত করতে সরকারী হাসপাতালের মেডিকেল রিপোর্টের জন্য। মেয়েগুলোর মুখে কি নোংরা খিস্তি! ওদের বক্তব্য, পুলিশ

নাকি বিনিপয়সায় ওদের ভোগ করে, খানাপিনাও করে আবার ঘুস চায়। না দিলেই তুলে নিয়ে আসে। পুলিশের অপকম্ম বোঝাতেই বেশ্যাগুলোর খিস্তিখেউড়। মেয়েরাও যে অমন কাঁচা খিস্তি করতে পারে সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

আমরা মানে হাসপাতালের কর্মীরা তো বটেই এমন কি পুলিশ পুংগবেরাও 'রাম কহো' বলে কানে হাত দিতে বাধ্য হতো। ন্যাংটা কালীর ভাষা সেই বাজারে মেয়েদেরও হার মানিয়ে ছেড়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো খেউড়ের বন্যা। তারপর খানিকটা থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে যুবতীটি ধরা ধরা গলায় বললো, "তান্ত্রিক না হয় জিতেন্দ্রিয়। ওর মধ্যে কাম বলে কোন পদার্থ নেই। কিন্তু আমি তো একটা রক্তমাংসের শরীর। একটা সাধারণ মেয়ে। এক মানবী। আমাকে দেবী সাজিয়ে...আমায় অতৃপ্ত রেখে... আমার কামনা বাসনা...আমার এই রূপ যৌবন... আমার যৌন উত্তেজনা... এ সমস্ত অস্বীকার করি কি করে? আমি তো সামান্য মেয়ে...কি করে আমি ঠিক থাকবো! তুমিই বলো..."।

আর কিছু বলতে পারেনি সে।

অসহায়ের মত শুয়ে শুয়ে শুধু অনুভব করলাম আমার বুকের ওপর শুয়ে অঝোরে কাঁদছে...কাঁদছে আর কাঁদছে...চিরনগ্ন ন্যাংটা কালী, সেই চিকন কালো রূপা সুন্দরী।

মধুকৈটভ

"ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু"

মধু ও কৈটভ আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল।

"মহাশয়ের কোথা হতে আগমন? প্রয়োজন কি?"

বললাম "আমি কলকাতা থেকে এসেছি। বিষ্ণুবাবার দর্শন প্রার্থী। "ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু...মহাশয় প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক বিশ্রাম করুন। বাবা এখন ধ্যানমগ্ন। ধ্যানভঙ্গের পর সাক্ষাৎ পাবেন।" জানাল মধুকৈটভ, ওদের কথাবার্তার অগ্রে ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু উচ্চারণ কিছুটা বিরক্তি উৎপাদন করছিল বটে কিন্তু এদের ব্যবহার খুবই অমায়িক। "বাবার ধ্যান কখন ভাঙ্গবে?" আমার প্রশ্নের উত্তরে মধুকৈটভ বলল, "ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু এই মুহূর্তেই ধ্যান ভঙ্গ হতে পারে কিংবা বৈকাল অথবা সন্ধ্যা, নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।"

এই দুই ভীষণ দর্শন যুবকের মধ্যে কে মধু আর কে কৈটভ এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। দুজন অবিকল এক রকম দেখতে। গায়ের রঙ মিশকালো।

এরা দুভাই এক সময় দুদ্ধর্ষ ডাকাত ছিল। বহু নরহত্যাও করেছে। শেষে বিষ্ণুবাবার কৃপায় এখন পরিবর্তিত ও শুদ্ধচিত্ত। বাবার আশ্রমেই থাকে ওরা ওঁর চেলাচামুণ্ডা হিসেবে। দূর নির্জনে মহাযোগী বিষ্ণুবাবার আশ্রমের যাবতীয় কিছু দেখাশোনা করে এরা দুজন। বাঁকুড়া থেকে ঝিলিমিলি যাবার পথে ছোট একটা পাহাড় ঘেরা গ্রাম। চমৎকার, ঝিরঝিরে ঝরনা আর তিরতিরে গিরি নদী পরিবেষ্টিত। সেখানে ছবির মত আশ্রমটি সযত্নে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে মধুকৈটভ।

সাধুসঙ্গকামী এক উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরের কাছ থেকে খবর পেয়ে বিষ্ণুবাবার আশ্রমে এসেছি। তখন দুপুর। মধুকৈটভ খুব যত্ন করে শালপাতা সাজিয়ে প্রসাদ খেতে দিল। খিচুড়ী ভোগ। সঙ্গে সামান্য ঘ্যাটচচ্চড়ি ও পায়েস। সে যে কী স্বর্গীয় স্বাদ বলে বোঝাতে পারব না। প্রসাদ গ্রহণের পর মধুকৈটভের সঙ্গে আলাপ জুড়লাম। কে মধু আর কে কৈটভ ওরা নানাভাবে যমজ দুজনের মধ্যে বিভিন্ন বৈসাদৃশ্য বোঝানোর চেষ্টা করছিল। বহু চেষ্টা করেও দুজনের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য ধরতে না পেরে ব্যাজার হয়ে বললাম, "আমি বরং মিলিতভাবে তোমাদের মধুকৈটভ নামেই ডাকব"। আমি ডাক্তার হলেও সাধনপিয়াসী শুনে মধুকৈটভ খুব উৎসাহিত হয়ে আমার সঙ্গে আড্ডা জুড়ে দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "শুনেছি তোমরা আগে সাংঘাতিক ডাকাত ছিলে। কি করে বিষ্ণুবাবার সংস্পর্শে এলে, আর তোমাদের বিবেক বদল হলই বা কি করে?"

প্রশ্ন শুনে মধুকৈটভ কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বলল, "ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু সাধকদের পূর্বাশ্রমের কথা জানাণো নিষেধ।"

"তোমরা কি সাধনমার্গে প্রবেশ করেছ?" কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।

"ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু আমরা হলাম গিয়ে কৃপা সাধক।" মধুকৈটভের নির্বিকার জবাব।

"কৃপা সিদ্ধ" শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু "কৃপা সাধক" এই প্রথম শুনলাম। যাইহোক কথা না বাড়িয়ে চুপ করে রইলাম। মধুকৈটভ কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চাপা গলায় বলল, "ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু শুনতে যখন চাইছেন সংক্ষেপে কিছু বলছি। আমরা দুই যমজ ভাই সবার ছোট। ভাই বোন মিলিয়ে আমরা সংখ্যায় তেরো। দিনমজুর গরীব বাপের সংসারে অযত্নে বুনো আগাছার মত বেড়ে উঠেছি। শেষে সংসারের এমন হাল হলো যে বাধ্য হয়েই আমাদের অন্ধকার জগতে ঢুকতে হয়েছিল। প্রথমে ছোটখাটো চুরিছিনতাই থেকে ক্রমশঃ রাজনীতির দাদাদের সহায়তায় দুজনেই হয়ে উঠলাম দুদ্ধর্ষ ডাকাত, এক নামে পিলে চমকানো, রাম লক্ষণ। যার যা প্রাপ্য মিটিয়েও রোজগার বেশ ভালই হচ্ছিল। তবে দশ বিশটা খুন খারাপিও করতে হয়েছে ঘটনাচক্রে। বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল আমাদের, অপরাধ করতে করতে। চুরি ডাকাতি আর মদ মেয়েছেলে এই নিয়েই বীভৎস স্ফূর্তির জোয়ারে গা ভাসিয়েছিলাম। একদিন লোক মারফত খবর পেলাম বিষ্ণুবাবার কাছে নাকি প্রচুর হীরে জহরৎ সোনা দানা লুকোনো আছে। তখন এই আশ্রম ছিল না। বাবা থাকতেন ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা ঝুপড়ি বানিয়ে বিষধর সাপ আর হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে। শুনেছিলাম উনি এইভাবে দীনহীনের মতো সাধু সেজে আছেন বটে, আসলে উনি সোনা দানা হীরে জহরতের চোরাকারবারী। লোকচক্ষুর আড়ালে ভণ্ড সাধু বেশ ধরে রয়েছেন। বেশ একটা দাঁও মারা যাবে এই ভেবে এক রাত্রে দুজনে বল্লম নিয়ে আক্রমণ করলাম বাবাকে।

উনি তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কি বলব বাবু, দেখলাম ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ওঁকে ঘিরে চোখ জুড়োনো নীল রঙের আলোর জ্যোতি। দেখে থমকে গেলাম আমরা। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থেকে দুজনেই বল্লম তুলে চিৎকার করে উঠলাম, "এই ভন্ড সাধু, বল্ কোথায় তোর ধনদৌলত লুকোনো আছে? নইলে এক্ষুনি তোকে শেষ করে ফেলব।" বাবা স্থির চোখে আমাদের দিকে তাকালেন। কিন্তু সেই দৃষ্টিতে দুজনের হৃদকম্প উপস্থিত হল। হাত থেকে বল্লম খসে গেল।

বিষ্ণুবাবা গম্ভীর গলায় বললেন—আমার ঐশ্বর্য বলতে যোগৈশ্বর্য। তা যদি চাস বাবা ডাকাতি আর হিংসে ছেড়ে আমার কাছে চলে আয়।

সে যে কি ডাক বাবু কি বলব! বুকটা যেন হু হু করে উঠল, হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করলাম আমরা। মনে হল আমাদের জন্মজন্মান্তরের বাপ অনেক কালের পর তাঁর হারিয়ে যাওয়া দুষ্টু ছেলেদের ফিরে পেয়ে আদর করে বুকে ডাকছেন। ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে

বাবার পায়ে আছড়ে পড়ে আমার চিরজীবনের মতো ওঁকে দাসখৎ লিখে দিয়েছি। ওঁর অপার কৃপায় রাম লক্ষ্মণ হয়েছে—মধুকৈটভ...।"

"হরি ওঁ তৎসৎ"।

প্রচণ্ড নাদ ধ্বনিতে নির্জন বনাঞ্চল কেঁপে উঠল। সামনের বিশাল একটা বটবৃক্ষের ডালে বসে থাকা অসংখ্য পাখপাখালি সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। সেই নাদধ্বনি আর পাখিদের কলবর সৃষ্টি করল এক আশ্চর্য মহাঐকতান সঙ্গীত। "ঐ. যে বাবার ধ্যান ভাঙ্গল...।" মহাব্যাস্ত হয়ে দৌড় মারল মধুকৈটভ।

আমরা এতক্ষণ আশ্রমের সামনে মস্ত একটা শালগাছের নিচে শান বাঁধানো ঘেরা একটা জায়গায় বসে গল্পগুজব করছিলাম।

খানিকক্ষণের মধ্যেই মধুকৈটভ ছুটে এল। আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে হাজির করল আশ্রমের ঘরের মধ্যে বিষ্ণুবাবার সামনে। শান্ত, স্নিগ্ধ, সৌমদর্শন বৃদ্ধ। শ্বেতশুভ্র দাড়িগোঁফ আর মাথাভর্তি সাদা পাকাচুল। দেখলে শ্রদ্ধায় নত হয়ে যেতে হয়। আমি ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন "কল্যাণ হোক"।

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমায় দেখে বললেন, "ডাক্তার হয়েও সাধনকামী? বাঃ বেশ বাবা। বিজ্ঞানের লোক দর্শনের দরবারে! চৈতন্য হোক তোমার।"

তখন অপরাহ্ন। পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা বাবার মুখমণ্ডল রক্তিম করে তুলেছে। কী চমৎকার সেই দৃশ্য। আমি অপলক চোখে ঐ দিকেই তাকিয়ে আছি শুধু। কোন প্রশ্ন করতেই ভুলে গেছি। বাবা স্মিত হেসে বললেন, "মধু কৈটভের সঙ্গে তোমার বেশ ভাব হয়েছে শুনলাম। তা হলে তোমাকে আজকে মধু কৈটভের কাহিনীই বলব। পুরাণের সেই মধুকৈটভ।" বাবা দৃঢ় স্থির পদ্মাসনে উপবিষ্ট। অশীতিপর বৃদ্ধ উদাত্তকণ্ঠে একটানা শুনিয়ে গেলেন মধুকৈটভের উপাখ্যান, মাঝে মধ্যে দেবীভাগবতম্, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উনি যে রকম বলেছিলেন যতটা স্মরণে আছে তাই লিখছি।

•

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

ধোঁয়া আর ধোঁয়া। কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশি। লক্ষ লক্ষ বছর চলল সেই প্রকল্প তারপর এল মহাপ্রলয়। পৃথিবী নিমজ্জিত হল অথৈ জলে।

সেই কারণ সলিলে কুণ্ডলীকৃত অনন্তনাগের শয্যায় ভগবান বিষ্ণু, শ্রীহরি নারায়ণ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। হরির নেত্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন যোগনিন্দ্রা রূপিণী ভগবতী মহামায়া। তাই ভগবান বিষ্ণু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। বিশ্বে তখন এত ধোঁয়াই বা এল কি করে? তারপর কি করেই বা অসীম জলধির আবির্ভাব! পুরাণে বর্ণিত 'ধুন্ধুমাবধ' কাহিনীতেই এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির চরম মুহূর্তের বর্ণনায় ঋষি বৈশপায়ন রাজা জনমেজয়কে বলছেন—

মহারাজ ব্রহ্মধামে ক্ষুধা, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, ঋতুবৈচিত্র্য কিছুই নেই, সেখানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মধু রাক্ষসের পুত্র ধুন্ধুমা। সে মহা শক্তিশালী। প্রচণ্ড ক্ষমতা তার। সে দেবতাদেরও অজেয়। ঐ ভয়ঙ্কর অসুর যখন নিশ্বাস ফেলে তখন ঘন ধুম্রজাল উর্ধ্বে উঠে আকাশ পরিব্যাপ্ত করে সূর্যকে ঢেকে ফেলে। ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, অঙ্গার ও প্রচণ্ড ধোঁয়ার আস্তরণ চারদিক অন্ধকার করে রাখে।

সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে মহারাজ কুবলাশ্ব প্রচুর সৈন্যসামন্ত, বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং নিজের শত পুত্র সঙ্গে নিয়ে মহাসুর ধুন্ধুমাকে আক্রমণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তাপে কুবলাশ্বের সৈন্যবাহিনী ও একশো পুত্রের দেহ ঝলসে গিয়ে ভস্মে পরিণত হল। বিমূঢ় কুবলাশ্ব শত পুত্রের শোকে হায় হায় করে উঠলেন। প্রতিহিংসায় তাঁর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল।

এদিকে ধুন্ধুমা কুবলাশ্বকে আক্রমণ করল প্রচণ্ড বারিবর্ষণে। কুবলাশ্ব জলমগ্ন হলেন। কুবলাশ্বের রাজ্যও শীতল হল। কুবলাশ্ব যোগবলে ঐ বিপুল জলরাশি পান করে ফেললেন। যার ফলে পৃথিবী জলশূন্য হল। এদিকে পৃথিবী জলশূন্য হওয়ায় অনুশোচনায় কুবলাশ্ব ব্যথিত হলেন। কুবলাশ্ব বরুণ দেবতাকে ধ্যানে ও স্তবে তুষ্ট করে পৃথিবীকে জলপূর্ণ করলেন অবিরাম ধারাবর্ষণে।

এবার ধোঁয়ার আস্তরণ দূর হয়ে সুনীল আকাশ দৃশ্যমান হল আর নীল গগনের বুকে দেখা দিল এক প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড। ইনিই সূর্য।

যাই হোক, সেই আগের কথায় ফিরে আসি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কারণ সলিলের উপর অনন্ত শয্যায় ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন। নিদ্রিত নারায়ণের নাভিকুণ্ড থেকে উত্থিত মৃণালদণ্ডের উপর এক পদ্মের সৃষ্টি হলো। সেই পদ্মের মধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন ভাবী প্রকল্পের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। অগ্নিবর্ণ, চতুরানন, চতুর্বাহু। ব্রহ্মা চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন স্থলের চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু জল আর জল। জীবনের কোন আভাসও নেই। ব্রহ্মা একাকী হাঁপিয়ে উঠলেন। জীবের সঙ্গ পেতে তিনি উদগ্রীব হলেন।

এদিকে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত। বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের মানসে ব্রহ্মা শুরু করলেন যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার স্তব। বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হল।

ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বিষ্ণু চিন্তিত হলেন। এই জলপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে তিনি জীব সৃষ্টি করবেন কি ভাবে? চিন্তামগ্ন বিষ্ণু বারংবার নিজ কর্ণমূলে হাত দিতে লাগলেন যার ফলে ওঁর কর্ণমল থেকে সৃষ্টি হল মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর। বিষ্ণু পুনরায় যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন।

অসুরদ্বয় জন্মমাত্রই জলক্রীড়ায় মগ্ন হল। কিছুক্ষণ পর ব্রহ্মাকে দেখতে পেয়ে ওরা নিজেদের আসুরিক প্রবণতা বশত ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। প্রাণভয়ে ভীত ব্রহ্মা আবার বিষ্ণুর সহায়তা চাইলেন কিন্তু নারায়ণ তখন যোগনিদ্রায় আছন্ন। ব্রহ্মা বুঝলেন ভগবানের নয়নাশ্রিতা যোগনিদ্রারূপিণী ভগবতী মহামায়া বিষ্ণুকে নিদ্রিত রেখেছেন। তাই বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের ইচ্ছায় ব্রহ্মা যোগনিদ্রারূপিণী ভগবতী মহামায়ার স্তব শুরু করলেন ঃ

দেবদেবী জগদ্ধাত্রি ভক্তাভীষ্ট ফলপ্রদে
জগন্ময়ে মহামায়ে সমুদ্রশয়নে শিবে...
—দেবীভাগবতম্

দীর্ঘ স্তব। তার সামান্য উদ্ধৃতি দিলাম। সম্পূর্ণ স্তবের অর্থ এইরকম— হে দেবদেবী, হে জগদ্ধাত্রী, আপনি ভক্তগণের অভিষ্ট ফল প্রদান করে থাকেন। হে মহামায়া, হে শিবা, আপনি পরব্রহ্মস্বরূপিণী। আপনার আজ্ঞায় বশীভূত হয়ে জীবগণ স্ব স্ব কার্য নির্বাহ করে। আপনি কালরাত্রি, মহারাত্রি ও অতি ভয়ঙ্কর মোহরাত্রিরূপিণী। আপনি সর্বব্যাপিণী, আপনি পরমানন্দরূপিণী, আপনি মহনীয়া, মহারাধ্যা, মধুমতী ও মায়ারূপিণী যা ভক্তগণের একান্ত ব্যাখ্যা। আপনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বস্তুসকলেরও শ্রেষ্ঠতমা হিসেবে কীর্তিতা। আপনি লজ্জা, পুষ্টি, ক্ষমা, কীর্তি, কান্তি ও দয়ারূপিণী। আপনি পরমাসুন্দরী, বিশ্ববন্দিতা ও জগৎস্বপ্নাদিরূপিণী। আপনি পরমা, পরমেশ্বরী ও পরমানন্দারূপিণী। এই জগৎ সংসারে একমাত্র আপনিই বিদ্যামানা এবং সেই কারণেই এক স্বরূপিণী। ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের আশ্রয়স্বরূপা সে জন্য তৃতীয়ারূপিণী আবার তুরীয়পদরূপিণী বলেই আপনি চতুর্থীস্বরূপিণী। আপনি পঞ্চভূতের ঈশ্বরী এজন্য পঞ্চমী। আপনি কামাদি ষট্‌বর্গের অধিশ্বরী বলে ষষ্ঠীরূপিণী। আপনি রবি আদি সপ্ত বারের অধিশ্বরী এবং সপ্তবরদায়িনী সেজন্য আপনি সপ্তমী। অষ্টবসুগণের অধিশ্বরী বলে অষ্টমী। আপনি নবরাগ ও নবকলায় পরিপূর্ণা এবং নবগ্রহের অধিশ্বরী সেজন্য আপনি নবমী। আপনি দশদিক ব্যাপিনী এবং দশদিক পূজ্যা এই কারণে দশমী। আপনি একাদশ রুদ্রসেবিতা এবং একাদশী তিথিপ্রিয়া সে কারণে আপনি একাদশী। আপনি দ্বাদশ পূজ্যা ও দ্বাদশ আদিত্যের সৃষ্টিকর্ত্রী বলে দ্বাদশী। আপনি ত্রয়োদশ গণপ্রিয়া বিশ্বদেবাধিদেবতা এবং মলমাস নিয়ে ত্রয়োদশ মাসরূপিণী সেজন্য আপনি ত্রয়োদশী। আপনি চতুর্দশ ইন্দ্রকে বরদান করেছেন এ কারণে আপানি চতুর্দশী। আপনি পঞ্চদশী বিদ্যা-বেদ্যা সেজন্য পঞ্চদশী। আপনি ষোড়শভূজা এবং চন্দ্রের অমানাম্নী ষোড়শকলারূপিণী এবং আপনার ললাটে সর্বদা চন্দ্রের ষোড়শকলা বিরাজিত এজন্য আপনি ষোড়শী। হে দেবেশি, আপনি নির্গুণা হয়েও এইরূপে বিরাজ করেন, ভগবান দেবদেব রমাপতিকে আপনি মোহে বশীভূত করেছেন। এই দুর্দান্ত অসুরদ্বয় অতীব পরাক্রমশালী। এদের বধের নিমিত্ত আপনি দেবেশকে প্রবোধিত করুন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আবার এই স্তব ভিন্নরূপে উল্লিখিত হয়েছে। তার কিছু অংশ যেমন ঃ

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা...

তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমিই বষট্‌কাররূপিনি (উদাত্তাদি), তুমিই সুধা, তুমিই ত্রিমাত্রারূপা (অ, উ, ম) যা বিশেষ করে উচ্চারণ করা যায় না সেই অর্ধমাত্রারূপে অবস্থিতা ও নিত্যা তুমিই। তুমি গায়ত্রী, তুমি সাবিত্রী, তুমিই দেবজননী স্বরূপা। তুমিই সমগ্র জগৎ ধারণ ও সৃষ্টি কর, পালন কর আর প্রলয়কালে সংহার কর। হে জগৎরূপিণী, তুমি আদিতে সৃষ্টিরূপা, পালন কালে স্থিতিরূপা এবং মহাস্মৃতি। তুমিই মহামোহরূপা পরিণামকারিণী সর্বপ্রাণীর কারণ স্বরূপা তুমিই কালরাত্রি, মহারাত্রি ও ভীষণা মোহরাত্রি।

তুমিই লক্ষ্মী, ঈশ্বরী, তুমিই হ্রী, তুমিই অধ্যাবসায়রূপা বুদ্ধি। তুমি লজ্জা, পুষ্টি এবং তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষান্তি। তুমিই খড়্গধারিণী, শূখধারিণী, ভয়ঙ্করী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, শঙ্খ ও ধনুর্ধারিণী। বাণ, ভূষণ্ডী এবং পরিঘা অস্ত্রধারিণী। তুমি সৌমা (দেবতাদের প্রতি) আবার তুমি অতি অসৌমা (অসুরগণের প্রতি)। তুমি যাবতীয় বস্তুসমূহ হতেও সুন্দরী। তুমি শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠা। তুমি পরমা ও পরমেশ্বরী দেবী। হে জগতের আত্মভূতা, যা কিছু সৎ ও অসৎ বস্তু যেখানে অবস্থান করছে তুমি সে সকলেরও শক্তিভূতা। আমি আর তোমার কি স্তুতি করব! যিনি জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও লয়কারী সেই পরমেশ্বরকে (নারায়ণ) তুমি নিদ্রামগ্ন রেখেছো। এ জগতে তোমার স্তুতি করবে এমন সামর্থ্য কার! বিষ্ণু, শিব ও আমি এই তিন দেবতার শরীর ধারণ তুমিই করিয়েছ। তোমাকে স্তব করে এমন শক্তি কার আছে! হে দেবি, তুমি প্রসন্না (স্তুত) হয়ে দুদ্ধর্ষ মধু কৈটভ অসুরদ্বয়কে মোহিত কর। জগৎপ্রভু অচ্যুৎকে শীঘ্র প্রবুদ্ধ কর। এবং দুই মহাদৈত্যকে (অসুর) বধ করার জন্য তাঁকে (নারায়ণ) প্রবর্তিত কর।

পদ্মযোনি ব্রহ্মার বরে তুষ্ট হয়ে যোগনিদ্রারূপিণী ভগবতী মহামায়া হরির নয়ন ত্যাগ করলেন ও মায়ারূপিণী বিষ্ণুকে মধুকৈটভ অসুরদ্বয় বধ করার জন্য শক্তিপ্রদান করলেন।

এবং স্তুতো ভগবতী তামসী ভগবৎপ্রিয়া
দেবদেবং তদা ত্যক্ত্বা মোহয়ামাস দানবৌ
তদৈব ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমাত্মা জগৎপতিঃ
প্রবোধমাপ দেবেশো দদৃশে দানবত্তমৌঃ
তদা তৌ দানবৌ ঘোরৈঃ দৃষ্টা ত্বং মধুসূদনম্
যুদ্ধায় কৃতসঙ্কল্পেই জগ্মতুঃ সন্নিধিংঃ হরেঃ

—দেবীভাগবতম্

সেই স্তবে তুষ্ট হয়ে জগৎপ্রিয়া তামসী ভগবতী, দেবদেব বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করে দানবদ্বয়কে মোহিত করলেন। তখন পরমাত্মা জগৎপতি ভগবান বিষ্ণু জাগরিত হয়ে প্রবল পরাক্রমশালী দানবদ্বয়কে (দানবশ্রেষ্ঠ) দেখতে পেলেন। ভয়ঙ্কর দানবযুগল মধুসূদনকে দেখতে পেয়ে যুদ্ধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে তাঁর (নারায়ণ) নিকট উপস্থিত হল। পাঁচ হাজার বছর ধরে ভগবান বিষ্ণু ও অসুরদ্বয়ের যুদ্ধ চলল। কিন্তু অসুরদ্বয় অজেয়। নারায়ণ যোগবলে জানতে পারলেন অসুর যুগল মহামায়ার বরে ইচ্ছামৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা স্বয়ং ইচ্ছা না করলে তাদের হত্যা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। ভগবান তখন দৈবী বুদ্ধিতে ছলনার আশ্রয় নিলেন। তিনি মুখে খুব উচ্ছ্বসিত ভাব এনে বললেন, "বৎস মধু কৈটভ, আমি তোমাদের রণকৌশলে অতীব প্রীত হয়েছি। তোমরা বর প্রার্থনা কর।"

মদমোহে অন্ধ দাম্ভিক দুই অসুর খুব তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়ে বলল, "তুমি আবার কি বর দেবে? বরং তুমিই আমাদের কাছে বর প্রার্থনা কর। আমরা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব।" ভগবান স্মিত হেসে বললেন, "বেশ তাই হোক। তোমরা আমার হাতে বধ্য হবে আমাকে এই বর দাও।"

অসুর যুগল বুঝতে পারল তারা নিজ দোষেই বঞ্চিত হয়েছে অর্থাৎ ঠকে গেছে। কিন্তু সেই বিভ্রান্তিকর অবস্থাতেও তারা একটা কৌশলের চেষ্টা করলো। বিশ্বচরাচর তখন জলপূর্ণ। চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে মধু কৈটভ ভগবান বিষ্ণুকে বলল, "তথাস্তু, তবে যেখানে জল নেই এমন কোন স্থানে তুমি আমাদের বধ করতে পারো।"

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বাপোময়ং জগৎ
বিলোক্যতাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ
প্রীতৌ স্ব স্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্তং মৃত্যুরাবয়োঃ
আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা
—শ্রীশ্রীচণ্ডী

আবার ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হল। বহু সহস্র বছর ধরে চললো সেই যুদ্ধ। ভগবান বিষ্ণু দেখলেন জলহীন স্থান কোথাও নেই। তবে কি ভাবে উনি অসুরদ্বয়কে বধ করবেন? শেষে বুদ্ধিস্বরূপিণী মহামায়ার কৃপায় শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী নারায়ণ মধু কৈটভ অসুরদ্বয়কে নিজ অনাবৃত জলশূন্য উরুদ্বয়ে স্থাপন করে সুদর্শন চক্র দ্বারা ওদের মস্তক ছিন্ন করলেন।

বিষ্ণুবাবা থামলেন।

তখন অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। বিষ্ণুবাবার উদাত্ত কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ ধ্বনিময় সংস্কৃত উচ্চারণ আমার মনের কন্দরে কন্দরে অনুরণিত। মধুকৈটভের কাহিনীর রেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ এক অনির্বচনীয় স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করেছে। সে যে কী স্বর্গীয় অধ্যাত্ম আমেজ তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এটা অনুভূতির প্রশ্ন। বিষ্ণুবাবা উঠলেন।

এখন ওঁর সন্ধ্যাপূজার সময়। বললেন, "পূজার পর পুরাণের এই কাহিনীর বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা শোনাবো তোমায়।"

সন্ধ্যাপুজোর পর সামান্য ফলমূল গ্রহণ করে (এটাই বিষ্ণুবাবার রাত্রিকালীন আহার) বিষ্ণুবাবা বোঝাতে শুরু করলেন মধু কৈটভের কাহিনীর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ। কথা প্রসঙ্গে জেনেছি উনি পূর্বাশ্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। শুধু বিজ্ঞানের ব্যক্তিত্বই নয়, উনি অত্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। বিষ্ণুবাবা যে রকম বলেছিলেন যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবেই লিখছি।

দেখো বাবা, ভারতীয় সনাতন আর্য মুনিঋষিদের অধ্যাত্ম চেতনার আলোয় যে সমস্ত কাহিনী উদ্ভাসিত হয়েছে সে পুরাণই হোক আর রামায়ণ, মহাভারতই হোক, অবশ্য রামায়ণ-মহাভারতও পুরাণ পদবাচ্য, কিংবা যে কোন পৌরাণিক উপাখ্যান যাই হোক না কেন, ওগুলো নিছক কল্পকাহিনী ভাবলে খুব ভুল হবে। যদিও নানা রূপকের আস্তরণে আবৃত কিন্তু ঐ সমস্ত কাহিনীর মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

সামাজিক অনুশাসনের রীতিনীতি। বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি চর্চা। বস্তুত পুরাণ হল ইতিহাস। অতীত বিস্মৃত ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস। অমৃতত্ব লাভের সাধনার ইতিহাস। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইতিহাস।

পুরাণে বহু দেবদেবীর কল্পনা করা হলেও প্রত্যেকের সঙ্গে একাত্মতার কথাও প্রচ্ছন্নভাবে বলা আছে। পুরাণের মতাদর্শ একেশ্বরবাদকে অস্বীকার করে না। যে একেশ্বরবাদ থেকে উপনিষদের শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গী একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। এবং তিনিই সর্বাত্ম ও সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। ঋগ্বেদেও একেশ্বরবাদের সমর্থন রয়েছে 'একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।

পুরাণকারেরা শূন্য হতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কথা বলেছেন এবং অনেক ক্রমবিবর্তনের স্তরও দেখিয়েছেন। কিন্তু শূন্য থেকে সৃষ্টি কি ভাবে সম্ভব? মহাশূন্য কি ভাবেই বা বস্তুপুঞ্জে পূর্ণ হল?

এক্ষেত্রে প্রথম উপনিষদের (ঈশ) শান্তিপাঠ মন্ত্র উল্লেখযোগ্য ঃ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে

এই জগৎ পারব্রহ্মে পরিপূর্ণ। সেই পূর্ণ থেকে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উপনিষদকার শূন্য হিসেবে কোন কিছু ধারণা করেননি। তাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বস্তুপুঞ্জে (পারব্রহ্ম) পরিপূর্ণ ভাবা হয়েছে।

শূন্য না পূর্ণ? এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্ত দার্শনিকেরা তাঁদের বুদ্ধি, সজ্ঞা (ইনটিউশন) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার রঙে ঈশ্বর কল্পনা করেছেন যিনি মহাশক্তিমান, অতিমানস, বা ঐ জাতীয় অপ্রাকৃত কিছু, তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যা কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। ঋক্‌বেদেও মোটামুটি এই ধরনের ধারণাই করা হয়েছে।

যতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্

বিশ্বের যত পুরাণকার ছিলেন তাঁদের একধর্মী মানসিকতায় সৃষ্টিতত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছে।

পুরাণে রয়েছে অপরূপ শব্দের খেলা। সেই শব্দকল্পদ্রুমের প্রতীকের আবরণ উম্মোচন করলে বেরিয়ে আসবে মানব সভ্যতার আশ্চর্য এক ইতিহাস। মূল পুরাণ আঠারোটি (অষ্টাদশ মহাপুরাণ)—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

মধুকৈটভের কাহিনী বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত। যাই হোক দেখা যাচ্ছে বিশ্বের তাবৎ পুরাণকারেরা আদিতে ব্রহ্মাণ্ডকে জলে নিমজ্জিতই দেখেছেন কিংবা আদিতে কেবলমাত্র জলেরই অস্তিত্ব ছিল। সেই জল বা কারণ সমুদ্র (সলিল) থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি।

এই জলেরই বা জন্ম হল কি করে? জলের জন্ম ধোঁয়া থেকে। পদার্থবিজ্ঞানীদের ধারণা কয়েকশো কোটী বছর আগে মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত ছিল ঘন কালো মেঘ। শুধুই মেঘ। জল, হাওয়া, মাটি কিছুই ছিল না। বিশ্বচরাচর কালো মেঘের আস্তরণে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সেই গ্যাসীয় পদার্থ মেঘের উৎপত্তি হয়েছিল অদৃশ্য অতি ক্ষুদ্র পরমাণুপুঞ্জের সংমিশ্রণে। সেই পরমাণুর সঙ্গে শক্তির মিলনে উদ্ভব হল প্রচণ্ড চাপের। আর সেই চাপের ফলে মহাশূন্যের তাপমাত্রাও বাড়ল। এই গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে ছিলো হাইড্রোজেন (উদজান), কার্বন, হিলিয়াম, অ্যামোনিয়া ও নানাধরনের বিষাক্ত গ্যাস। তখনও অক্সিজেনের (অম্লজান) সৃষ্টি হয়নি তাই জীবনের অস্তিত্বও সম্ভব ছিলো না।

এই সমস্ত বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থের সম্মিলিত রূপ ঘনঘোর মেঘপুঞ্জকেই, মনে হয়, কুণ্ডলীকৃত অনন্তনাগ কল্পনা করা হয়েছে। আদি বিশ্বের পরিবেশ পরিমণ্ডলের অবস্থা ছিল এইরকম।

এবারে আসছি মধুরাক্ষসের পুত্র ধুন্ধুমার উপাখ্যানে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেমস জীন্সের মতে কয়েক হাজার লক্ষ বছর আগে হঠাৎই (অ্যাক্সিডেনটালি) আমাদের সৌরজগতের প্রধান গ্রহ সূর্যের খুব কাছাকাছি সূর্যের চেয়েও অনেক অনেক বড় আর একটি গ্রহ এসে গিয়েছিল। সেই গ্রহের আকর্ষণে সূর্য থেকে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের পৃথিবী সহ কিছু গ্রহের সৃষ্টি করেছিল।

সেই সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা ছিলো খুব বেশি। জলীয় কণার অস্তিত্ব ছিল কিন্তু জল ছিল না। প্রকৃতি তখন প্রচণ্ড তাপের জন্য জল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। মেঘপুঞ্জে ছিল জলীয় বাষ্প কিন্তু সে মেঘ বারিবর্ষণে সমর্থ ছিল না। মধু অর্থে জল আর ধুন্ধুমা অর্থে ধোঁয়া। যে হেতু 'মধু'র জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা নেই তাই তার এই অমঙ্গল বা অকল্যাণকর অবস্থাকেই 'রাক্ষস' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মধুর জল সিঞ্চনের ক্ষমতাও নেই আবার আসুরিক কোন শক্তিরও সে অধিকারী নয়। সে শক্তি আছে মধুর পুত্র ধুন্ধুমার।

এবার একটু অন্যপ্রসঙ্গে যাচ্ছি।

পুরাণের বহু বিস্তৃত ব্যাপ্তির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্ম, ব্রহ্মাণ্ডের রূপকল্প, বিভিন্ন দেবদেবী, সাকার, নিরাকার ও অন্যান্য সাধনা। দ্যুলোক, ভূলোক, গোলোক ইত্যাদির ভূগোল, অবতারবাদ ও পরলোকতত্ত্ব এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের বহুমুখী চর্চা ইত্যাদি। পুরাণকে বেদের সমকক্ষ এবং পঞ্চমবেদ মনে করা হয় আবার মতান্তরে ঋক্, সমাম, যজু ও অথর্ববেদের পর পঞ্চমবেদ হল আয়ুর্বেদ।

পুরাণে সাংখ্যবাদের সঙ্গে বেদান্তের মায়াবাদ বিশেষতঃ সর্বেশ্বরবাদের অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে এবং যোগদর্শন ও অতীন্দ্রিয়বাদেরও প্রাধান্য রয়েছে। হিন্দু সমাজ জীবনে, বিভিন্ন ধরনের ধর্ম ও তন্ত্রশাস্ত্র একত্রিত হয়ে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বেদে মূলতঃ প্রাকৃত শক্তির আরাধনার কথাই বলা হয়েছে। এবং এর উপর ভিত্তি করে একটা নিখুঁত ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের সুর ও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। পুরাণে যোগদর্শন (বিশেষতঃ রাজযোগ ও হঠযোগ), রহস্যময় বিভিন্ন অপার্থিব জগৎ ও অতীন্দ্রিয়বাদেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

হিন্দুধর্মশাস্ত্র বিচার করলেও দেখা যাবে পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যে আশ্চর্যরকম যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে এবং যে কারণে হিন্দুদের বহুবিধ সামাজিক বিধিনিষেধ (সোস্যালট্যাবু), ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক হিসেবে এরা এখনও বর্তমান। বেদ মূলতঃ যে ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল প্রাকৃত শক্তিপূজা (এলিমেন্ট ওয়ারশিপ)। সংহিতায় পিতৃপূজার উল্লেখ আছে। তন্ত্রশাস্ত্র জুড়ে বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন ভাবে রূপে রূপে শক্তি সাধনার ছড়াছড়ি। আর পুরাণে প্রতিমাপূজার নিদর্শন ও নির্দেশ রয়েছে নানাভাবে। পুরাণের

পূজাপদ্ধতির সঙ্গে তন্ত্রোক্ত পূজার্চনা ও ক্রিয়াকলাপ যেমন হোম যজ্ঞ ইত্যাদির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, যা এখনও নিষ্ঠাবান হিন্দুরা পালন করে থাকেন।

পুরাণে বহু দেবদেবী তথা প্রতিমা পূজার উল্লেখ রয়েছে। তন্ত্রে প্রধানতঃ শক্তি পূজার বিবিধ রীতির উপর নির্ভরতা লক্ষ্য করা যায়। তন্ত্রের এই সৃষ্টিমূলক শক্তি পূজার উৎপত্তি এবং হোম, যজ্ঞ, পূজার্চনা ও অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়ামূলক আচরণ কিন্তু পুরাণ থেকেই নেওয়া হয়েছে।

বেদ ও পুরাণ পরস্পর নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত। পুরাণের কাহিনীগুলির শ্বরন, ধারণ, বিস্তার ইত্যাদির গতি প্রকৃতি দেখে মনে হয় সেগুলির উৎপত্তি বেদ থেকেই এবং অথর্ববেদের অনেক মন্ত্র ও সূত্র এবং দেবদেবীর কথা পুরাণে গ্রথিত রয়েছে। পুরাণে যে সমস্ত দেবদেবীর উল্লেখ আছে এঁদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী এই ত্রিদেবতাই প্রধান। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা। রজোগুণী, রক্তবর্ণ, স্থূল শরীর, ক্লীবলিঙ্গ ও জাগ্রত অবস্থা। বিষ্ণু পালনকর্তা, তমোগুণী, ঘোর নীলবর্ণ, সূক্ষ্ম শরীর, স্ত্রীলিঙ্গ ও সুষুপ্তি অবস্থা। শিবসংহার কর্তা, সত্ত্বগুণী, শ্বেতবর্ণ, কারণ শরীর, পুংলিঙ্গ (মতান্তরে উভয়লিঙ্গ) ও তুরীয় অবস্থা।

এই তিন দেবতার প্রাধান্য অনুযায়ী পুরাণগুলিকে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

আবার আগের কথায় ফিরে আসি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তখন ধোঁযারই অস্তিত্ব। হঠাৎ প্রাকৃতিক কোন কারণে পৃথিবীর উত্তাপ কমে গিয়ে রাসায়নিক কিছু প্রক্রিয়ায় প্রবল বারিবর্ষণ ও যার ফলে পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ হয়েছিল। পুরাণকার সেই বিপুল জলরাশিকেই কারণ-সমুদ্র নামে অভিহিত করেছেন।

সেই কারণ-সলিলে অনন্তনাগের শয্যায়—অনন্তনাগ অর্থে কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশি (বাষ্প, মেঘপুঞ্জ) এবং সেই অনন্তনাগের বিষনিঃশ্বাস অর্থে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থসমূহ। তখনও জীবসৃষ্টির সহায়ক ও জীবনবক্ষাকারী অক্সিজেন গ্যাস সৃষ্টি হয়নি। কারণ-সলিলে অনন্তনাগের শয্যায় ভগবান বিষ্ণু (নারায়ণ) যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। বিষ্ণু অর্থে যিনি বিষ হরণ করতে সক্ষম। নারায়র্ণ শব্দের দুটি অর্থ। একটি মানে যিনি নরকে অয়ন (পালন) করেন ও অন্য অর্থ নারা অর্থাৎ জল। জলে বিনি অবস্থান করেন তিনিই নারায়ণ। বিষ্ণু সর্বব্যাপী দেবতা। তিনি সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর বিশাল হতেও বিশালতর। তিনি অণু পরমাণু। ব্যাপক অর্থে তিনিই বিশ্বপ্রকৃতি।

এই মহাপ্রকৃতি চির উদাসীন। তাঁর এই মহা উদাসীনতাই যোগনিদ্রা কিংবা ব্রহ্মাণ্ডে জীব সৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁর চিন্তামগ্ন ব্যাকুল প্রতীক্ষাকেই যোগনিদ্রা কল্পনা করা হয়েছে। বিষ্ণুর নাভিকুণ্ড হতে মৃণাল দণ্ড ও পদ্মোপরি ব্রহ্মার অবস্থান। বিষ্ণু অর্থে বিশ্বপ্রকৃতি। সেই বিশ্ব জলে নিমজ্জিত (কারণ সলিল)। জল থেকে সর্বপ্রথম উদ্ভিদ জগতের উৎপত্তি।

ব্রহ্মা হলেন সূর্য। রজোগুণী ঘোর রক্তবণ। পুরাণে বলা হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব (শিব) আদিতে এই তিন দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণু স্থিতি (পালন) ও শিব

সংহার (লয়) কর্তা। ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হলেও ব্রহ্মা কিন্তু নপুংসক। সুতরাং তিনি সৃষ্টি করতে অক্ষম। প্রকৃত অর্থে তিনি ভাবী প্রজন্মের সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন মাত্র। সে দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে সূর্য কল্পনা করা হয়েছে। তিনি রক্তবর্ণ। সূর্যের রঙ লাল। তিনি চতুরানন। সূর্যের দৃষ্টি চতুর্দিকে।

প্রথমে ধূম্রজালে আচ্ছন্ন বিশ্বপ্রকৃতি পরে প্রবল বারিবর্ষণে (ধুন্ধুমা বধ) প্লাবিত। পুরাণে বলা হয়েছে ধুন্ধুমা বধের পর ধোঁয়ার আস্তরণ দূর হয়ে বৃষ্টিপাতে বিশ্বপ্রকৃতি শিবময় হল। মেঘের আস্তরণ কেটে গিয়ে সুনীল আকাশ ও সেখানে প্রজ্বলিত অগ্নিগোলকের দর্শন পাওয়া গেল। ইনিই সূর্য।

ধ্যানমগ্ন নির্বিকার বিশ্বপ্রকৃতির (বিষ্ণু) কাছে সূর্য (ব্রহ্মা) জীবসৃষ্টি প্রার্থনা করলে প্রকৃতি চিন্তিত হল। এবং সেই চিন্তার সংঘাতে আলোড়িত জলরাশিতে (কারণ-সলিল) প্রথম জীবনের সূত্রপাত দেখা গেল।

প্রাণবিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্রেই প্রথম জীবনের সূত্রপাত। তার প্রমাণ জীবসমূহের রক্ত বা দেহরস বিশ্লেষণে দেখা যাবে সমুদ্র জলের যাবতীয় উপাদানের আনুপাতিক হার সুষ্ঠুরূপে বর্তমান।

পুরাণকার গল্পচ্ছলে বলেছেন, বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উৎপন্ন দুই অসুর মধু ও কৈটভ পৃথিবীর আদিতম জীব। সুতরাং জলেই শুরু হলো জীবন।

বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বললেন, "এখন এই দুটি প্রাণীকে নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাকো। কালক্রমে এদের থেকেই কোটী কোটী জীবের সৃষ্টি হবে।" মধুকৈটভ নাম দুটির মধ্যেই জলে জীবনেব উৎপত্তি রহস্য লুকিয়ে আছে। 'মধু' অর্থে জল ও 'কৈটভ' মানে কীট। মধুকৈটভ অর্থে জলজকীট। অর্থাৎ সমুদ্রের জলে পোকাজাতীয় কীট থেকে জীবনের জয়যাত্রা শুরু।

জলজ কীটেরা প্রথমে বেশ শান্তিতেই ছিলো। কিন্তু প্রকৃতি ও সূর্য উভয়ে মিলে আবার যখন জীবসৃষ্টির ফন্দি আঁটলো তখন এই জলজ কীটেরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হল। সূর্যই পুনরায় জীবসৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছেন সুতরাং জলজ কীটেরা ব্রহ্মার (সূর্য) উপর বেজায় চটে গেলো। অথচ বুঝল না ওদের সৃষ্টির মূলেই কিন্তু ঐ ব্রহ্মা বা সূর্য।

সেই আদিতম জলজ কীটদের (মধু কৈটভ) বিভাজন শক্তি ছিল কিন্তু প্রজনন ক্ষমতা ছিল না। তাই বিক্ষুব্ধ কীটেরা পাঁচ হাজার বছর ধরে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হলো। এখানে স্ট্রাগল ফর একজিসটেনস ও সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট মনে পড়ে। এরা ধ্বংস হলো। ওদের কোটী কোটী মরদেহ (মেদ) স্তূপীকৃত হয়েই ক্রমশঃ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলের উপর ডাঙার (মেদিনী) উৎপত্তি। পুরাণকার তাই বলছেন মধু কৈটভের মেদ থেকেই মেদিনীর সৃষ্টি অর্থাৎ পৃথিবীর জন্ম।

এরপর ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে জীব আস্তে আস্তে উন্নত হলো।

পুরাণকার ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতার কল্পনার রূপকে এই রহস্য চমৎকার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রথম জীব জলচারী মৎস্য (মৎস্যাবতার), তারপর প্রাণী জল ও

ডাঙায় উভচারী কূর্ম (কূর্মাবতার), এরপর স্থলচারী রূপ বরাহ (বরাহ অবতার)। এমনি করে ক্রমশঃ পশু ও মানব মিশ্রিত রূপ নরসিংহ্ অবতার আর তারপর থেকেই মানব রূপ যেমন বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও অনাগত অবতার কল্কি।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। বৈষ্ণব ভক্ত কবি জয়দেব গোস্বামী তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যগ্রন্থের শুরুতে ভগবান বিষ্ণুর যে দশাবতার রূপ বর্ণনা করেছেন সেখানে কৃষ্ণের বদলে বলরামকে অবতারত্ব দেওয়া হয়েছে। জয়দেব কৃষ্ণকে অবতার নয়, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বলেছেন। কৃষ্ণ কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর এক পূর্ণশক্তি অবতার রূপ মাত্র (অপর দুই পূর্ণশক্তি অবতার রাম ও কল্কি। অন্যান্য অবতারেরা খণ্ডশক্তি)। তিনি পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বর নন। কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম আখ্যা দেওয়া কষ্টকল্পিত বৈষ্ণবীয় বিলাস ও একদেশদর্শিতার চরম উদাহরণ। যাই হোক বিশ্বের প্রথম জীব জলজ কীট মধু কৈটভের স্তূপীকৃত মরদেহ ক্রমশঃ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জমাট বেঁধে প্রথমে মাটি তারপর কঠিন পাথর ও এই জাতীয় প্রাকৃতিক পদার্থের রূপ গ্রহণ করলো। বিশ্বের পরিবেশে প্রথমে অক্সিজেনের (অম্লজান) অস্তিত্ব ছিলো না। প্রাণ সৃষ্টিতে ও প্রাণ ধারণে অক্সিজেনের ভূমিকা অপরিহার্য। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস থেকে অক্সিজেন তৈরি করে উদ্ভিদ জগৎ। বনস্পতির অদ্ভুত ক্ষমতা হলো শূন্য বা পরিবেশ থেকে প্রাণধারণের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য সৃষ্টি এবং ক্লোরোফিলের (এই ক্লোরোফিলের জন্যই গাছপালার রঙ সবুজ) সাহায্যে সূর্যালোক থেকে সালোকসংশ্লেষে (ফটোসিন্থেসিস) কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্যসৃষ্টির পর অক্সিজেন পরিত্যাগ ত্যাজ্য পদার্থ হিসেবে। এই অক্সিজেন গ্যাসই জীবনসৃষ্টি ও জীবনধারনের পক্ষে অত্যন্ত অপরিহার্য।

পুরাণকার এইভাবে গল্পচ্ছলে প্রায় পাঁচশো কোটী বছর আগে বিশ্বসৃষ্টি তারপর সৌরজগতের বিশেষ একটি তাপকেন্দ্রে (টেমপারেট জোন) পৃথিবীর অবস্থান এবং ক্রমশঃ অনুকূল পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে প্রাণসৃষ্টির গোপন বৈজ্ঞানিক রহস্যকে রূপকের আড়ালে ঢেকে রেখেছেন।

বিশ্বে জীবসৃষ্টি হলো এবং ক্রমশঃ বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে প্রাণীজগৎ উন্নততর হতে লাগলো। তারপর পৃথিবীতে মানব মানবীর প্রয়োজন দেখা দিলে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিজ নিম্নাঙ্গ থেকে আদিমপুরুষ 'মনস' ও আদিনারী 'গায়ত্রী'কে সৃষ্টি করলেন।

নিজ দেহ হতে সৃষ্টি হলেও নারী কিন্তু পবিত্র নয়। এই ধারণায় ব্রহ্মা মায়াবলে এক গাভী উৎপন্ন করলেন। গাভীকে ব্রাহ্মণ ও পবিত্র কল্পনা করা হয় হিন্দু শাস্ত্রমতে। গাভীটির মুখগহ্বরের মধ্যে নিজ দেহ সৃষ্ট নারীকে ব্রহ্মা প্রবেশ করালেন ও গাভীর গুহ্যদ্বার দিয়ে অর্থাৎ মলদ্বার পথে মেয়েটিকে বাইরে বার করে আনলেন। এইভাবে গাভী দ্বারা শোধিতা বলেই সেই নারীর নাম হয়েছিল গায়ত্রী।

বিষ্ণুবাবার আশ্রমে একদিন একরাত মহানন্দে বাবার স্নেহের সান্নিধ্যে ও মধু কৈটভের আন্তরিক আদর যত্নে থেকে অনেক কিছু মূল্যবান জ্ঞান আহরণ করে এবার এল বিদায়ের পালা।

সেই সূর্যকরোজ্জ্বল সুন্দর প্রভাতে ভারাক্রান্ত মনে বিষ্ণুবাবাকে প্রণাম করে ওঁর আশীর্বাদ নিয়ে ফিরতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম।

মধুকৈটভ কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কিন্তু আমাকে ফিরতেই হবে।

মধুকৈটভ আশ্রমের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই। কে এল কে গেল সেই নিয়ে কোন মাথাব্যথাও নেই। তবে সময় পেলে আবার আসবেন বাবু। আপনাকে আমাদের খুব ভালো লেগেছে।"

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম স্বঘোষিত সন্ন্যাসীদ্বয়ের চারচোখ ছলছল করছে।

———

তন্ত্র বিজ্ঞান

বিভিন্ন সময়ে আমি গৃহত্যাগ করে নানা জায়গায় থেকেছি। দুর্গম বিপদসঙ্কুল স্থান। গঙ্গাতীরের সুন্দর আশ্রম, পাঁচশো মেয়ের নিবাস 'কন্যাপীঠ' -এ কুমারী কন্যাদের সঙ্গে রোমাঞ্চকর সহ অবস্থান। এমনি হরেক রকম বৈচিত্র্যময় জায়গা।

এক সময় উত্তর চব্বিশ পরগণার খড়দা সংলগ্ন রহড়া অঞ্চলের কল্যাণনগরে এক পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ বাগানবাড়িতে ভয়াবহ পরিবেশে ছিলাম বেশ কিছুকাল, এ সম্পর্কে 'বামদেব' অধ্যায়ে বিস্তারিত লিখেছি। রহড়ার কল্যাণনগরে যেমন এক প্রকৃত সাধু ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলাম, তেমনই এক ধূর্ত, ধড়িবাজ, ধুরন্ধর, দুর্নীতি- গ্রস্ত সরকারী হাসপাতালের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ভেতরে ভেতরে কুকীর্তির সীমা পরিসীমা নেই অথচ বাইরে আধ্যাত্মিক ভড়ং, মুখে বড় বড় সাধনমার্গের বুলি এরকম একটা লোক আমায় ব্যতিব্যস্ত করে ছেড়েছে। সময় সুযোগ পেলে ঐ বদ লোকটির সম্পর্কে বিশদ লিখব। এখন সাধু ব্যক্তিটির প্রসঙ্গে আসছি।

ওঁর নাম চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সংসার বিমুখ সাধক প্রকৃতির মানুষ। অকৃতদার। রহড়ার কল্যাণনগরে যে ক'মাস ছিলাম ওঁর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন অধ্যাত্ম বিষয় ও বিশেষতঃ তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ওঁর সঙ্গে এদিক ওদিক গঙ্গার ধারে বহু মন্দির ও আশ্রমে ঘোরাঘুরি করেছি, অনেক কিছু দেখেছি, শিখেছি, জেনেছি।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

এক সময় আমার একেবারে গঙ্গার ধারে কোন আশ্রম কিংবা নিবাসে থাকার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। স্বয়ং শিব যাঁকে মাথায় স্থান দিয়েছেন সেই পূণ্যতোয়া গঙ্গাকে আমি অতি পবিত্র জ্ঞান করি। যাই হোক একদিন সকালে চণ্ডীবাবুকে বললাম, "চলুন গঙ্গার ধারে একটা জায়গা খুঁজে বার করি। সেখানেই থাকবো।" প্রথমে খড়দা ও তার কাছাকাছি গঙ্গার ধারের কয়েকটি আশ্রম ও মন্দিরে গেলাম। কোনটার পরিবেশ আবার কোনটার শর্ত ঠিক মনঃপুত হলো না। যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরেব প্রধান সেবাইত জানালেন, "আপনি এখানে থাকুন আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা বিষ্ণুর উপাসক। আপনি শক্তি সাধনা করেন। এখানে থাকলে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। আর আপনার পরিচিত কোন তন্ত্রসাধকের এখানে আসা চলবে না।"

তখন অবশ্য আমি নিরামিষ আহার করতাম। সুতরাং ঐ বিষয়ে আপত্তির কোন কারণ থাকার কথা নয়। কিন্তু ওঁর পরের শর্তটি এককথায় বাতিল করে চলে এলাম।

গেলাম ব্যারাকপুরের কেষ্ট মহারাজের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে। মহারাজজীর শর্তাবলীও আমার মনঃপূতঃ হলো না।

আবার হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ব্যারাকপুরের ভোলাগিরি মানে মহাদেবানন্দজী আশ্রমে। আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোর্তিময়ানন্দজী মহারাজ সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু উনি প্রথমে কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "ডাক্তার মানুষ তুমি, এবার কি দেহের চিকিৎসা ছেড়ে ভবরোগ নিরাময় করবে?"

তারপর দীর্ঘসময় আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রীত হয়ে বললেন, "দেখো বাবা, তুমি যে রকম সাধনোপোযোগী নির্জন পরিবেশ চাইছ তা এখানে পাবে না। এখানে স্কুল আছে, তা ছাড়া অনাথ বালকদের নিবাস ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড চলছে, তুমি যদি রাজী থাকো তোমায় অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে আমাদের আর একটি আশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সরযূর মহিমা গঙ্গার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আর স্থানমাহাত্ম্য বিচারে ব্যারাকপুরের চেয়েও অযোধ্যা অনেক উর্ধ্বে। ওখানে তুমি নির্জনে নিজের মত করে সাধন ভজনে মগ্ন থাকতে পারবে।"

একেবারে অযোধ্যায় সরযূ নদীর ধারে যাওয়াটা ঠিক পছন্দসই বলে মনে হলো না আমার। চণ্ডীবাবুর সঙ্গে আবার হাঁটতে শুরু করলাম গঙ্গার ধার দিয়ে। বড় রাস্তা ধরেই চলছিলাম হঠাৎ কি খেয়াল হল একটা গলির বাঁক দেখতে পেয়ে সেই দিকেই এলাম। প্রথমে চোখে পড়ল অ্যাডিসন্যাল ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশের কোয়ার্টার। আর তার ঠিক পাশেই ছোট একটা চমৎকার আশ্রম। শ্রীগুরু আশ্রম। একেবারে গঙ্গার ধারে।

আশ্রমের গেট খোলা। সামনের ছোট মাঠে কয়েকটা গরু চরছে। কেউ কোথাও নেই। দুজনে ভেতরে ঢুকে এলাম। মাঠের বাঁ দিকে ছোট একটা বাগান আর ডানদিকে কয়েকটা টালির ঘর। তারমধ্যে একটা ঘরে এক ছোকরা গোছের আপন মনে তানপুরা বাজিয়ে গান গাইছে, বেশ সুরেলা কণ্ঠস্বর। আমাদের দেখে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চান?"

বললাম, "এই আশ্রমের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"তিনি তো দেহ রেখেছেন।"

"ওঁর জায়গায় কে আছেন?"

"মা আছেন।"

"মার সঙ্গেই দেখা করব।"

"এখন সাক্ষাতের সময় নয়।"

"আমি এসেছি শুনলেই উনি দেখা করবেন।"

ছেলেটি আপাদমস্তক আমার দিকে বার কয়েক দেখে খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে বলল, "আপনি কে? আপনার কি পরিচয় বলব মাকে?"

"বলো গিয়ে ছেলে এসেছে মার সঙ্গে দেখা করতে।" সে কিছুক্ষণ হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে মূল আশ্রম গৃহের মধ্যে ঢুকে গেলো।

চণ্ডীবাবু বললেন, "বাঃ বড় চমৎকার কথা বাৎলেছেন, ছেলে এসেছেন মার কাছে এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি হতে পারে?"

কিছুক্ষণ পর গায়ক ছেলেটি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, "আসুন ভেতরে। মা আপনাদের ডাকছেন।"

মার সন্ন্যাস নাম শ্রীমৎ স্বামী নীলানন্দ সরস্বতী। বেশ বয়স হয়েছে কিন্তু কি অপরূপ লাবণ্যময়ী কল্যাণীয়া মাতৃমূর্তি। দু চোখে স্নেহ ভালবাসা অঝোরে ঝরে পড়ছে।

উনি আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেই অভিভূত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষার ব্যবস্থা হলো এবং সেই মুহূর্তেই আমায় আশ্রমে চলে আসার নির্দেশ দিলেন।

মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় শ্রীগুরু আশ্রমে ছিলাম বেশ কিছুদিন। কেন যে সেই সুন্দর আশ্রম ও মার স্নেহ ভালবাসা ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল সে আর এক কাহিনী। এখানে নয়, পরে অন্য কোথাও তা লিখব।

চণ্ডীবাবুর প্রসঙ্গে আসছি আবার। উনি প্রায় পঁচিশ বছর পরিব্রাজক হিসেবে হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করেছেন। তা ছাড়াও নর্মদা পরিক্রমা, নৈমিষারণ্য এবং বহু তন্ত্রক্ষেত্র ভ্রমণ ও প্রচুর সাধুসঙ্গ ও বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তন্ত্র সম্পর্কে ওঁর ধারণা ও অভিজ্ঞতার কথা এখানে লিখছি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উনি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ। চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয় আলোচনা করছি।

বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে প্রাচীন ও নবীন জাগতিক সাহিত্যে বহুপ্রকারের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ধারাতেই আলোচনাকারী নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ অনুসারে আলোচনা করেছেন। বলাবাহুল্য প্রতি আলোচনাতেই একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ পরিগৃহীত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ভারতীয় প্রস্থানের অন্তর্গত শাক্ত সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হতে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা বিষয়ে সংক্ষেপে দু চারটি কথা বলব।

বিশ্বসৃষ্টি ও ব্যক্তিগত দেহসৃষ্টি মূলতঃ একই ব্যাপার। তান্ত্রিকগণ বলেন যাকে যোগীরা শ্রীচক্রের আবির্ভাব হিসেবে ব্যক্ত করেছেন তা প্রকারভেদ মাত্র। অর্থাৎ চক্রের উদয়, জগতের সৃষ্টি এবং আত্মার দেহযুক্ত হয়ে প্রকাশ একই কথা।

শাক্তমতে সমগ্র জগতের মূলে যে অখণ্ড সত্তা আছে তা একাধারে বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত স্বরূপ উভয়ই। এর হ্রাস বৃদ্ধি নেই। এ অনাদি, অনন্ত, স্বপ্রকাশ ও চিদানন্দরূপ বা স্বরূপ। শাক্তমতে ঐ স্থিতিকে শিব ও শক্তির অদ্বৈতাবস্থা বলা যেতে পারে।

শিবরূপে যিনি উদাসীন নিষ্ক্রিয় ও নিরপেক্ষ দ্রষ্টা এবং শক্তিরূপে তিনিই ভাবী বিশ্বের উপাদান। শিব ও শক্তি অভিন্ন হলেও শিব কূটস্থ ও শক্তি সংকোচন ও প্রসারশীল।

প্রাচীন যোগীগণ জাগতিক তত্ত্ব অবলম্বনে কৌশলের সাহায্যে পরমতত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ওঁরা বলেন যাঁকে ব্যবহার মুখে আমরা শিব বলি তাও বস্তুত শক্তিরই আর একটি দিক কারণ যিনি প্রকৃত শিব, যাঁকে কোন মতেই শক্তি বলা চলে না, তাঁর সম্পর্কে কোন রকম বর্ণনা সম্ভবপর নয় শাস্ত্রমতে।

"নথৈ শক্ত্যয় বিনা পরে শিবে নাম ধান ন বিদ্যতে" জগতের মূলে মূলতঃ একই

শক্তির দুটি বিরুদ্ধ ও বিপরীতধর্মী লীলা বিদ্যমান রয়েছে। এই দুই শক্তি কোন স্থিতিতে সমরস এবং অদ্বয়ভাবে অবিভক্তরূপে বিদামান আছে এবং অপর স্থিতিতে ওরা বিষমভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া করছে।

এর দুটি শক্তির একটি 'অগ্নি' এবং অপরটি 'সোম' বা শীতল। অগ্নি দুঃখপ্রদ কিন্তু সোম আনন্দদায়ক। অগ্নি মৃত্যুরূপ বা কালের প্রতিচ্ছবি পক্ষান্তরে সোম অমৃতস্বরূপ। অগ্নি অবিভক্ত বস্তুকে বিভাজিত রূপে প্রকাশ করে কিন্তু সোম বিভক্ত বস্তু সমষ্টিকে একত্রিত বা একরূপে সংহত করে। অগ্নি প্রকাশ ও সোম বিকাশ। অগ্নি এবং সোম যখন সাম্যভাবে অবস্থিত থাকে তখন অগ্নির ক্রিয়া ও সোমের ক্রিয়া কোনটিই প্রকাশিত হয় না।

অগ্নির ক্রিয়া সংহার ও সোমের ক্রিয়া সৃষ্টি। অগ্নি ও সোম সাম্যাবস্থায় থাকলে সৃষ্টি ও সংহার কোন ক্রিয়াই থাকে না। এরই নাম অদ্বয়, স্থিতি, কাম, রবি অথবা সবিতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সূর্যবিজ্ঞানের মূল সূত্রটি পাওয়া যায় অর্থাৎ সৃষ্টি ও ধ্বংসের যে অখণ্ড শক্তি বিদ্যমান তাই সূর্য।

অগ্নি ও সোমের বৈষম্য অবস্থায় যখন সোমের প্রাধান্য হয় তখনই সৃষ্টি ও অগ্নির প্রাধান্য হলে সংহার হয়। সূর্য বা কামতত্ত্ব অদ্বৈত। কামের দুটি কলা অগ্নি ও সোম অর্থাৎ চন্দ্র। এই কামকলাতত্ত্বের অন্তর্গত বিন্দুত্রয়ের বিবরণ। সাম্য অবস্থায় স্থিতি থাকে কিন্তু বৈষম্য অবস্থায় অনন্তপ্রকার ক্রিয়া দৃশ্যমান হয়।

অগ্নিব স্পর্শে সোম বিগলিত ও ক্ষরিত হয়। এই অবস্থায় অগ্নির স্পর্শ থাকলেও সোমেরই প্রাধান্য। এই ক্ষরণ থেকেই সৃষ্টির উদয়। তন্ত্রশাস্ত্রমতে হার্দ্ধ কলা নামে চিৎকলাব উদয় এইভাবেই হয়ে থাকে কারণ বাস্তবিক পক্ষে চিৎ-নিস্ফল, পক্ষান্তরে অগ্নির প্রভাবে সোম বাষ্পরূপে পরিণত হলে সোমকলা অব্যক্ত হয়ে যায়। এটিই সংহারের দ্যোতক। এখানে সোম থাকলেও অগ্নির ক্রিয়াই প্রধান অর্থাৎ অগ্নি ও সোমের সংসর্গবশতঃ সোম-প্রাধান্যে সৃষ্টি ক্রিয়া ও অগ্নি-প্রাধান্যে সংহার হয়।

যাঁরা দর্শনশাস্ত্র চর্চা করেন তাঁরা জানেন যে এই বিশ্ব কতকগুলি মূলতত্ত্ব দ্বারা রচিত। শাক্তগণ ও শৈবরা বহু বিচার করে এই মূল তত্ত্বের সংখ্যা ছত্রিশটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ছত্রিশটি তত্ত্ব দ্বারাই সমগ্র বিশ্ব রচিত হয়েছে। মায়ার অভ্যন্তরে এবং মায়ার বাইরে কিন্তু বিশুদ্ধ মায়ার ভিতরে অসংখ্য লোক লোকান্তর বা ভুবনসমূহ বিদ্যমান। বিশ্লেষণ করে দেখলে জানতে পারা যাবে সকলের মধ্যেই ঐ ছত্রিশটি তত্ত্বই বিদ্যমান। তবে স্তব থেকে এদের মধ্যে তারতম্য আছে।

পরাশক্তি যিনি পরম শিবের সঙ্গে অভিন্না, যখন তিনি আত্মার স্ফূরণ দেখতে ইচ্ছা করেন তখন যথাবিধি ক্রম অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্বের লীলা প্রকাশিত হয়। এই মহাশক্তির গর্ভে ওঁরই সঙ্গে অভিন্ন ভাবে সমগ্র বিশ্ব বিদ্যমান আছে। এই বিশ্ব মহাশক্তি হতে পৃথক তো নয়ই এমন কি পৃথকরূপে প্রতিভাসমানও হয় না। কিন্তু মহাশক্তির সৃষ্টি ইচ্ছা জাগ্রত হলে বিশ্ব তার সঙ্গে অবিভক্ত থেকেও পরিচ্ছন্ন প্রমাতার নিকট বিভক্তরূপে প্রতিভাসমান হতেও পারে। তান্ত্রিক আচার্যগণ এই বিষয়টিকে বিসর্গ ক্রিয়া বলে বর্ণনা করে থাকেন।

শক্তিতে কার্য অবিভক্তরূপে বিদ্যমান থাকা বিন্দুর ব্যাপার। এবং তা অবিভক্ত থেকেও বিভক্তভাবে প্রতিভাসমান হওয়া বিসর্গের ব্যাপার। যাকে সৃষ্টি বলা হয় তা বিসর্গের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। যোগীগণের মতে এই সৃষ্টির বিষয়ে যে কটি স্তর আছে তার প্রথমটি বিন্দু, দ্বিতীয়টি মূল ত্রিকোণ যার তিনভূক্ত ও তিনকোণ পরস্পর সমান। তারপর অষ্টকোণ এবং ক্রমশঃ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যদশকোণ, অষ্টাদশ, ষোড়শদল এবং সর্বান্তে তিনটি বৃত্ত ও চতুরস্র বা চতুষ্কণ।

এই চতুষ্কোণই সৃষ্টির বহিঃপ্রাচীব। এখানেই সৃষ্টির সীমারেখা বা অবসান। ক্ষুদ্র সৃষ্টি ও বৃহৎ সৃষ্টি উভয়েরই এই একই নিয়ম। চতুষ্কোণটিকে তান্ত্রিক পরিভাষায় ভূপুর বলে। বিন্দু থেকে চতুষ্কোণ পর্যন্ত বা চতুস্কোণ থেকে বিন্দু পর্যন্ত বিশ্বের বিস্তার যে কোন প্রকারের সৃষ্টি হোক না কেন তার বাহিরে চতুরস্র ও ভিতরে বিন্দু থাকবেই।

শিব প্রকাশত্মক এবং শক্তি বিমর্ষরূপিণী। শিব চিৎশক্তি স্বরূপ এবং আনন্দময়। শক্তি যে হেতু ক্রিয়াশীলা সুতরাং লীলার প্রয়োজনে কখনও হর্ষ ও কখনও বিমর্ষ ভাব হলেও মূলতঃ আনন্দময়ী।

সমগ্র সৃষ্টির যেটি মধ্যবিন্দু সেটিই তাঁর সর্বোচ্চ বিন্দু। এই বিন্দু হতেই সর্বপ্রথম ত্রিকোণের আবির্ভাব হয়। এই ত্রিকোণের রহস্য মহাযোগী ভিন্ন কেউ উদ্ঘাটন করতে সমর্থ নয়। সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রে মহাশক্তির আত্মপ্রকাশ ভূমিরূপে এই ত্রিকোণের অভিব্যক্তি।

কামকলার যেটি সাম্যরূপ অর্থাৎ যেটি কাম বা সূর্য সেটি সব সময় সাম্যাবস্থাতেই আছে। তা মহাস্থিতি স্বরূপ কিন্তু কামকলার যেটি বৈষম্যের দিক সেই দিকে নিরন্তব সৃষ্টি ও সংহার চক্রের আবর্তন চলছে।

সৃষ্টি ও সংহার চক্রের মধ্যে আভাষ বা সাপেক্ষরূপে স্থিতি বিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং এটা বলা অসঙ্গত নয় যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার নিরন্তরই চলছে।

রহস্যের ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে সৃষ্টির যা মূল এবং সংহারেরও যেখানে অবসান সেখানেও ক্রিয়া নিরন্তর চলছে অর্থাৎ তিরোধান বা নিগ্রহশক্তির খেলা এবং অনুগ্রহশক্তির খেলা বিশ্বের পৃষ্ঠভূমিতে নিরন্তরই স্বাভাবিক ভাবে চলছে। যিনি এক তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য বলে নিজেকে নানারূপে প্রকাশ করছেন এই তাঁর তিরোধান। এককে অবলম্বন করে বহুর উদ্ভব। প্রাচীন বেদান্তগুলির দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে মূল অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপের কেন্দ্র এইখানেই। বহু যখন নিজের মূল এক স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করে তখন বুঝতে হবে এটা অনুগ্রহ শক্তির খেলা।

অনুগ্রহ শক্তি ব্যতীত যে সংহার হয় তা প্রকৃত সংহার নয়। কারণ ঐ অবস্থায় জড়ত্ব থাকে এবং সংহারের পরে পুনরায় সৃষ্টির আবর্তে ফিরে আসতে হয়। এই সংহার বস্তুতঃ আত্মস্বরূপে প্রত্যাবর্তন নয়। এ কালের খেলা মাত্র।

সৃষ্টির মূলেই আছে বিন্দু যা মহাবিশ্ব নামে পরিচিত। প্রকাশ বা শিবাংশ এবং বিমর্ষ বা শক্তি অংশ সাম্যভাবে অবস্থিত থাকলে তাকে বিন্দুরূপে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এর মধ্যে একটি রহস্য আছে। মনে রাখতে হবে যে স্থূল সৃষ্টির ব্যাপারে পূর্বে চিৎশক্তির

খেলা রয়েছে। চিৎশক্তি নিজ স্বরূপ অর্থাৎ আত্মাকে ভিত্তি করে তার উপর বিশ্বরচনা করে থাকে অর্থাৎ তাতে নিহিত অব্যক্ত বিশ্বকে প্রথমে পরিস্ফুট করে বা ফুটিয়ে তোলে তারপর তাকে ইদংরূপে গ্রহণ করে।

এইভাবে প্রকাশের ভিত্তিতে প্রকাশমান চিত্ররূপী বিশ্ব ইদংরূপে ভেসে ওঠে। যে বিশ্ব পূর্ণ অহং -এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল তা আভাসরূপে ইদং প্রতীতের গোচরীভূত হয়ে চিত্ররূপে উন্মীলিত হয়। মূল সৃষ্টির ইচ্ছা ঘনীভূত হলে এই আভাসরূপী বিশ্ব স্থূলরূপে পরিণত হয়। এতে ক্রিয়াশক্তি পর্যন্ত শক্তির খেলা রয়েছে কারণ ক্রিয়া শক্তির ব্যাপার ব্যতীত আভাস ঘনীভূত সাকার রূপে পরিণত হতে পারে না।

আমরা বিন্দুর কথা বলেছি। সৃষ্টিমুখে একই বিন্দু ত্রিধা বিভক্ত হয়ে বিন্দুত্রয়রূপে আবির্ভূত হয় অর্থাৎ সমষ্টিতে যা এক বিন্দু ব্যষ্টিতে তা হল তিনটি বিন্দু।

প্রকাশাংশ ও বিমর্ষাংশ উভয়েরই মূল সৃষ্টির কারণ। প্রকাশাংশকে অম্বিকা এবং বিমর্ষাংশকে শান্তা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অম্বিকা বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী এই তিন শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হয়। সেইরূপ শান্তা— ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে অভিব্যক্ত হয়। অম্বিকা ও শান্তা যেখানে সাম্যভাবাপন্ন তারই নাম মূলবিন্দু বা সমষ্টি বিন্দু। তদ্রূপ তিনটি ব্যষ্টিবিন্দুও বুঝতে হবে। এই তিনটি বিন্দুর প্রথমটি বামা ও ইচ্ছার সাম্যরসরূপ, দ্বিতীয়টি জ্যেষ্ঠা জ্ঞানের ও তৃতীয়টি রৌদ্রী ও ক্রিয়ার সাম্যরূপ। বলা বাহুল্য এই তিনটি বিন্দুই মূল ত্রিকোণের তিনটি বিন্দু যাকে মূল বিন্দু বলেছি তা ঐ মূল ত্রিকোণের মধ্য বিন্দু। অম্বিকার সঙ্গে শান্তার সাম্যরসে যে মূল বিন্দুটির অভিব্যক্তি হয় তাই পরাবাক নামে প্রসিদ্ধ।

পরসত্তা বা সদাশিব এই মূল বিন্দুরই অবস্থান্তর। সেইরকম বামা ও ইচ্ছা উভয় শক্তির সাম্যরসে যে বিন্দু প্রকট হয় তার নাম পশ্যন্তী বাক। জ্যেষ্ঠা ও জ্ঞানের সাম্য হতে যে বিন্দু প্রকট হয় তার নাম মধ্যমা বাক এবং রৌদ্রী ও ক্রিয়ার সংঘর্ষে যে বিন্দুর উদ্ভব তার নাম বৈখরী বাক।

এই উদ্ভুত ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুটি পরমাতৃকা এবং তিনদিকের তিনটি মাতৃকা বিন্দু বলে জানবে। এই ত্রিকোণের বাম দিকের বক্ররেখা পশ্যন্তী বাকের প্রসার। ঊর্ধ্বদিকে বা সম্মুখের সরল রেখা মধ্যমার প্রসার এবং দক্ষিণ দিকের প্রত্যাবর্তনমুখী রেখা বৈখরী বাকরূপে পরিচিত। এটাই যোনিস্বরূপ বিশ্বমাতৃকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শব্দব্রহ্মবিদ ও যোগীগণও এই যোনিরূপের ধ্যান করেন।

সৃষ্টির নিয়ম এইরকম— জ্ঞান হতে শব্দের উদ্ভব হয়ে শব্দ হতে অর্থের আবির্ভাব হয়। জ্ঞানে যা আত্মগতরূপে প্রতীতি গোচরীভূত শব্দে তাই আত্মা হতে অনাত্মারূপে বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। এরপর শব্দ হতে অর্থস্তরে উপনীত হলে সৃষ্টির ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রহস্যবিদ ভর্তৃহরি বলেছেন যে তত্ত্ব হতে অর্থের আবির্ভাব হয়। অনাদি অনন্ত শব্দ-তত্ত্বকেই তিনি মূলতত্ত্ব বলেছেন। এই অক্ষরস্বরূপ। এই অর্থরূপে বিবর্তিত হয়। যে মতে শব্দব্রহ্মের অতীত পরব্রহ্ম স্বীকৃত হয় ও সেই অনুযায়ী শব্দাতীত পরব্রহ্ম থেকে শব্দ এবং শব্দ হতে অর্থ প্রকট হয়ে থাকে। শব্দের স্ফূর্তি হয় শব্দাতীত চৈতন্য হতে। এই শব্দই অর্থরূপে পরিণত হয়। বস্তুত শব্দও শক্তি বিশেষ অর্থ তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বিষয়টি আরও সহজভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছি। মূলে যে নিষ্কলঙ্ক পরমপদের কথা বলা হয়েছে তা পরম শিব এবং তাই বিশ্বের পরম স্বরূপ। সেই একই সত্তা, তখন বিশ্ব মহাশক্তির সঙ্গে এক। মহাশক্তি পরমেশ্বরের সঙ্গে এক এবং পরমশিব পরম অব্যক্তের সঙ্গে এক। এইটি নিস্পন্দ স্থিতি। এতে স্বাতন্ত্র্যযোগে স্পন্দন ওঠে। স্বাতন্ত্র্য এই স্থিতিতে পরম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন বলে এর যোগও এক হিসেবে নিত্যযোগই বলতে হবে। এই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বলা চলে যে স্পন্দনহীন সত্তাতে নিরন্তন স্পন্দন উঠছে এবং এও বলা চলে যে এ একবার মাত্র উঠেছে এবং কখনও তার নিবৃত্তি হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য যে নিস্পন্দ সত্তার নিস্পন্দতা কখনও ক্ষুণ্ন হয় না। বুদ্ধি এর ধারণা করতে পারে না। কিন্তু আত্মা স্বানুভাবের মধ্যে একে পরিস্ফুটভাবে ধরতে পারে কারণ প্রমাণের গোচর না হলেও এ নিত্য বিরাজমান। শুদ্ধ স্পন্দনের বহির্মুখিতার সঙ্গে ঐ একের মধ্যে যেন বৈচিত্র্য ভাসতে থাকে। তখন শিব শক্তি ও বিশ্ব একটু আলাদা আলাদা ভাবে ভাসতে থাকে অথচ যোগসূত্র ছিন্ন হয় না। তাই শিব হলেন শক্তির উন্মুখ এবং শক্তি হলেন বহির্মুখ অর্থাৎ যেন শিবের অখন্ড স্বরূপে শাশ্বত রূপে ব্যক্ত হয় যার জন্য তার এক অংশ যুক্ত থেকেও যেন পৃথক হয়। এই পূর্ণশক্তি এবং তার অংশ। আগের মতই তার এক অংশ এতে যুক্ত থেকেও যেন পৃথক। এই অংশটি বিশ্ব। এ শক্তিগর্ভেই প্রকাশিত হয় এবং শক্তির সঙ্গেই যুক্ত থাকে। এ যেন শক্তির গর্ভাধান। তারপর যখন ঐ বিশ্ব শক্তিগর্ভ থেকে পৃথক হয় তাই হল সৃষ্টি। এ প্রসবের অনুরূপ একটি ব্যাপাব বিশেষ। এখানে শক্তি সৃষ্টি করেন এবং শিব থাকেন তটস্থ বা উদাসীন। অথবা শিবের কর্তৃত্ব স্বীকাব কবে শক্তিকে সহকারী অথবা কারণরূপে গ্রহণ কবা যায়। অতি প্রাচীন আগমে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে মায়িক সৃষ্টির পূর্ববর্তী সৃষ্টিকে আদি স্বর্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আদি স্বর্গ পবমেশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছানিবন্ধন প্রকাশিত এবং নিজের স্বরূপ হতে অভিন্নরূপে ভাসমান বিশ্ব। মায়া দ্বারা সৃষ্টির ইচ্ছা হলে তিনি নিজ স্বাতন্ত্র্যবলে আপন আত্মরূপী দর্পণে অনন্তগ্রাহ্য ও অনন্তগ্রাহক অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভা সমান করেন। এইগুলি গ্রাহ্য ও গ্রাহক আভাসরূপী ভাব। এইগুলি পরমেশ্বরের নিজ অঙ্গরূপে বর্ণিত হবার যোগ মায়িক সৃষ্টিতে এই সকল বিচিত্র ভাবরাশির মধ্যে যে গুলি দেহ প্রাণ ও বুদ্ধিশূন্য সেইগুলিকে নিজের খন্ড খন্ড রূপ হিসেবে প্রকাশ করেন। এই প্রক্রিয়ার ফলে ঐ সকল আভাসরূপী ভাব গ্রাহকরূপ ধারণ করে। এ ছাড়া শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি ভাবরাশি ইদং প্রতীতির বিষয়ীভূত বলে এদের চিদ্রুপতারহিত অথবা অচিৎরূপে প্রকাশিত করেন। এরা ঐ সমস্ত গ্রাহকের গ্রাহ্য। এইজন্য দেহাদি কর্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব নিজ আত্মায় ধারণ করে এবং শব্দাদি কার্যত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব রূপ ধারণ করে। এরই প্রভাবে একটি অজড় ও অপরটি জড় নামে পরিচিত। মূলে জড় বা অজড নামে কোন পৃথক বস্তু নেই। এর মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য আছে। শব্দাদি জড়েরও আছে। দেহাদি জড়েরও আছে। অজড়ের বৈচিত্র্য সন্তান ভেদে তো আছেই, তা ছাড়া বন্ধনের তারতম্য ভেদেও আছে।

প্রমাতৃগণের সংকোচ বিভিন্ন প্রকার এবং তাদের গতিও বিভিন্ন প্রকার। শাক্তদৃষ্টিতে

আদি স্পন্দনের পরিণামগত প্রমণটি এই- মূলে যা নিষ্কল ও নিস্পন্দ, স্পন্দন যোগে তাই হয় শিব শক্তি। এই মূল বিন্দু। এ ঠিক ব্রহ্ম নয় কিন্তু ব্রহ্মবিন্দু।

মনে রাখতে হবে সৃষ্টির উন্মুখ দশাই বিন্দু। এই হল পঞ্চহীন নিরাকার। বর্ণ প্রতীকরূপে এই অঃ, শূন্যাকার বিসর্গান্ত বিন্দু। এ স্পন্দনময়ী সংবিৎ ভিন্ন আর কিছুই নয়। বলা বাহুল্য এ প্রকাশ স্বরূপ। ব্রহ্মও প্রকাশ স্বরূপ বটে কিন্তু এ ব্রহ্ম নয়। কারণ এতে স্ফুরত্তারূপ লহরী আছে। ব্রহ্মে তা নেই। এটিই সামরস্যস্থিতি। এরই নামান্তর কাম যা সৃষ্টির প্রবর্তক। আগমের পরিভাষাতে এরই নাম রবি। স্পন্দন অবস্থায় যখন এর সাম্যভঙ্গ হয় তখন দুটি বিন্দু পৃথক থাকে। একটি অগ্নি ও অপরটি সোম। অগ্নিও সোমের সাম্যাবস্থাই কাম বা রবি। বৈষম্য অবস্থায় অগ্নি ও সোম পৃথক পৃথক। সাম্যভঙ্গে অগ্নির ক্রিয়াও পৃথক। অগ্নি সক্রিয় হয়ে সোমবিন্দুকে স্পর্শ করে এবং সোমবিন্দু তখন বিগলিত অবস্থায় ক্ষরিত হয়। সোম যখন সক্রিয় হয়ে অগ্নিবিন্দুকে স্পর্শ করে তখন অগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে সোমকে শোষণ করে। সোমের ক্ষরণে সৃষ্টি ও ক্ষরণ বন্ধ হলেই সংহার হয়। সংহার কালে সোমের ক্ষরণ হয় না, সে নিজেকে আহুতি দেয়। আহুতিতে সংহার ও ক্ষরণে সৃষ্টি হয়। স্থিতিতে আহুতি ও ক্ষরণ সঙ্গে সঙ্গে চলে। আবার প্রকারান্তরে স্থিতিতে আহুতিও নেই ক্ষরণও নেই।

এই যে সাম্যময় কাম বিন্দু তা দুটি বিন্দুর মিলন স্বরূপ। একটির নাম অগ্নি অপরটির নাম সোম, তা অনেক আগেই বলা হয়েছে। অগ্নি রক্তবর্ণ ও সোম শুক্লবর্ণ। ঐ মহাবিন্দু থেকে কৈন্দব চক্র বা মধ্যচক্র রচিত হয়। এর উপাদান ক্ষরিত অগ্নিপৃষ্টে সোমধারা যা সংবিৎ, চিৎকলা বা হার্দ্ধকলা নামে প্রসিদ্ধ। এ সোমপ্রধান হলেও অগ্নিসোমাত্মক। এই মধ্য চক্র বা মধ্য ত্রিকোণে দুটি দিক আছে। একটি অন্তর ও অপরটি বাহ্য। অন্তর ত্রিকোণটি পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই তিন বাক মাতৃকা দ্বারা রচিত। পরা মাতৃকা বা পরা বাক থেকে এই তিন মাতৃকার উদ্ভব। বাহ্যচক্রটি বৈখরী রূপ তত্ত্বাত্মক। একেই আমরা বিশ্ব হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকি।

যে স্থিতিতে শিব ও শক্তি সবপ্রকারে অভিন্ন তা নিস্কল বলে নিবংশ, শিব ও শক্তি উভয়েই নিবংশ একে সাম্য জ্ঞানে ভুল করা উচিত নয়। কারণ এই অবস্থায় শিব ও শক্তি উভয়েরই অস্তিত্ব নেই। যাতে আছে নিত্য সিদ্ধ এক ও অদ্বৈত রূপ।

পরম শিবের অংশ অম্বিকা এবং পরাশক্তির অংশ শান্তা। অম্বিকা ও শান্তার সাম্যরসই মহাবিন্দু। এই কাম্য এই মহাবিন্দুর সৃষ্টি ও লয় নাই। অম্বিকা ও শান্তার মিলনেই পরা বাকের উৎপত্তি। এই পরবাকের মধ্যে ছত্রিশ তত্ত্বময় বিশ্ববীজ নিহিত থাকে। যখন গর্ভ থেকে বিশ্বকে পরিস্ফুট করা হয় (নিঃসরিত) তখন সেই শক্তির নাম বামা। বামা অঙ্কুশের মত প্রতীয়মান। এই মূল ত্রিকোণের নাম রেখা। এ ইচ্ছাশক্তি রূপা পশ্যন্তী বাক।

জ্ঞানশক্তি স্বরূপিণী জ্যেষ্ঠা মধ্যমা বাক। এটি মূল ত্রিকোণের অগ্র বা সরলরেখা। অম্বিকা ও শান্তা শক্তির সাম্য হলে শব্দ ব্রহ্মের যে রূপ প্রকাশিত হয় তার নাম পরা। সেইরকম ইচ্ছা ও বামা শক্তির সাম্যভাবে হলে শব্দব্রহ্মের দ্বিতীয় রূপ পশ্যন্তী বাকের আবির্ভাব হয়। জ্ঞান ও জ্যেষ্ঠাশক্তির সাম্যভাব হলে শব্দব্রহ্মের তৃতীয় রূপ মধ্যমা প্রকট

হয় এবং অন্তে ক্রিয়া ও রৌদ্র শক্তির সাম্যভাব শব্দব্রহ্মের চতুর্থ রূপ বৈখরী প্রকট হয়। এইভাবে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে প্রকাশের অংশভূতা শক্তি অরূপা কিন্তু যখন তা বিসর্গের অংশ সহ সমরস্তাক হয় তখন তা রূপময়ী। এই রূপই বাক।

বাকের গর্ভে আছে তত্ত্ব বা বিশ্ব। সৃষ্টির মূলে যে ত্রিকোণ আছে তা বাঙ্ময়। এর মধ্যে তিনটি রেখা তিনটি বাকের স্বরূপ এবং মধ্যবিন্দুটি পরাবাক। পরাবাকে বিশ্ব আছে কিন্তু তা গর্ভস্থ বামাতে প্রসৃত। জ্যেষ্ঠাতে তা বিকশিত এবং বৈখরীতে পূর্ণ বিগ্রহধারী বিন্দু হতে সৃষ্টি ও সংহার উভয়ই হয়।

নবযোনি চক্র বৈখরী বাঙ্ময়। নবযোনিচক্রই শ্রীচক্রের নয়টি চক্ররূপে পরিণত হয়। ভিতর থেকে বাইরের দিকে চক্রগুলির নাম যথাক্রমে মহাবিন্দু বা সর্বানন্দময় চক্র, ত্রিকোণ বা সর্বসিদ্ধিপ্রদ চক্র, অষ্টকোণ বা সর্বরক্ষাকর চক্র, দুইটি দশকোণ বা সবার্থসাধক সর্বরোগহর চক্র, চর্তুদশার বা সর্বসৌভাগ্যদায়ক চক্র, অষ্টাদশ কমল বা সর্বসংক্ষোভক চক্র, ষোড়ষদল কমল বা সর্বাশা পরিপূরক চক্র ও তিনটি চতুরস্র বা ভূপুর বা ত্রৈলোক্য মোহন চক্র।

ভাবনা উপনিষদে আছে যে অন্তর যাগ অথবা আত্মধ্যানের সময় উপাসককে নিজের দেহকেই শ্রীচক্র জ্ঞান করতে হবে। এখানে চিন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে দেহ অথবা বিশ্ব আত্মা থেকে অভিন্ন এটাই সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার, তন্ত্র কোন অলীক কল্পনা নয় ভারতের সাধক ও যোগীদের চিন্তাধারা ও ভাব এবং কাজ বহুমুখী হলেও, তন্ত্রশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আজও চোখে পড়ে, যেমন দেহতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সামাজিক সামঞ্জস্য রক্ষার ক্ষেত্রে তন্ত্রশাস্ত্রের অবদান আছে, তেমনি রহস্যময় মহাশক্তির দ্বার উন্মোচন একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্রতেই ক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। তন্ত্রের প্রধান দিক দুটি—আগম ও নিগম। যেখানে দুর্গা (পার্বতী) প্রশ্ন করছেন ও শিব উত্তর দিয়েছেন সেইটিই 'আগম', অপরদিকে শিব যেখানে প্রশ্নকর্তা ও পার্বতী উত্তর দিচ্ছেন এইটিই 'নিগম'। অবশ্য আগম শাস্ত্রেরই প্রাধান্য বেশি। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ এখন উজ্জ্বল হয়ে আছে— তা ছাড়া স্বয়ম্ভু শিবও কম নয়। অমরনাথের শিব ও পশুপতিনাথের শিব জ্যোতির্লিঙ্গ নয় কিন্তু সব শিব ভক্তের নিকট স্মরণীয় ও উপাস্য।

শিব ও শক্তি অভিন্ন। শিব ছাড়া শক্তি থাকতে পারে না এবং শক্তি ব্যতিরেকে শিব শববৎ। শক্তিপীঠ হিসাবে পূর্ণগিরি, পিথরাগড় জেলার হিমালয়ের উপর, আসামেতে কামাখ্যা মন্দির, গুজরাটে গিন্নার, মাদ্রাজে মীনাক্ষী ও কন্যাকুমারী, উড়িষ্যার যাজপুরে ও পুরীর বিমলামন্দির ও কাশ্মীরের বৈষ্ণবীমাতার মন্দির (বিষ্ণুদেবী) প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। গুন্টুর হয়ে অমরাবতীতে শক্তিপীঠ আদি শঙ্করাচার্যের দ্বারা সেবিত হয়েছিল। কাঞ্চিপুরমে কামাখ্যা শক্তিপীঠটি রাজা বলির ঐতিহাসিকতা আজও বহন করছে।

পশ্চিমবাংলায় তারাপীঠ, কালিঘাটের কালী, দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির, বীরভূম জেলার নলহাটীতে শক্তিপীঠ প্রাচীনত্বের নিদর্শন বহন করে। হালিশহরে সাধক রামপ্রসাদ সেনের কালিমন্দির প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবাংলায় শক্তিসাধকদের ভিতর নবদ্বীপের আগমবাগীশ,

কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, সাধক বামাক্ষ্যাপা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও অনেক অজ্ঞাত সাধক পশ্চিম বাংলায় ছিলেন ও আছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও শক্তিতত্ত্বকে উপেক্ষা করেননি। গুজরাটের গীর্ণারে দত্তাত্রেয়ের সাধনপীঠ তাছাড়াও জৈনদের মন্দির দর্শনীয়। অযোধ্যায় প্রাচীন শক্তিপীঠ আজও দেখা যায়।

বর্তমানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর সাম্প্রদায়িকতা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত সাধকের নিকট কোনরূপ ধর্মের বৈষম্য নেই। আদি শঙ্করাচার্যকে অনেকেই শৈব বলে থাকেন, কিন্তু তিনি বদ্রিকাশ্রমে থাকাকালীন নারায়ণের পূজায় দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন, এমন কি, তাঁরই সৃষ্টি দশনামী সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই ওঁ নমঃ নারায়ণায়ঃ বলে একে অপরকে সম্ভাষণ করে থাকেন।

তান্ত্রিক নামটি অজ্ঞান ও মূর্খ লোকেদের কাছে অবজ্ঞার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অশিক্ষিতের কাছে ভয় ও ত্রাসের বিষয় বলে প্রতিপন্ন। কিন্তু তন্ত্র ভিন্ন তো কিছু নেই। প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্র হচ্ছে জনহিতকর কাযের জন্য বিশেষ নিয়ম শৃংখলা বিশিষ্ট কর্ম। সামগ্রিক উন্নতির ও পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য এবং দৃষ্টি। প্রাচীন ভারতের উত্তর তন্ত্রসাধকগণ জনকল্যাণের জন্য বহু শ্রম স্বীকার করেছেন, এতে একবাক্যে সকলেই নিঃসন্দেহ।

আদি শঙ্করাচার্য বুদ্ধদেবকে তাঁর স্তোত্রমালায় অবতার রূপে স্বীকার করেছেন। বুদ্ধদেব বেদ, উপনিষদ ও পুরাণকে উপেক্ষা করেননি। হীনযান, মহাযান ও বজ্রযান নামে বুদ্ধদেব তিনটি বিভাগ করেছিলেন। তাঁরই সময়ে তন্ত্রকে জীবনের প্রধান সাধনা করে গড়ে তোলার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। বৌদ্ধতন্ত্র ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার অপর দিকদর্শক বলা যায়।

তন্ত্রতে দেহবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক সমস্ত কিছুই আছে। সুতরাং একে এক কথায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ বলা যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিষ্ট্রি ১৯২৫ ভলুম-২, ইনট্রোডাকসান-পি এক্স, এক্স, এক্স তে প্রাচীন ভারতের রসায়ণশাস্ত্র ও ঔষধ বিজ্ঞানে তন্ত্রের প্রাধ্যান্যের কথা লিখেছেন।

বৌদ্ধতন্ত্রে শিব ও পার্বতীর স্থলে বোধিসত্ত্ব ও প্রজ্ঞাপারমিতা স্থান পেয়েছেন। উভয় তন্ত্রেই ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে মুক্তির আস্বাদন এক জন্মেই দেহ মন ও আত্মার সাধনায় সম্ভব বলেই যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ঠিক একই কথা বলবে।

বৃহৎসংহিতায় (৫৮৭ খৃঃ) বরাহমিহির পারদকে জীবনদায়ী ওষুধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এই তথ্য তন্ত্রশাস্ত্র যোগেই সংগ্রহ করেছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী শৈলম্ নামক স্থানে নাগার্জুনের গবেষণাগার ছিল। তাঁর লেখা রসরত্নাকর সম্ভবত ৭ম শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তা ছাড়াও রসার্ণব রসকল্পে (১০০০ খৃষ্টাব্দ) পারদ শোধনের মূল্যবান তথ্যাদি আছে। রসায়নবিদ নাগার্জুন সোনা, রূপা, তামা, লোহা, সীসা, টিন, দস্তা প্রভৃতি ধাতুকে কি ভাবে শোধন করা যায় এবং সেগুলো জীবনদায়ী ওষুধের সঙ্গে মেশানো যায় তা তন্ত্রশাস্ত্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং যেগুলি পরীক্ষার দ্বারা মানুষের উপকারে আসতে পারে তা নিয়ে গবেষণা করে লিখে গিয়েছেন।

সোমদেবের রসেন্দ্রচূড়ামণি (১২০০ খৃঃ) মাতৃগর্ভে ভ্রূণ কি ভাবে বাড়তে থাকে তা মাতৃকাভেদ তন্ত্রে (৭০০-৮০০ খৃঃ) লেখা আছে। প্রথমে বায়ু, জল ও তাপের প্রভাবে বুদবুদের আকার নেয় ভ্রূণ, ১৫দিনের মধ্যেই চতুর্ভূজের আকার ধারণ করে, জননীর খাদ্য থেকে পুষ্টি লাভ করে বাড়তে থাকে। প্রথমে ছয়টি অংশ— মাথা, দুটি হাত, দুটি পা ও মধ্যকার অংশ গড়ে ওঠে। বায়ু, পিত্ত ও কফ অনুকূল হলে ভ্রূণের চেতনার সঞ্চার হয়। ক্রমশঃ নাক, চোখ, মুখ, কান, পেট, বুক ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। প্রপঞ্চসার তন্ত্র ও সারদা তিলক তন্ত্রে মাতৃগর্ভের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কাজেই তন্ত্রকারদের সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হই।

স্নায়ুতন্ত্রের প্রক্রিযাব ভিতর কুন্ডলিনী শক্তির ক্রিয়াই প্রধান। ষট্চক্রনিরূপণতন্ত্র, নিগমতন্ত্রসার তন্ত্র এই বই দুটিতে আমাদের দেহের স্নায়ুমন্ডলীর বহু সূক্ষ্ম তথ্যাদি আমাদের বিস্ময় জাগায়।

তন্ত্রের নাড়ী ও চক্র পাশ্চাত্য শারীর বিজ্ঞান সম্মত। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যার জন উডরফ (আর্থার এভলিন) তন্ত্রমতে দীক্ষা নিয়ে বহুদিন গুরুর নির্দেশানুসারে শিক্ষা লাভ করে বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তিনি তন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থও লিখেছেন— যেমন 'দ্য পজেটিভ সায়েন্স অব দ্য এনসেন্ট হিন্দুজ'। নাড়ী, স্নায়ু ও সহযোগী স্নায়ুর কার্যকারিতা সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে 'ষট্চক্র নিরূপণ' গ্রন্থে। এখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান এই সমস্ত স্নায়ু বিষয়ে বিশেষ রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারেনি। এই সমস্ত সূক্ষ্ম ও রহস্যময় তথ্যাদির জ্ঞান বিজ্ঞান আমরা একমাত্র প্রাচীন তন্ত্র বিজ্ঞান চর্চা থেকেই জানতে পারি। গুরুমস্তিষ্কের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়াই অর্থাৎ মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত কুলকুন্ডলিনীর উত্তরণই তন্ত্র সাধনার প্রধান কাজ, এতে বুদ্ধির অসাধারণ বিকাশ ও প্রকাশ ঘটে।

বর্তমানে পরিবেশ দূষণের ফলে, অধিকাংশ ব্যক্তিই নানা রোগের শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বায়ুরোগ ও স্নায়ুবোগের প্রার্দুভাব দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তন্ত্রের সাহায্য বিশেষ ফললাভ হতে পরে।

তন্ত্রশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত, প্রপঞ্চসার তন্ত্র (১১০০ - ১২০০ খৃঃ) — এখানে দেহের পরিপাক ক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। খাদ্যের সার অংশ কিভাবে গ্রহণ করে অসাব অংশ ত্যাগ করা হয় তা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। খাদ্য গ্রাসে পাকস্থলীতে (অগ্ন্যাশয) যায়, তারপর সেখান থেকে পিত্তাশয়ে। যকৃৎ-নিঃসৃত পাচক রসের (পিত্ত) সঙ্গে মিশ্রণে তা কটুগন্ধযুক্ত হয়। তারপর এই পদার্থ অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং পিত্তের ক্রিয়া চলতে থাকে। পরিপাক অন্তে যে 'রস' উৎপন্ন হয় তা রক্ত গঠনে সাহায্য করে।

কক্ষপুষ্ট তন্ত্র— নাগার্জুন বলছেন, "শস্যক্ষেত্র ঘরবাড়ি থেকে কীট পতঙ্গ, ইঁদুর, পোকামাকড় প্রভৃতির থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তন্ত্র পদ্ধতি নির্মিত ধূপ থেকে। কিন্তু ধূপ থেকে যে গন্ধক বের হয় তা যে কোন ফুলকে বিবর্ণ করতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রে যে সমস্ত উদ্ধৃতি আছে তা থেকে কৃষিজমি শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।"

রসবতী শত তন্ত্র--- কল্যাণ কামধেনু বিবরণে গাছপালা, লতাপাতা ইত্যাদির দ্বারা চিকিৎসার বিবরণ রয়েছে। প্রাচীন তন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের রোগ ব্যাধির অন্তত শতকরা আশী ভাগের চিকিৎসা ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে।

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র (৮০০- ১০০০ খৃঃ)--- প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি বায়ু সম্পর্কে ধারণ, চালন, সংকোচন, প্রসারণ বিষয়ে লেখা আছে। তন্ত্রোক্ত চিকিৎসা পদ্ধতিতে বহু রোগের নিরাময় সম্ভব।

চিদগগনচন্দ্রিকা তন্ত্র--- ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক) ও ৫টি কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, বাক, উপস্থ ও পায়ু) ধর্ম ও বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বণর্না আছে।

মেঘমালা তন্ত্র--- এখানে আবহ বিজ্ঞানের কথা বিশদভাবে বলা আছে। এটি রুদ্র যামল তন্ত্রের অংশ বিশেষ।

মাতৃকাভেদ তন্ত্র--- জ্যোতির্বিজ্ঞান, চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

বিশ্বকর্মশিল্পম্ তন্ত্র--- শিল্পশাস্ত্রম পর্যায়ে ঘর বাড়ি মন্দির ইত্যাদি নির্মাণের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে।

তবে সামগ্রিকভাবে দেখলে প্রাচীন ভারতের তন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত এক অসাধারণ কীর্তির পরিচায়ক। সকল বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্র জীবনধারণের উপযুক্ত শাস্ত্র এবং জীবনধর্মী বললেও অত্যুক্তি হবে না। ব্রহ্মর্ষি বলতে একমাত্র বশিষ্ঠ দেবকেই বোঝায়, তিনি রাজা দশরথের কুলগুরু তথা শ্রীরামচন্দ্রের গুরু ছিলেন এবং রামকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দান করেন (যোগবাশিষ্ট রামায়ণ)। বশিষ্ঠদেব পরম তান্ত্রিক ছিলেন। বীরভূমের তারাপীঠে তাঁর আসন আছে। আসামে আশ্রম। তাঁর নিবাস ছিল নৈমিষারণ্যতে, বর্তমান সীতাপুর জেলায় (উত্তরপ্রদেশ)।

চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত ও নেপাল প্রভৃতি দেশে প্রকৃত বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রভাব এখনও বিদ্যামান। বেদ-পুরাণ-তন্ত্র ভারতীয় প্রাচীন সাধনার প্রাণবিন্দু বললেও অত্যুক্তি হবে না। সময়োপযোগী এই তিন শাস্ত্রের প্রাধান্যই সমান, ক্ষমতাও এক। আউল-বাউল সূফী প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রেরই শাখাপ্রশাখা।

তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার লাভ। কোন রকম ভোজবাজি অলৌকিকত্ব বা যাদুবিদ্যা নয়।

মহাসাধক পূর্ণানন্দ নাথ তাঁর শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে দ্বিতীয় প্রকাশে ১৫১ তম শ্লোকে বলেছেন "মননাৎ ত্রাণা চৈবমদ্বয় স্যাব বোধনাৎ" এই শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থটি এখনও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

তন্ত্রের প্রাধান্য অঙ্গ (বিহার), বঙ্গ (বাংলা), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), আসাম, কেরল, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, কচ্ছ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। বেদে বলা আছে নিরক্ত বা রহস্যময় বিদ্যা গুরুদেব বা আচার্যদেবের বিশেষ কৃপা ভিন্ন আয়ত্ত

করা যায় না কারণ তা গুপ্তবিদ্যা। তন্ত্রও গুরুমুখী বিদ্যা যা ক্রিয়াযোগের ও মন্ত্রের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হয়।

বৈদিক যুগেও মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে খনন কার্যের পর প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে, যেমন যন্ত্র, চক্র, মণ্ডল প্রভৃতি। তা ছাড়াও ঐতিহাসিক স্যার জন ম্যর্শাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহনী, ননীগোপাল মজুমদার, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেছেন যে প্রাগৈতিহাসিক খনন কার্য থেকে শিব শক্তির উপাসনার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। সুতরাং ভারতবর্ষে মহাশক্তিরূপ বিশ্বমাতার ধারণা ও উপাসনা অতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল তা অনস্বীকার্য। বেদে সপ্ত মাতৃকার উল্লেখ আছে এঁরা হলেন ব্রহ্মাণী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ইন্দ্রানী বা কৌমারী, বারাহী, নারসিংহী, চামুণ্ডা। ঋগ্বেদের শ্রীসূক্তে দেবীর প্রশংসায় পনেরোটি কবিতার (শ্লোক) অংশ আছে। ঋক্‌বেদের দেবীসূক্তে অম্ভৃণ ঋষির বাক নামক বিদূষী কন্যার মহামায়ার সঙ্গে একাত্মতা অনুভূতির বর্ণনা ব্যক্ত হয়েছে।

কেনোপনিষদে (৩/২৫) উমা-হৈমবতীর উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে শিবকে গিরীশ, গিরিশন্ত ও গিরি আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং দেবী উমাকে গিরিজা বলে সম্বোধন-ও দেখা যায়।

মুণ্ডকোপনিষদে কালী, করালী, মনোজবা, অগ্নিশিখা নামগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অগ্নিশিখাকে অগ্নির জিহ্বা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১০/১/৭) বিরোচনী, কাত্যায়নী, কন্যা, কুমারী নামগুলি বিশেষ অর্থবহ।

তন্ত্রশাস্ত্রে পরম শিব পরাসম্বিৎ ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রকাশ রূপ শিব এবং বিমলা রূপ শক্তির মিলনই পরাসম্বিৎ। সারদা তিলক তন্ত্রে পণ্ডিত বাসবভট্ট বলেছেন শক্তি যখন শিবযুক্ত হন তখন উভয়ই চিৎপ্রকাশ ও চিৎশক্তি ও একরস সম্পন্ন।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মতে তান্ত্রিক সাধনা যে কত প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বৈদিক ও তন্ত্রসাধনা ভারতবর্ষে পাশাপাশি চলে আসছে। তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্য ও রহস্যময়। চীন, তিব্বত, মিশর, মেসোপটোমিয়া (ইরাক) প্রভৃতি দেশেও তন্ত্রচর্চার প্রচলন ছিল। বৈদিক ও বৈদান্তিক সাধনা দেশ এবং বর্ণবিশেষে আবদ্ধ। কিন্তু তন্ত্র সাধনার সেরকম কোন সীমা বন্ধন নেই। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি বহু ধর্মাবলম্বীর মধ্যে তন্ত্রসাধনার প্রচলন রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে তো তন্ত্রের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল—বজ্রযান, কালচক্রযান এমন কি শক্তি পূজার (মহাকালী) বিস্তার দেখা যায় নেপাল ও তিব্বতে। নাগার্জুন মন্ত্রযানের সাহায্যে ও মাধ্যমে তন্ত্র সাধনার প্রচার করে গেছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তন্ত্রের নানারূপ আচার ও পদ্ধতি দেখা গেলেও মূল সাতটি আচার থেকেই এগুলির উৎপত্তি। মূল সাতটি আচার হলো বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তচার ও কৌলাচার।

অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করলেও দেখা যায় যে এই আচারগুলি সাধকের যোগ্যতা, অধিকার, শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। এমন কি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন-ভিন্ন আচারের

প্রাধান্য বেশি এবং অনেক অঞ্চলেই গুরু বা আচার্যদেবের আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থও প্রকাশিত ও প্রচারিত। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নানা সম্প্রদায়ও সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে। আঞ্চলিক ভিত্তিক ব্যতিক্রমও রয়েছে যেমন,

বঙ্গদেশে ক্রিয়াকেন্দ্রিক সম্প্রদায় (তন্ত্রসার গ্রন্থ), কাশ্মীরে প্রত্যাভিজ্ঞাতত্ত্ব নির্ণায়ক সম্প্রদায় (কাশ্মিরী শৈব গ্রন্থ), দক্ষিণ ভারতে শ্রীবিদ্যা সম্প্রদায় (সারদা তিলক ও ললিত রহস্য গ্রন্থ), উড়িষ্যায় ক্রিয়াকেন্দ্রিক সম্প্রদায় (তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী গ্রন্থ) তন্ত্রে ব্যবহারিক নির্দেশেরই প্রাধান্য। সর্বত্রই তন্ত্রের প্রকার ভেদ ও আচার ভেদ দেখা যায়। বঙ্গদেশে পঞ্চতত্ত্ব, বামাচার ও বীরাচারের সংখ্যাই বেশি। দক্ষিণ ভারতে শ্রীবিদ্যা ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রচলন। বঙ্গদেশে ক্রিয়াকেন্দ্রিক শ্রীচক্রে বা শ্রীযন্ত্রে বিন্দু, ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, অষ্টদলপদ্ম, ষোড়শদল পদ্ম প্রভৃতির চর্চা বেশি (শ্রীতত্ত্বচিন্তামনি—আচার্য পূর্ণানন্দ)।

তথ্য ও তত্ত্বগত চিন্তাধারা সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে। সাংখ্যদর্শন যেমন ২৫টি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেরূপ তন্ত্রশাস্ত্রও ৩৬টি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রয়েছে।

শাস্ত্রে পঞ্চকোষের আবরণের কথা উল্লেখ আছে যেমন অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। তন্ত্রে এই পাঁচটি ছাড়াও আরও একটি কোষের উল্লেখ আছে সেটি হল 'সত্ত্বময় কোষ' বা মহাপ্রকৃতি কোষ। এই কোষগুলি থেকে মুক্ত হওয়াই তন্ত্রসাধকের একমাত্র লক্ষ্য অর্থাৎ এই কোষগুলির আবরণ থেকে মুক্তিলাভ করাই হচ্ছে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতে তন্ত্রের প্রধানতঃ প্রসার হয়েছিল তিনটি আচারে। এগুলি হল বিষ্ণুক্রান্তা (বিন্ধ্যপর্বত মালার পাদদেশ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত), অশ্বক্রান্তা (বিন্ধ্যদেশ থেকে মহাচীন পর্যন্ত), রথক্রান্তা (বিন্ধ্যপর্বতমালা থেকে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নেপাল, তিব্বত পর্যন্ত। তা ছাড়াও সুমাত্রা, জাভা, কম্বোডিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল)।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে কুঞ্চক বা মায়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছে কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল, নিয়তি, এগুলিই অসীমকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। মায়া বা কুঞ্চক থেকে মুক্তি পেতে হলে কতকগুলি ক্রিয়া অবশ্যই করণীয়। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা লাভ করে উপযুক্ত গুরুর কাছে ক্রিয়াকেন্দ্রিক হয়ে ষট্‌চক্রভেদ, গ্রন্থিভেদ (রুদ্রযামল গ্রন্থ), পঞ্চ ও অপর এক অর্থাৎ ষষ্ঠ কোষের আবরণ মুক্ত করে, কুলকুণ্ডলিনীর উচ্চাবস্থাতে স্থিতিলাভই (শিবসতী গ্রন্থি ভেদ) মানুষের একমাত্র চরম লক্ষ্য। অর্থাৎ প্রকাশ ও বিমর্শ শিবশক্তির ঐক্যজ্ঞান সকল তন্ত্রশাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য। শিব ও শক্তির সমরস স্থানই মুক্তির কারণ। অদ্বৈতবোধ পুরোপুরি আয়ত্তে থাকলেই সামরস অনুভূতি লাভ তন্ত্রশাস্ত্রের মূল রহস্য।

তন্ত্রে বর্ণিত সদাশিবের ৫টি মুখ তাৎপর্যপূর্ণ। নেপালের পশুপতিনাথ এবং মধ্যপ্রদেশে মন্দ্রেশ্বর বিগ্রহরূপে এখনও পূজিত। সদাশিবের ৫টি মুখ যেমন পূর্বমুখ (সদ্যোজাত), দক্ষিণমুখ (অঘোর), পশ্চিমমুখ (তৎপুরুষ), উত্তরমুখ (বামদেব), উর্ধ্বমুখ (ঈশান)।

শিব ও শক্তির (পুরুষ প্রকৃতি) মহামিলনই তন্ত্রশাস্ত্রের মুখ্য সোপান। তা ছাড়া শুধু

শিব শববৎ ও শিবহীন শক্তি চঞ্চলা ও ধ্বংসকারিণী। শিবযুক্ত শক্তি সৃষ্টিকারী। ঋগ্বেদে অর্ধনারীশ্বরের উল্লেখ আছে। পূর্ণভাবে শিব শক্তির মিলনই অচিন্ত মহাশক্তির লীলারহস্য।

তন্ত্রসাধনায় পঞ্চমুন্ডীর আসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চমুন্ডীর আসনে বসে রামকৃষ্ণ পরমহংস, সাধক সর্বানন্দ, রাজা রাজকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ সিদ্ধিলাভ করেছেন। বামদেব (বামাক্ষ্যাপা) সিদ্ধ হয়েছেন লক্ষমুন্ডীর আসনে। শুধু তন্ত্র নয় যে কোন যোগ সাধনায় আসনের ভূমিকা অপরিসীম। আসন অর্থে বাইরের কোন আস্তরণ যার উপর বসে ধ্যান করা হয়। এটি সাধকগণ নিজেদের অবস্থা, অধিকার ও ক্রমানুসারে ব্যবহার করে থাকেন। আসনের মধ্যে পঞ্চমুন্ডি ছাড়া কুশাসন, কম্বল, গালিচা, অজিন (হরিণের চামড়া), ব্যাঘ্রচর্ম (বীরাসন), সিংহচর্ম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কাশীধামে মালদহিয়া রোডে বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমে শ্রী নবমুন্ডীর আসন বা সিদ্ধাসন (মহাশক্তির আসন) আছে। এই আসনটি ২০ বছরের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অংশে কিছু কিছু নবমুন্ডীর আসন আছে। নামকরণ অনুযায়ী বোঝা যায় নয়টি মুন্ডের উপর এই আসন স্থাপিত। মানুষ, বনমানুষ, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, সজারু, বিড়াল ও সর্প এই নয়টি পশুর মুন্ড দিয়েই নবমুন্ডীর আসন তৈরি।

কাশীধামের বিশুদ্ধানন্দ কাননের নবমুন্ডীর আসনটির শক্তি এখনও বর্তমান। শ্রী ভৃগুরাম পরমহংস, নিগমানন্দ সরস্বতী, উমানন্দ স্বামী, ভৈরবীমাতা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রী জ্ঞানানন্দ, ত্রম্বক বাবা প্রমুখ যারা কায়াসিদ্ধি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘায়ু হয়ে আছেন তাঁরা এখানে নিয়মিত আসেন।

দশ মহাবিদ্যা

"তান্ত্রিকেরা দেবী দুর্গার প্রথম মহাবিদ্যা কালীর সাধনা করেন বলেই শুনেছি, দেখেছি কিন্তু আপনি সম্মিলিত ভাবে দশ মহাবিদ্যার উপাসক। এর রহস্য কি?"

প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হলেন তান্ত্রিকাচার্য ভৈরবানন্দ। বৃদ্ধের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল। গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমার অতশত মহাভারত জানার দরকার কি? আর সে অধিকারই বা কোথায়?"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "অনেক কষ্টে এই ঘন অরণ্যে ভয় বিপদকে উপেক্ষা করে আমার কাছে তন্ত্রসাধন রহস্য সম্পর্কে জানতে এসেছ। তোমাকে আমি বিমুখ করবো না। ...তবে প্রত্যেক সাধকেরই কিছু কিছু গোপন ব্যাপার থাকে। সেগুলো ওঁরা কাউকে কখনও বলেন না, এই যে দশ মহাবিদ্যার মূর্তি গড়ে আমি পূজা করছি, এটি নির্দেশিত। স্বপ্নে পেয়েছি। পূজা পদ্ধতিও স্বপ্নাদিষ্ট সুতরাং ওগুলো সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কোরো না। বরং দশ মহাবিদ্যার বিষয়ে বলছি, মন দিয়ে শোনো।"

পশ্চিমবঙ্গের তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান মহাসাধক বামদেবের (বামাক্ষ্যাপা) পদধূলি ধন্য বীরভূম। সেখানে অনেকটা রাঙা মাটির পথ মাড়িয়ে একটা ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে দ্বারকা নদীর ধারে ভৈরবানন্দের আশ্রমের একপ্রান্তে ছোট একটা মন্দিরে ক্ষুদে ক্ষুদে মাটির পুতুলের মত দশ মহাবিদ্যা মূর্তি। ছোট হলেও নিঁখুত সুন্দর। কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা তৈরি করেছেন ভৈরবানন্দের নির্দেশে।

তান্ত্রিকাচার্য ভৈরবানন্দ একলাই থাকেন। মানুষজন একেবারে পছন্দ করেন না। খানিকটা খিটখিটে প্রকৃতির। ওঁর বয়স কত তা বোঝার উপায় নেই। বয়স জিজ্ঞেস করতে চটে গিয়ে বলেছিলেন, "তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সেটা বোধগম্য হবে না। সাধকদের বয়সের হিসেব তোমাদের মত সাধারণ মানুষের অঙ্কে হয় না।"

অবশ্য দেখলেই বোঝা যায় বয়সে উনি অতিবৃদ্ধ। কিন্তু ইস্পাতের মত ঋজু দেহ। চলাফেরা, কথাবার্তা কোথাও কোন জড়তা নেই। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ ওঁর দশটি ইন্দ্রিয়ই সমান কর্মক্ষম, সুস্থ সবল প্রাণবন্ত যুবকের মতো।

তান্ত্রিকাচার্য বললেন, "খুব সকালে এসেছ বাবা, আগে কিছু আহারাদি করো। তারপর কথা হবে।"

অতি যত্নে কলাপাতায় বন জঙ্গলের কিছু ফলমূল খেতে দিলেন। তারপর শুরু করলেন দশ মহাবিদ্যা কথন। পন্ডিত ব্যক্তি। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে প্রচন্ড দখল। বেশ

রসিকও। সেই সকাল থেকে টানা সন্ধ্যে পর্যন্ত একনাগাড়ে বলে গেলেন। মধ্যে তিনবার উঠেছিলেন ত্রিসন্ধ্যা পূজা ও অন্যান্য কাজের জন্য। ওঁর পূজাপদ্ধতি বিচিত্র। কিন্তু ওঁর কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাই এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব না।

দুর্গা তখন ভিন্নরূপে শিবজায়া সতী। সতীর বাবা মহারাজ দক্ষ তাঁর জামাই শিবকে (দুজনের সম্পর্ক মধুর ছিল না) জব্দ করতে শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।

শাস্ত্রমতে কোন যজ্ঞে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রয়ীর সমান অধিকার। ওঁদের ছাড়া যজ্ঞ হয় না। কিন্তু দক্ষরাজ শিবের ওপর রুষ্ট হয়ে, শিবকে অপমান করার জন্য শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।

ঝগড়া পাকানোর ধান্ধায় দেবর্ষি নারদ সতীর কানে ঘটনাটি সাতকাহন করে তুলে দিলেন। সতী নিমন্ত্রিতা না হয়েও দক্ষরাজের যজ্ঞে যেতে চাইলে শিব প্রবল ভাবে বাধা দিলেন। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে তুলকালাম কান্ড লেগে গেল। তাল বুঝে নারদ সরে পড়লেন।

শিব যখন কিছুতেই যেতে দেবেন না তখন দুর্গা (সতী) রুদ্রমূর্তি ধরলেন, ভীষণ চটে গিয়ে বললেন, "দ্যাখো শিব, তুমি বোধহয় আমার স্বরূপ ভুলে গেছো। আমিই সেই বিশ্বপ্রসবিনী ভগবতী মহামায়া, তোমার সাধনায় তুষ্ট হয়ে তোমার স্ত্রী হিসেবে ধরা দিয়েছি। তুমি আমাকে আটকাতে পারো এমন ক্ষমতা তোমার নেই, কিন্তু যেহেতু শাস্ত্রমতে তুমি আমার স্বামী তাই স্ত্রী হিসেবে তোমার অনুমতি চাইছি।"

শিব সতীর কথায় বিন্দুমাত্র আমল দিলেন না। ভাবলেন রেগে গিয়ে বোউ বোধহয় ভুলভাল বকছে। তখন দুর্গা (সতী) "দ্যাখো তবে আমি কে?" এই বলে শিবকে তাঁর গুহ্যাতিগুহ্য 'দশ মহাবিদ্যা' রূপ দেখিয়ে দিলেন।

শাস্ত্রমতে দুর্গার মহাবিদ্যা রূপ মূলতঃ আঠারোটি। শিব কিন্তু দুর্গার বিচিত্র রূপচ্ছটার রেট্রোস্পেকটিভ দেখতে দেখতে নিজেকে আর সামলাতে পারেননি। কোন রকমে দশটি রূপ দর্শন করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে "খুব হয়েছে, ঘাট মানছি। তোমার এই ভয়ঙ্কর উদ্ভট রূপাবলী দেখে মুন্ডু ঘুরে যাচ্ছে আমার। এবার ক্ষ্যামা দাও। তোমার ঐ কল্যাণীয়া শান্ত স্নিগ্ধ স্ত্রীরূপটিই দেখাও এবার" বলেই দুর্গার পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছিলেন।

শাস্ত্রমতে দুর্গার (চন্ডী, সতী, উমা, দাক্ষায়ণী ইত্যাদি) মহাবিদ্যারূপ অষ্টাদশ হলেও এর মধ্যে দশ মহাবিদ্যারূপ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং সর্বজনের বিশেষতঃ তন্ত্রসাধকদের কাছে এঁরা আরাধ্যা ও উপাস্যা।

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা মহাত্রিপুরাসুন্দরী
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণামাশু বিমুক্তিদা

—ভগবতী গীতা

কালি, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা— এই দশ মহাবিদ্যা।

এঁদের মধ্যে কালিকা দেবী বা কালীকেই তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কালী

একসময়ে গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা হিসেবে দুর্গা মেনকার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। মেয়ের নাম পার্বতী হলেও তার গাত্রবর্ণ শ্যামা এইজন্য গিরিরাজ কন্যার আর এক নাম রেখেছিলেন কালী। যথাসময়ে শিবের সঙ্গে তার বিবাহও হয়েছিল। একদিন কোন কারণে সুন্দরী শুভ্রবর্ণা অপ্সরীরা মহাদেবের কাছে এসেছিল। তাদের সামনে শিব পার্বতীকে কালী সম্বোধন করায় ওঁর খুব অভিমান হয়েছিল। পার্বতী গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এবং কৃষ্ণকোষ ত্যাগ করে শুভ্রবর্ণা হয়েছিলেন। তান্ত্রিকেরা কালিকা দেবীকে নানা রূপে ও নানা ভাবে পূজা করেন। কিন্তু যে নামেই উপাসনা করা হোক না কেন কালিকা সর্বত্রই ভীষণা, ভয়ঙ্করী, প্রলয়ঙ্করী ও আপাত দৃষ্টিতে ধ্বংসের প্রতিমূর্তি হিসেবেই কল্পনা করা হয়। এমন সাংঘাতিক রূপেই তিনি তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ধ্যায়েৎ কালিং করালাস্যাং মুন্ডমালা বিভূষিতাম্

চর্তুভূজাং শবারূঢ়াং স্মেরানন সরোরুহাম্

কালী মূর্তি তৈরি করা হয় মাটি, পাথর বা ধাতু দিয়ে। পুরশ্চর্য্যার্ণবে কালীর বিভিন্ন রূপ বর্ণিত হয়েছে। সে গুলি হলো— দক্ষিণাকালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, গুহ্যকালী, কামকলাকালী, সিদ্ধিকালী প্রভৃতি, কিন্তু জয়দ্রথ যামল মতানুযায়ী কালীর নানা মূর্তি যেমন— ডম্বরকালী, গহনেশ্বরীকালী, একতারাকালী, চন্ড্যাশাবরীকালী, বজ্রবটীকালী, রক্ষাকালী, ইন্দিবরকালী, ধনদাকালী, কলাহারীকালী, রমণাকালী, ঈশানকালী প্রভৃতি। আবার সম্মোহন তন্ত্রে মূর্তিভেদে— স্পর্শমণিকালী, চিন্তামণিকালী, সিদ্ধকালী, বিদ্যারাক্ষসীকালী, কামকালী, হংসকালী, গুহ্যকালী, (গুহ্যকালীর আবার সাত রকম রূপ আছে) বিভিন্ন নামে কালী অভিহিতা।

এদের মধ্যে সর্বাধিক যে মূর্তি চতুর্দিকে পূজিতা হন তিনি হলেন দক্ষিণাকালী। ইনি কল্যাণদাত্রী, মঙ্গলা, বরাভয়দায়িনী, শিবের বুকে দক্ষিণ পদ রেখে দন্ডায়মান। যদিও ইনি ভীষণা ভয়ঙ্করী মূর্তি কিন্তু তার মধ্যেও অপরূপ সুন্দর এক মহিমামন্ডিত রূপ বিকশিত। ইনি ঘনঘোর মেঘপুঞ্জের মত কৃষ্ণবর্ণা। গলায় পঞ্চাশৎ নর মুন্ডের মালা।

এই বিশ্ব থেকে মহাশূন্যে পঞ্চাশটি শূন্য বা পৃথিবী বিরাজ করছে, কালী আদিতে আদ্যাশক্তি রূপে এবং আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, চিদাকাশ ও সূর্যাকাশ এই পঞ্চশূন্যে বিরাজিতা।

কালী প্রলয়ঙ্করকারীণী রূপে লক্ষ কোটী ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করছেন আর সেই মহাপ্রলয়ের অবশিষ্ট পরিণতি শূন্য ও অন্ধকার। সে জন্য কালী কৃষ্ণবর্ণা। এ পৃথিবী ত্রিগুণাত্মিকা (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ), তাই কালিকা দেবী ত্রিগুণাময়ী। তিনি মহাদেবের আত্মশক্তি মহাকাল স্বরূপিনী সে কারণে তাঁর আর এক নাম শিবা। জীব সগুণ ও সাকারযুক্ত তাই শিব শ্বেতবর্ণ। শিবকে যখন সগুণ ও সাকার কল্পনা করা হলো তখন তাঁর আত্মশক্তি স্থান পেলো তাঁরই বক্ষে। সে কারণে দেবীর পদ শিব-বক্ষে স্থাপিত। শিবের আত্মশক্তি দেহ হতে নির্গত হওয়ায় শিব-দেহ পরিণত হলো শবে। যা কিছু লয়প্রাপ্ত হয় তাই শব। মায়াকল্পিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই একটা বিশাল শব। একদিন না একদিন সে মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হবে।

কালী তাঁর রক্তবর্ণ লোলজিহ্বা শ্বেত দন্ত দ্বারা কর্তন করছেন। লাল রঙ রজোগুণের ও সাদা সত্ত্বগুণের প্রতীক। সাধকের সাত্ত্বিক ভাব বৃদ্ধি পেয়ে তমোগুণের বিনাশ হলে কালী তখন সাধককে তাঁর চতুর্ভুজে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গ ফল প্রদান করবেন অন্যথায় দেবীর গলায় মুণ্ডমালার ন্যায় কর্মানুসারে সাধকের জন্ম-মৃত্যু বিবর্তিত হবে।

কালীর এলায়িত কেশপুঞ্জ অনন্তমায়ার প্রতীক। সচরাচর পূজিত এই মূর্তির সঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে তাঁর বর্ণিত রূপের বিশেষ মিল নেই। চণ্ড মুণ্ড বধের সময় ক্রোধে উম্মত্তা দেবী চণ্ডিকার মুখ হলো রক্তবর্ণ এবং ভ্রূকুটি কুটিল।

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানবীন্ প্রতি
কোপেন তস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা
ভ্রূকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতং
কালী করালবদনা বিনিস্ক্রান্তবাসিধারিণী

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ

কালিকা দেবীর প্রচলিত ধ্যানসমূহের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় এই ধ্যান মন্ত্র।

ও শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদ্রংস্ট্রাং বরপ্রদাম
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহূঃ
চতুর্বাহু সমাযুক্তাং বরাভয়করাম স্মরেৎ

শবাসীনা মহাশক্তিরূপিণী, ভয়ঙ্কর দন্তযুক্তা, বরদায়িনী, হাস্যযুক্তা, ত্রিনয়নী, কপালিনী, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, অনবরতঃ রক্তপানরতা চতুর্ভুজা সেই বরাভয়দাত্রীকে স্মরণ করি।

দক্ষিণাকালীর বহু মন্ত্র প্রচলিত। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র ঃ

ওঁ ক্রীং দক্ষিণা কালিকায়ৈ নমঃ

দেবীর প্রিয় পুষ্প—রক্তজবা।

পঞ্চোপচার পূজা—হুঁ, ক্ষৌ, যাং, রাং, ক্ষাং, বাং, আং, ক্রোং মহাকাল ভৈরব সর্ববিঘ্নায় নাশয় হ্রীঁ শ্রীং ফট্ স্বাহা।

দেবীর মন্ত্র জপ সংখ্যা—লক্ষমেক্ জপেবিদ্যা হাবষ্যাশী দিবাশুচি।

মহাকালীর গায়ত্রী মন্ত্র—কালিকায়ৈ বিদ্মহে স্মশানবাসিন্যৈ ধীমহী তন্নো ঘোরে প্রচোদয়

মহাকালীর ভৈরব—মহাকাল শিব।

এক সময় দেবতারা অগ্নিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মহাকালের তেজ ধারণের। মহাদেবের তেজপুঞ্জের দুটি ভাগ অগ্নি ছাড়াও পর্বতে নিক্ষেপিত হওয়ায় সেই তেজদ্বয় থেকে মহাদেবের দুটি পুত্রসন্তানের জন্ম হলো। শিব পুত্রদ্বয় মহাকাল ও ভৃঙ্গী এই দুই নামে পরিচিত হলো। এরা পার্বতীর রক্ষী হিসেবে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু একদিন দুর্গা যখন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে স্নান করছিলেন মহাকাল ও ভৃঙ্গী অসাবধানতাবশতঃ তা দেখে ফেলেছিল। পার্বতী ক্রোধে ওদের মানুষ হয়ে জন্মাতে অভিশাপ দিয়েছিলেন। ওরা তখন তারাবতীর গর্ভে মর্তে জন্মগ্রহণ করলো।

কিন্তু এদের মধ্যে মহাকাল, কালিকার ভৈরব হিসেবে পূজিত হল। কালী পূজার পর তাঁর দক্ষিণে ত্রিনয়ন, ধূম্রবর্ণ, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, দ্বিভুজে দণ্ড ও খট্টাঙ্গ, গলায় মুণ্ডমালা, মাথায় জটা চুড়োর মতো করে বাঁধা। কপালে অর্ধচন্দ্র প্রস্বলিত অগ্নির মত, মহাদেবের আর এক রূপ মহাকালের পূজা করতে হয় শাস্ত্রমতে।

তারা

চিন্ময়ি শ্রুতি রূপা যা
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মিকা
অরূপা সর্বরূপা সা
সারদে মে প্রসিদতম্

তারা চিন্ময়ী, চিৎশক্তিস্বরূপিনী ও চৈতন্যদায়িনী। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন মহাদেবতার আত্মা স্বরূপা। তিনি রূপহীনা ও সর্বরূপে বিরাজিতা।

কালীর থেকেই তারা রূপের সৃষ্টি। বীরভূমে তারাপীঠে তারা দেবী পূজিতা হন। রামের গুরু বশিষ্ঠদেব কঠোর সাধনা করেও সিদ্ধি লাভ করতে না পেরে ব্রহ্মার নির্দেশে কামাখ্যা ধামে তপস্যা করতে যান। তারপর দৈববাণী পেয়ে মহাচীনে গিয়ে তন্ত্রমতে পঞ্চমকার (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন ও মুদ্রা) সাধনা শুরু করেন বুদ্ধরূপী জনার্দনকে গুরু হিসেবে বরণ করে এবং সেখানে তারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তারাপীঠে চলে আসেন। এখানে শিশুরূপিণী তারা দ্বিভুজা ও শিবকে স্তন দান করছেন এইটিই মূল মূর্তি। মূল মূর্তি রক্তপানরতা কালিকার মত দন্ত দ্বারা কর্তিত জিহ্বার মুখের আদলে একটি মুখোশে আবৃত থাকে।

পরম পুরুষ হলেন বিশুদ্ধ জ্ঞান। সেই পরম পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হ্লাদিনী শক্তি পরমা প্রকৃতি। যখন সৃষ্টিতত্ত্বের প্রয়োজনে প্রকৃতি (নারী) পুরুষের বিপরীতে সংস্থাপিতা হলেন

তখন তাঁকে বিপরীতরতাতুরা আখ্যা দেওয়া হলো। তারা বা তারিণী দেবী হচ্ছেন সেই মূর্তি। যখন তিনি নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের শক্তি স্বরূপিণী তখন নির্গুণা ও নিরাকারা। এবং যখন তিনি সগুণ রূপযুক্ত ব্রহ্মে সংযুক্তা তখন সাকারা ও ইচ্ছাময়ী, তারার ইচ্ছায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লীলায়িত।

পরমেশ্বর শিব যখন প্রকৃতি রূপ ধারণ করেছিলেন তখন তিনি নিম্নাংশ পুরুষ ও ঊর্ধ্বাঙ্গ নারী (প্রকৃতি) অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর (ভিন্নার্থে) রূপে প্রতীয়মান হয়েছিলেন। ইনিই তারিণী দেবী।

বেদান্তের বিচারে গুহ্যাতিগুহ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ এই রূপ। এদেশে তারা পূজার প্রচলন করেন অক্ষোভ্য মুনি। তিনি এই বিদ্যা উত্তর মেরু থেকে সঞ্চয় করে এনেছিলেন। তারপর তারাতত্ত্ব চীন ও অন্য দেশে প্রচার করেছিলেন সিদ্ধ নাগার্জুন।

তবে রামের গুরু বশিষ্ঠ মুনিই প্রথম তারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও ব্যাপকভাবে তারা পূজার প্রচলন করেন। কারো কারো ধারণা সাধক বামাক্ষ্যাপা (বামদেব) বশিষ্ঠদেবেরই রূপান্তরিত শরীর।

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরমং মোক্ষৈক সাধনম্
জ্ঞানগ্নিহৈব মুক্তস্যাভ সত্যং ন শংশয়
ন কর্মনা বিমুক্তস্যায় সন্ততা্যা ধনেন বা
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ

—তারাতত্ত্ব

হে দেবি, মোক্ষ সাধনার একমাত্র পথ আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ। এই জ্ঞান লাভ হলেই জীব মুক্তি পায়। বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম, সন্তান উৎপাদন এবং ধন বিতরণে জীবের মুক্তি হয় না। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হলেই মুক্তি ঘটে।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন ভিন্ন রূপের উদ্ভবের মূলে মায়া। মায়া বিমুক্ত হয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মস্তরে এলে তখন একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। আত্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন এক ও অদ্বিতীয় আত্মা। পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ হয় সত্ত্বপ্রধান মায়াকে আশ্রয় করে। তেমনি রজোপ্রধান মায়া জ্ঞাতা এবং তমোপ্রধান মায়া জ্ঞেয় এই রকম কল্পনা করা হয়েছে।

তারা বা তারিণী মূর্তিতে শিব একাত্ম হয়ে রয়েছেন। শিব বা মহাদেব হচ্ছেন প্রলয়ের দেবতা। তিনি কারণ রূপে সুষুপ্তি বা তুরীয় অবস্থা (ব্রহ্মা স্থূলরূপী জাগ্রস্ত ও বিষ্ণু সূক্ষ্ম রূপী স্বপ্নাবস্থা)ঃ

জাগরিতে ব্রহ্মা স্বপ্নে বিষ্ণু সুষুপ্তে তুরীয় পরমাক্ষরম্

—ব্রহ্মোপনিষদ

এই ব্রহ্মোপনিষদ মতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিব হতেই সৃষ্টি এবং এঁরা শিবের মধ্যেই বিলীন হন। জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় উৎপত্তি ও লয় সুষুপ্তিতেই। শিব পরম নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মচৈতন্য। তাঁকে ক্রিয়াশীল রেখেছেন যে পরমা শক্তি তিনিই তারা।

সমুদ্রমন্থনে উত্থিত গরল কণ্ঠে ধারণ করে যন্ত্রণায় কাতর ও মৃতবৎ শিবকে পুনরায়

নব জীবন দান করেছিলেন তারা স্বীয় স্তনক্ষরিত সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়ে। এই তারা রূপ। তিনি শিব তথা জীবের ত্রাণকর্ত্রী তাই তারিণী নামে অভিহিতা।

তারা উপনিষদে বলা হয়েছে 'তারয়তাতি তারা', ইনি জীবসমূহের ত্রাণ করেন তাই তারা। ইনি শুভ্রবর্ণা হয়েও কৃষ্ণত্বপ্রাপ্তা এবং নীলবর্ণধারিণী। তারিণী দেবী বিভিন্ন তন্ত্রমতে—উগ্রতারা, বিদ্যারাজ্ঞী, মহাতারা, নীল সরস্বতী, চন্দ্রবর্ণা, পর্শতারা, ঘণ্টিকা, চন্দ্রঘণ্টা, চিন্তামণি, সিদ্ধজটা, বজ্রতারা, ব্রহ্মতারা, মণিতারা, মহানীলা সুন্দরী, ইত্যাদি নামেও বিভূষিতা।

তারা তন্ত্রে বলা হয়েছে বশিষ্ঠদেবের গুরু জনার্দন, উগ্রতারা মন্ত্র জপে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি তারাতন্ত্রের পরম জ্ঞান অর্জনের পর জরাহীন দেহ ও অমরত্ব লাভ করেছিলেন। সৃষ্টি ও আদি কর্মের কর্তৃত্ব তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল, তাঁর শিষ্য বশিষ্ঠদেব তারা সাধনার ফলে নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়াও যাঁরা তারিণী দেবীকে আরাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বামদেব, দুর্বাসা মুনি, বাল্মিকী মুনি, ভরদ্বাজ মুনি, অর্জুন, ভীম প্রভৃতি।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে (মহাযান) তারা আরাধনা ও ব্যাপক ভাবে তারাবিদ্যার চর্চা ছিলো।

তারিণীদেবীর ধ্যান,

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্
সর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ ঃ
নবযৌবন সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্
চতুর্ভূজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম

—নীলতন্ত্র

তারিণী দেবী শিববক্ষে বামপদ সংস্থাপন ও দক্ষিণপদ সংকোচন করে দণ্ডায়মান। ইনি ঘোররূপা। গলে নরমুণ্ডের মালা শোভা পাচ্ছে। তিনি খর্বাকৃতি, তাঁর উদর বিশাল। তিনি ভয়ঙ্করী, তিনি নবযৌবন প্রাপ্তা, পঞ্চমুদ্রায় বিভূষিতা। তিনি চতুর্ভুজা, লোল জিহ্বা ভীমা প্রকৃতির। তাঁর হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা।

তন্ত্রসার অনুসারে তারিণী দেবীর কপালে পঞ্চমুদ্রা অর্থাৎ সাদা হাড় দিয়ে তৈরি (গাঁথা) পাঁচটি নরকপাল শোভা পাচ্ছে। (শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য)।

তারিণীদেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র—হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্।

মন্ত্র জপ সংখ্যা—এক লক্ষ (মতান্তরে তিন লক্ষ)।

তারা গায়ত্রী—তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগায়ৈ ধীমহী তন্নো দেবী প্রচোদয়া।

তারার ভৈরব—সদ্যোতাজ শিব (মতান্তরে অক্ষোভ্য)—শান্ত ও নির্বিকার, নিরাসক্ত ভাব শিব।

ষোড়শী

তারা মূর্তি বিলীন হবার পর অবশিষ্ট ছিল শুদ্ধ ওঁ কার। সেই ওঙ্কার থেকেই মহামায়ার ষোড়শী মূর্তি ধারণ। উনি সাধকের শ্রীবৃদ্ধি করেন এ জন্য শ্রীবিদ্যা ও ত্রিগুণাতীতা বলে ষোড়শী নামে অভিহিতা। তা ছাড়াও ইনি ত্রিপুরাসুন্দরী, কামেশ্বরী, বালা ইত্যাদি নামেও খ্যাতা।

পাৰ্ব্বতী কৃষ্ণকায়া ছিলেন, গায়ের রঙ কালো বলে শিব ওঁকে ঠাট্টা করতেন, সেইজন্যে দেবী কৃষ্ণকোষ ত্যাগ করে শুদ্ধগৌরী হয়েছিলেন কিন্তু শিব ওঁকে পুনরায় কালী সম্বোধন করায় পার্বতী অভিমানে শিবনিবাস কৈলাশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলেন। এদিকে সংবাদ পেয়ে খুনসুটি পাকাতে দেবর্ষি নারদ এসে হাজির। শিবের মুখে ঘটনাটি শুনে নারদ যোগবলে জানতে পারলেন যে সুমেরু পর্বতের এক নির্জন স্থানে দেবী একাকিনী অবস্থান করছেন। নারদ সেখানে গিয়ে হাজির হতেই পার্বতী মহাদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

নারদ এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, "কি বলব মা, বলা উচিত নয় তবে আপনাকে বলতেই হবে। আপনাকে ছেড়ে শিব বেশ সুখেই আছেন, অন্য এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে প্রেমে কামে মত্ত রয়েছেন।"

মিথ্যে সংবাদ দিয়ে দেবীকে চটিয়ে মুহূর্তের মধ্যে নারদ উধাও। এদিকে পার্বতী ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অগ্নিবর্ণ ধারণ করলেন এবং সেই সঙ্গে ষোড়শবর্ষীয়া পরমাসুন্দরী মেয়ে রূপে আত্মপ্রকাশ করে শিবের কাছে এলেন।

এদিকে শিব তো পার্বতীর বিরহে ম্রিয়মান হয়ে তাঁরই ধ্যানে মগ্ন। ওঁর হৃদয়ে পার্বতীর রূপের প্রতিচ্ছবি। পার্বতী ষোড়শী রূপ ধারণ করলেও নিজ নতুন রূপ সম্পর্কে মোটেও অবহিত ছিলেন না সুতরাং শিব বক্ষে নিজের ছায়াকে অন্য নারী ভেবে শিবকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে শিবকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। আবার শিবদুর্গার মহানন্দময় পূর্ণমিলন ঘটল।

শাস্ত্রে ষোড়শী দেবীর বর্ণনা এইরকম—চারটি পদযুক্ত বিশাল পালঙ্কে মহাদেব শায়িত। ওঁর নাভিপদ্ম থেকে ষোড়শী দেবীর আবির্ভাব। শিব সত্ত্বগুণী। ব্রহ্মা রজোগুণা ও বিষ্ণু তমোগুণা ও নির্গুণ ঈশান এই চারজন পালঙ্কের চারটি পদে অবস্থান করছেন। যে ওঙ্কার থেকে দেবী ষোড়শীর উৎপত্তি সেই স্থান হতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের লীলা চক্রায়িত হয়ে চলেছে।

ষোড়শী অমৃতা নাম্নী চন্দ্রকলা ও পশ্যন্তী বাক হিসেবে পূজনীয়া। এই বাককে দর্শনশাস্ত্রে আত্মা ও তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্র বা দেবদেবীদের স্বরূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ষোড়শী আনন্দময়ী মূর্তি। ষোড়শী দেবীর ধ্যান—তন্ত্রসার মহাকাল সংহিতায় ষোড়শী দেবীর যে বিশাল ধ্যান উল্লিখিত আছে তার কিছু অংশ

ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণারুণাম্,
জবাকুসুম সঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্

পদ্মরাগ প্রতীকাশং কুঙ্কুমাক্তন সন্নিভাম

স্ফুরন্মুকুট মাণিক্য কিঙ্কিনী জাল মণ্ডিতাম....

দেবী ষোড়শী পদ্মনিভা। প্রভাতের উদীয়মান সূর্যের কিরণের মত উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্টা ও জবাফুল, ডালিম ফুল, পদ্মরাগ মণি, কুসুমের মত রক্তবর্ণা। দেবীর শিরে উজ্জ্বল মণি মাণিক্য খচিত মুকুট শোভা পাচ্ছে। সম্পূর্ণ ধ্যান মন্ত্রের বাংলা অনুবাদ এইরকম।

ষোড়শী দেবীর মাথায় ভ্রমরের মতো কালো ঘন চুল। তাঁর মুখমণ্ডল সদা উদিত সূর্যের ন্যায। নেত্র ভ্রূকুটি কুটিল, ললাটে বিরাজিত অর্ধচন্দ্র। তাঁর ভ্রূ যুগল হরধনুর মত বক্র। তিনি পরমেশ্বরী রূপে পূজিতা।

ষোড়শী দেবীর ত্রিনেত্র মহানন্দে নিমীলিত ও উন্মীলিত হচ্ছে। তাঁর দুই কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল বিচ্ছুরিত সূর্যের কিরণ প্রভায় উজ্জ্বল। দেবীর হস্ত বিশাল এবং চন্দ্রের অমৃত মণ্ডল জয়কারী। তিলফুলের মত উন্নত নাসিকা। মনে হয় ওঁকে স্বয়ং বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছেন। দেবীর ওষ্ঠযুগল তাম্র ও সুপক্ক বেলের মত রক্তবর্ণ। তিনি অমৃত সদৃশা। তাঁর মৃদু হাসির মধ্যে যে মাধুর্য রয়েছে তা রসসাগরের মাধুর্যকেও ম্লান করে দেয়। ওঁর চিবুক অতুলনীয় গুণ বিশিষ্ট। তিনি মহাদেবী। ওঁর গ্রীবা শঙ্খের মত। মৃণাল সদৃশ চতুর্বাহু দিয়ে ইনি পদ্মদলের ন্যায় সুন্দর করপুষ্প ধারণ করেছেন।

দেবীর নখের প্রভা রক্তপদ্মের মত এবং আকাশ-পরিব্যাপ্ত। ওঁর পীনোন্নত স্তনযুগলের উপর শোভিত রয়েছে মুক্তমালা। তিনটি বলীরেখা যুক্ত দেবীর নিতম্বদেশ অতি চমৎকার। সুগভীর নাভি লাবণ্য সরিতের আবর্তের মত বিরাজ করছে। ষোড়শী দেবীর সুডৌল নিতম্বে শোভা পাচ্ছে মহামূল্য রত্নসম্ভার। দেবীর নিতম্ব সুঠাম, রোমশূন্য ও মসৃণ। উরুদ্বয় কলাগাছের মত সুন্দর। জানুদেশ লাবণ্যময় ফুলের মত। দেবীর জঙ্ঘাদ্বয় কদলীর ন্যায় লাবণ্যযুক্ত। ওঁর পদদ্বয়ের গুল্ফ দুটি অতি গুপ্ত। দেবীর দুই পায়ে দীর্ঘ অঙ্গুলিগুলির নখরাজি স্বচ্ছ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মস্তকের উপর দেবীর চরণযুগল সর্বদা সংস্থাপিত।

দেবীর দেহকান্তি বহুশত চন্দ্রের স্নিগ্ধ প্রভার মত উজ্জ্বল। দেবীর অঙ্গের রক্তিম বর্ণের কাছে সিঁদুর, জবা ও ডালিম ফুল পরাজয় স্বীকার করে। ষোড়শী দেবী রক্তবসন পরিহিতা। দেবী দুহাতে পাশ ও দুহাতে অঙ্কুশ ধারণ করেছেন। তিনি রক্ত পদ্মের উপর উপবিষ্টা। তাঁর আভরণও রক্তবর্ণ।

দেবী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না। ওঁর মুখগহ্বর কর্পূরের কণা মিশ্রিত পানের রসে সিক্ত। সর্বাঙ্গে কস্তুরী ও কুঙ্কুমের প্রলেপের জন্য দেহ সূর্য বর্ণ ধারণ করেছে। দেবীর দেহ যাবতীয় শৃঙ্গারের বেশে শোভিত ও সর্ব আভরণে সজ্জিত।

ষোড়শী দেবী জগতের আনন্দ উৎপাদন ও বিশ্ববাসীর মনোরঞ্জন করেন। তিনি জগৎকে আকর্ষণ করেন ও তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপা। এই দেবী সমস্ত মন্ত্রময়ী অর্থাৎ ওঁর মধ্যেই যাবতীয় মন্ত্র নিহিত। ইনি সর্বসৌভাগ্যে সমৃদ্ধা ও অতি সুন্দরী। ইনি সর্বলক্ষ্মীশ্রীযুক্তা ও সর্বশক্তিময়ী। ইনি নিত্যা ও মঙ্গলময়ী। দেবী ষোড়শীর ধ্যানমন্ত্র অতি বিশাল ও অত্যন্ত কঠিন সেইজন্য ওঁর অন্য একটি প্রচলিত সংক্ষিপ্ত ধ্যানমন্ত্র উল্লিখিত হল।

বালার্কমণ্ডলভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্
পাশাঙ্কুশ শরাংশ্চপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে

দেবীর দেহকান্তি উদীয়মান সূর্যের মত উজ্জ্বল। ইনি চতুর্বাহুযুক্তা। ত্রিনয়নী। চার হাতে পাশ, অঙ্কুশ, শর ও ধনু ধারণ করে আছেন। এই পরম কল্যাণময়ী শিবাকে আমি স্মরণ করি।

ষোড়শী দেবীর পালঙ্ক সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে বহু বিশেষণ লেখা হয়েছে। এর মধ্যে মহাকাল সংহিতায় যে বর্ণনা ও অর্থ দেওয়া আছে তার সংক্ষিপ্তসার।

ব্রহ্মা ইত্যাদি পঞ্চশিবকে পঞ্চপ্রেত বলা হয়। এঁরা পঞ্চভূতাত্মক। শিব ও শক্তি যুক্ত হলেই তবে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করতে পারেন। শক্তিহীন শিব শববৎ কিংবা প্রেততুল্য। পরব্রহ্ম আপন শক্তি-বিন্যাসে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি পঞ্চরূপ নিয়ে বামাদি শক্তির সংস্পর্শে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় জাতীয় 'পঞ্চকৃত্য' সুসম্পন্ন করেন। এই পাঁচটি শিব নিজ নিজ শক্তি (বামা) থেকে বিমুক্ত হলে নিষ্ক্রিয় শব অর্থাৎ প্রেতবৎ অবস্থান করেন।

ষোড়শী দেবীর আর এক নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। বারাহী তন্ত্রে উল্লিখিত আছে পুরাকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং দেবতারা ত্রিপুরা দেবীর সাধনা করেছিলেন। এই দেবতাদের নাম ত্রিদশ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতা ত্রিদশগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দেবীর আরাধনা করেছিলেন সেজন্য ওঁর 'ত্রিপুরা' নাম হয়েছে। ভিন্ন মতে দেবী স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের অধিষ্ঠাত্রী সে জন্য তিনি ত্রিপুরা।

ষোড়শী দেবী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। ওঁর রূপ স্বর্গীয় মাধুর্য ও কামকলার মিশ্রণে অপরূপা।

ষোড়শী দেবীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র—ঐং ক্লীং সৌঃ।

মন্ত্র জপ সংখ্যা—তিন লক্ষ।

ষোড়শী দেবীর গায়ত্রী—ঐং ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্যৈ ধীমহী সৌস্তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ।

ষোড়শী দেবীর ভৈরবী—কামেশ্বর শিব (মতান্তরে পাঁচ মাথা যুক্ত পঞ্চানন শিব। দেবীর দক্ষিণে অবস্থান করেন)।

ভুবনেশ্বরী

বহুকাল আগে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মনে জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছার আবির্ভাব হয়। সৃষ্টির সংকল্পে পিতামহ ব্রহ্মা কঠোর তপস্যা শুরু করেন। প্রতিটি সৃষ্টির নেপথ্যে ক্রিয়াশক্তি জাগরিত থাকে। ব্রহ্মার তপস্যায় প্রীত হয়ে মহামায়া ভুবনেশ্বরী দেবী রূপে প্রকাশিত হন।

দেবী ভুবনেশ্বরী নবীন সূর্যের মত রক্তবর্ণা ও চতুর্ভুজা। ওঁর বাম হস্ত দুটিতে অঙ্কুশ

ও পাশ এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রা। পাশ ও অঙ্কুশ যথাক্রমে আকর্ষণী শক্তি ও বদ্ধাবস্থা। জীবগণকে তিনি আকর্ষণ করে সংসারে আবদ্ধ করছেন ও সেই সঙ্গে তাঁর শরণাগতদের বরাভয় দানও করছেন। দেবীর ধূলিপূর্ণ দক্ষিণ পদ রক্তপদ্মে স্থাপিত। তিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টিকর্ত্রী। তিনি সত্ত্বগুণে স্বর্গ, রজোগুণে মর্ত ও তমোগুণে পাতাল সৃষ্টি করেছেন।

ভুবনেশ্বরী দেবী চতুষ্পদ পালঙ্কে উপবিষ্টা এবং সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কারিণী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের একত্রিত অবস্থানে ভুবনেশ্বরী দেবীর উদ্ভব।

দেহতত্ত্ব বিচারে বলা যেতে পারে মানুষের মস্তকে স্বর্গ বিরাজমান। (সৃষ্টি) এবং এর অধিপতি ব্রহ্মা। কণ্ঠদেশ থেকে নাভিকুণ্ড পর্যন্ত মর্ত (স্থিতি)। এর অধিপতি বিষ্ণু ও নাভিদেশ থেকে মূলাধার পর্যন্ত (গুহ্যদেশ) পাতাল (লয)। এর অধিপতি শিব।

কর্মের উৎপত্তি মস্তকে। বক্ষস্থলে কর্মের স্থিতি ও মূলাধারে কর্মের লয়।

মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনীশক্তি সর্পের মত বামাবর্তে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ শিবকে বেষ্টন করে তমসায় নিদ্রিতা আছেন। রুদ্রের এই সুষুপ্তি অবস্থাই রাত্রিকাল এবং সেখানেই ভুবনেশ্বরী দেবীর অবস্থান। দেবী প্রলয়কালে ব্রহ্মলীনা ও নিষ্ক্রিয়া হয়ে যান। ভুবনেশ্বরী দেবীর মুকুট চন্দ্রকলা শোভিত। দেবীর স্তনযুগল পীনোন্নত। দেবীর তিনটি নয়ন। চারটি হাত। তন্ত্রসার মতে দেবী ভুবনেশ্বরীর চতুর্ভুজে বরমুদ্রা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়মুদ্রা। তিনি চতুর্দশ ভুবনের পালনকর্ত্রী সে জন্য ভুবনেশ্বরী নামে অভিহিতা।

ভুবনেশ্বরী দেবীর ধ্যান ঃ

উদ্যদ্দিন করদ্যুতিবিন্দু কিরীটাং তুঙ্গ কুচাং পানি ত্রয সংযুক্তাম

স্মেরীমুখীং বরাঙ্কুশপাশাভীতি করাং প্রভজেদ্ ভুবণেশীম্

এই মন্ত্রের অর্থ আগেই বলা হয়েছে।

ভুবনেশ্বরী দেবীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র—ঐং হ্রীং শ্রীং।

মন্ত্র জপ সংখ্যা—চার লক্ষ।

ভুবনেশ্বরী গায়ত্রী—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্যৈ ধীমহী তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

ভুবনেশ্বরী দেবীর ভৈরব—ত্র্যম্বক শিব।

ভৈরবী

দেবী ভৈরবী হলেন ভৈরবের প্রকৃতি রূপিণী শক্তি। ভৈরবী দেবী বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি। কোন কোন স্থানে ইনি চামুণ্ডা নামেও চিহ্নিতা।

ভৈরবী দেবীর বর্ণ সিঁদুরের মত লাল। তিনি চতুর্ভুজা, তাঁর চারটি হাতে পুস্তক, অক্ষমালা, বর ও অভয়মুদ্রা, তিনি বাক্‌দেবী স্বরূপিণী। ত্রিনয়নে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিরাজ করছে। দেবী ভৈরবী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিরূপী

নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি। দেবী ভৈরবী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকারিণী চন্দ্র রূপে। ত্রিভুবন পালন করেন সূর্যরূপে ও বিশ্বের প্রলয করেন অগ্নিরূপে।

বর্ষা ঋতুর সদ্যোজাত রক্তবর্ণ সূর্য ভৈরবী দেবীর প্রতিচ্ছবি। সূর্য উদয়কালে ঋক্‌বেদে, মধ্যাহ্নে যর্জুবেদে ও অস্তসময়ে সামবেদে অবস্থান করেন। সে জন্য ভৈরবী দেবীর এক হাতে পুস্তক। অন্য হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। রুদ্রাক্ষ শব্দটির অর্থ রুদ্রের অক্ষ (চক্ষু) অর্থাৎ শিবের চোখ। চোখ মানেই দৃষ্টিশক্তি অর্থাৎ জ্যোতি। সূর্যের মত তিনি যাবতীয় বস্তুকে দগ্ধ করতে সক্ষম। তিনি ধ্বংসকারক, তিনিই রুদ্র বা অগ্নি। এই রুদ্রের দাহিকা শক্তিই রুদ্রাণী ভৈরবী।

ভৈরবী দেবীর অন্য দুটি হাতে বর ও অভয়মুদ্রা। তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে জীবের মোহ ত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছেন। বর মানে কর্ম। কর্ম ও মায়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাধক যখন প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি মার্গে আসতে পারে তখনই ভৈরবী দেবীর সম্যক কৃপা লাভ সম্ভব।

ভৈরবী দেবী বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে বিভিন্ন নামে অভিহিতা, যেমন ত্রিপুরা ভৈরবী, কমলেশ্বরী ভৈরবী, চৈতন্য ভৈরবী, কামেশ্বরী ভৈরবী, রুদ্র ভৈরবী, নবকূট ভৈরবী, সর্বসিদ্ধা ভৈরবী, ভয়বিধ্বংসী ভৈরবী, নিত্যাভৈরবী, অন্নপূর্ণা ভৈরবী প্রভৃতি। সংগীত বিদ্যায় ভৈরবীকে ভৈরব রাগের স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কালিকা পুরাণে ভৈরবী গঙ্গার আর এক রূপ পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী।

ভৈরবী দেবীর ধ্যানঃ

ওঁ রক্তাম্বরাং চন্দ্রকলাবতংসাং সমুদ্রদাদিত্য নিভাং ত্রিনেত্রাম্
বিদ্যাক্ষমালাভয়দান হস্তাং ধ্যায়ামি বালামরুণাম্বুজস্থাম্

তিনি রক্তবস্ত্র পরিহিতা, কপালে অর্ধচন্দ্র, নবোদ্যত সূর্যের মত রক্তবর্ণা। দেবীর তিনটি চোখ। চারহাতে যথাক্রমে পুস্তক, অক্ষমালা, অভয ও বরমুদ্রা। এইরূপে যে নারী রক্তপদ্মের উপর উপবিষ্টা তাঁর ধ্যান করি।

ভৈরবী দেবীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র—ঐং, ক্লীং, সৌঃ।

মন্ত্রজপ সংখ্যা —চব্বিশ লক্ষ।

ভৈরবী গায়ত্রী—ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহী তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

ভৈরবী দেবীর ভৈরব—ভৈরব শিব। মতান্তরে একে দক্ষিণামূর্তি শিবও বলা হয়। তন্ত্রসার মতে এই শিব বটবৃক্ষের তলায় ধ্যানমগ্ন। দক্ষিণামূর্তি মহাদেবের গাত্রবর্ণ কর্পূরের মত সাদা। এই শিবকে ঘিরে চতুর্দিকে অধ্যাত্মতত্ত্ব জ্ঞানপিপাসু সাধকেরা উপবিষ্ট। মহাদেব প্রসন্ন চিত্তে ওঁদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করছেন।

ছিন্নমস্তা

নারী পুরুষের কামোন্মত্ত যৌন সঙ্গমকে পদতলে দলিত করে রক্তবর্ণ পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা দেবী ছিন্নমস্তা। তিনি নিজ মুণ্ড খড়্গ দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে নিজের রক্তপানেই মত্তা। দেবী

ছিন্নমস্তা রক্তবর্ণা। তাঁর দুটি হাত। দেবীর দুপাশে ডাকিনী ও যোগিনী এই দুই নায়িকা। দেবী পার্বতী একদিন তাঁর দুই সখী ডাকিনী ও বর্ণিনীকে (যোগিনী) সঙ্গে নিয়ে স্বর্গের গঙ্গা মন্দাকিনীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। দেবী তখন অত্যন্ত কামাতুরা ছিলেন। উলঙ্গ হয়ে মন্দাকিনীতে স্নান করতে করতে তিনি কৃষ্ণবর্ণা হলেন ও কামে মত্ত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। দেবীর দুই সখী ডাকিনী ও যোগিনী ক্ষুধায় কাতর হয়ে দেবীর কাছে খাদ্যবস্তু প্রার্থনা করলে তখন তিনি নিজ নখ দ্বারা আপন মুণ্ড ছিন্ন করলেন। ক্ষত স্থান থেকে ত্রিধারায় রক্ত নির্গত হতে লাগল। দুই ধারা দেবীর সখী ডাকিনী ও বর্ণিনী পান করলেন। তৃতীয় শোণিত ধারাটি পান করল দেবীর বামহস্তে ধৃত নিজ ছিন্নমুন্ডই, সে জন্যই এঁর নাম ছিন্নমস্তা।

বেদান্ত মতে ছিন্নমস্তা দেবীব ব্যাখ্যা এইরকম—সূর্য অস্ত গেলে পৃথিবীর উপর একটি লাল আভা বিরাজ করে। এই ক্ষীণ আলো যোগিনী। তারপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে অন্ধকার নেমে আসে সেই আঁধারই ডাকিনী। পৃথিবী অর্থাৎ দেবীর মস্তক সূর্য। সুতরাং সূর্য অস্ত যাওয়া মানেই দেবীর মুণ্ড ছিন্ন হওয়া। সূর্য অস্তমিত হলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে নিমজ্জিত ভাবটি আসে তারই প্রতিমূর্তি ছিন্নমস্তা দেবী।

দেবীব এক হাতে খড়্গ ও অপর হাতে আপন ছিন্নমুণ্ড। দিনশেষে একটি সাদা রঙের রশ্মি চোখ পড়ে. তাকেই খড়্গ চিন্তা কবা হয়েছে।

যৌন মিলনে মৈথুনরত উলঙ্গ ও উলঙ্গিনী পুরুষ ও নারীব উপর দণ্ডায়মানা সম্পূর্ণ নগ্না দেবী। তিনি পদতলে কামমোহিত নর নারীকে দলন করছেন অথচ নিজেই কামোন্মত্তা। আলো আঁধারের সংমিশ্রিত অবস্থা পুরুষ ও স্ত্রীর রতিক্রিয়া অর্থাৎ তমোগুণকে রক্তবর্ণ পদযুগলে (রজোগুণ) নিষ্পেষিত করছেন। এই ভাব জীবকে মায়া মুক্ত করার প্রতীক। মাযা প্রভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচ্ছিন্ন অবস্থাই ছিন্নমস্তা রূপ।

ছিন্নমস্তার অপর একটি নাম প্রচণ্ড চণ্ডিকা। বিশ্বসার ও যামল তন্ত্রমতে ছিন্নমস্তা রূপিণী দুর্গার মহাবিদ্যা রূপটি জীবের যাবতীয় কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে সক্ষম। কামকে আশ্রয় করে প্রবৃত্তি মার্গ থেকে নিবৃত্তি মার্গে উত্তরণের শ্রেষ্ঠ পথ ছিন্নমস্তা দেবীর সাধনা।

ছিন্নমস্তা দেবীব ধ্যান ঃ

স্বনাভৌ নীবজং ধ্যায়েদর্দ্ধং বিকসিতম্ সিতম্
তৎপদ্মকোষমধ্যে তু মণ্ডলং চন্দ্ররোচিষঃ
জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্তবন্ধুক সন্নিভম্
রজঃসত্ত্বমোরেখা যোনিমণ্ডলমণ্ডিতম্
মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্...

শ্লোকটি বিশাল। সুতরাং এর অংশ বিশেষ দেওয়া হল. সমগ্র শ্লোকটির বাংলা অনুবাদ এইরকম।

সাধক আপনি নাভিকুণ্ডে আধফোটা শ্বেতপদ্মের ধ্যান করবেন। সেই পদ্মগুলির কোষের মধ্যে সূর্যমণ্ডল এবং জবাফুল বা বন্ধুক ফুলের মত রক্তবর্ণ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ এই ত্রি রেখায় তৈরি যে যোনিমণ্ডল যার দ্বারা ঐ সূর্যমণ্ডল মণ্ডিত হয়েছে সেই মণ্ডলের মধ্যে কোটী সূর্য সদৃশ্য প্রভাবিশিষ্ট মহাদেবী ছিন্নমস্তা বিরাজ করছেন। দেবী বাম হস্তে নিজেরই ছিন্ন মুণ্ড ধারণ করে আছেন। তাঁর মুখমণ্ডল বিশাল ও ভয়ঙ্কর। জিহ্বার অগ্রভাগ লেলিহান অগ্নির মত। দেবী নিজ কণ্ঠ নির্গত আপন রুধির ধারা পান করছেন। তাঁর কেশরাশি আলুলায়িত ও বহু পুষ্পে সুশোভিত।

দেবীর দক্ষিণ করে ক্ষুদ্র খড়্গ। গলায় মুণ্ডমালা। তিনি উলঙ্গিনী ভয়ঙ্করী ও দক্ষিণ পদ অগ্রে ও বাম পদ পিছনে রেখেছেন। তিনি মানুষের হাড়ের তৈরি কণ্ঠহার ও সর্পকে যজ্ঞ উপবীতের মত করে ধারণ করেছেন। দেবী সদা ষোড়শ বর্ষীয়া রূপে বর্তমান। দেবীর স্তন দুটি স্থূল ও পীনোন্নত।

ছিন্নমস্তা মদনদেব ও রতির কামক্রিয়ার উপর দণ্ডায়মানা। সাধকেরা এই ভাবেই দেবীকে সদা সর্বদা ধ্যান করবেন। এখানে রতি ও কামদেবকে বিপরীতরতাতুরা এই রকম কল্পনা করতে হবে। দেবীর বাম পার্শ্বে ডাকিনী ও ডান পার্শ্বে বর্ণিনী (যোগিনী) দুই নায়িকা (উভয়েই উলঙ্গিনী) বিরাজ করছেন। এই দুই নায়িকা ও ছিন্নমস্তা দেবীর কণ্ঠ নির্গত রুধির ধারা পান করছেন।

ছিন্নমস্তা দেবীর ডানদিকে বর্ণিনী নাম্নী যে নায়িকা রয়েছেন তিনি রক্তবর্ণা, সৌম্যা, মুক্তকেশী এবং উলঙ্গিনী। তাঁর বাঁ হাতে মড়ার খুলি, ডান হাতে ছোট্ট খড়্গ। তাঁর গলদেশে সর্প উপবীতে শোভিত। ইনি জ্বলন্ত তেজ স্বরূপিনী। ইনি ডান পদ অগ্রে ও বাম পদ পিছনে স্থাপন করে অবস্থিতা। ইনি দিব্যা ও বহু অলঙ্কারে ভূষিতা। সদা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার ন্যায় অবয়ব ও গলায় হাড়ের মালা।

ছিন্নমস্তা দেবীর বাম দিকে যে ডাকিনীর অবস্থান তিনি কল্পান্তে কল্পিতা। সূর্যের মত আলোসদৃশ শুভ্রবর্ণা। তাঁর মাথার জটা বিদ্যুৎসম দীপ্তিময়। তাঁর তিনটে চোখ ও দন্তরাজ অতি শুভ্র। তাঁর মুখমণ্ডল দাঁতের জন্য ভয়ঙ্কর রূপে প্রতীয়মান। তাঁর স্তনযুগল অতি স্থূল ও বিশাল। তিনি মহাদেবী হতেও প্রচণ্ড ভয়ঙ্করী, মুক্তকেশী ও উলঙ্গিনী। ডাকিনী দেবীর লোলজিহ্বা বিশাল। তিনি মুণ্ডমালা বিভূষিতা, বাম হাতে নরকপাল ও ডান হাতে ছোট খাঁড়া। তিনিও ছিন্নমস্তা, দেবীর কণ্ঠ নির্গত রুধির ধারা পানে মত্তা। হস্তস্থিত নরকপালের জন্য এঁর মূর্তি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঐ ডাকিনী ও বর্ণিনী (যোগিনী) দেবী ছিন্নমস্তার সেবায় রতা। বিচক্ষণ সাধক এইভাবেই দেবীর ধ্যান করবেন।

ছিন্নমস্তা দেবীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র---শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা।

মন্ত্র জপ সংখ্যা---তিন লক্ষ।

ছিন্নমস্তা গায়ত্রী---ডাকিনৈঃ বিদ্মহে বর্ণিনীং ধীমহী তন্নো ছিন্নমস্তা প্রচোদয়াৎ।

ছিন্নমস্তা দেবীর ভৈরব--কালরুদ্র শিব (মতান্তরে কবন্ধ। দেবী মুণ্ডহীনা, তাই তার ভৈরবও মুণ্ডহীন।)

ধূমাবতী

বৃদ্ধা, ধূম্রবর্ণা, দুই বাহু এবং রথোপরি উপবিষ্টা। এই হলেন দেবী ধূমাবতী। তাঁর বাম হস্ত প্রসারিত ও ডান হস্তে কুলো (সূর্প)। দেবীর রথের বাহন কৃষ্ণবর্ণ দাঁড়কাক (বায়স)।

দেবাদিদেব মহাদেব কৈলাশ শিখরে ধ্যানমগ্ন। পার্বতী নানাভাবে শিবের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে ওঁর কোলে গিয়ে বসলেন। শিব কিন্তু নির্বিকার। দীর্ঘসময় বসে থেকে পার্বতী ক্ষুধার্ত হলেন এবং শিবের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করলেন। শিবের কোন রকম পরিবর্তন দেখা গেল না। পার্বতী বার বার খাদ্য চেয়েও নিরাশ হলেন। ক্ষুধায় কাতর পার্বতী ভাবলেন শিব তাঁকে বোধহয় উপেক্ষা করছেন সুতরাং উনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শিবকেই গিলে খেয়ে ফেললেন।

শিবকে ভক্ষণ করার পর পার্বতীর দেহ থেকে প্রচণ্ড ধোঁয়া নির্গত হতে লাগলো। দেবী ব্যাকুল হলেন। এদিকে মহাদেব যোগবলে আবার নিজ দেহ ধারণ করে পার্বতীকে বললেন, "দেবী, আমি তোমার স্বামী। কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করেছ, সুতরাং তুমি বিধবা ও ধূমাবতী রূপ প্রাপ্তা হলে।"

তন্ত্রশাস্ত্রে ধূমাবতী রূপ সৃষ্টির অন্য একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষরাজার যজ্ঞে উপস্থিত সতী পিতৃমুখে পতি শিবের নিন্দা শুনতে শুনতে অভিমানে ও দুঃখে দেহত্যাগ করেছিলেন। সতীর প্রাণহীন দেহ তৎক্ষণাৎ ধূম্রজালে বেষ্টিত হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য ধূমাবতী নামের উৎপত্তি।

বৈদান্তিক বিচারে ধূমাবতী শয্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। শীত ঋতুর প্রকৃতির অবস্থা এবং প্রভাতকাল দেবী ধূমাবতীর প্রতিকৃতি। সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্ত। উদিতপ্রায় সূর্যের প্রভা আকাশকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে সে কারণেই দেবীর রথের চক্রের রঙ লাল। [illegible] প্রথমে দিন আগমনের বার্তা ঘোষণা করে তাই ধূমাবতীর বাহন দাঁড়কাক। [illegible] কাজে খুব সকালে বৃদ্ধারা কুলো হাতে এগিয়ে আসেন সেই জন্যই ধূমাবতী দেবীর হাতে সূর্প শোভা পাচ্ছে। দেবী ধূমাবতীকে বার্ধক্যের প্রতিমূর্তি হিসেবে অঙ্কন করা হয়েছে এবং তাঁর আকৃতি বিকৃত।

ধূমাবতী অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা সাধকদের ক্ষেত্রে সর্বসিদ্ধিদাত্রী। দেবী ধূমাবতী [illegible] শত্রু বিনাশ করেন।

ধূমাবতী দেবীর ধ্যান :

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চমলিনাম্বরা
বিবর্ণ কুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরল দ্বিজা
কাকধ্বজ রথরূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা
সূর্পহস্তাতিরক্ষাক্ষী ধৃত হস্তা বরান্বিতা
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলক্ষণা

ক্ষুৎ পিপাসর্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া
বিরল দ্বিজা দন্তা ধূমাবতী ভীষণারূপ"

তন্ত্রসার বর্ণিত ধূমাবতী দেবীর ধ্যান মন্ত্রের অর্থ—দেবী ধূমাবতী বিবর্ণা, চঞ্চলা, রুষ্টা, দীর্ঘাঙ্গিনী। পরনের বসন মলিন। কেশরাশি বিবর্ণ, দক্ষা বিরল ও রুষ্টা। স্তনদ্বয় লম্বিত। তিনি বিধবা রূপ ধারিণী ও কাক বাহন রথোপরি অবস্থিতা। তাঁর নয়নদ্বয় রুষ্ট। হস্তযুগল সদা কম্পিত। একহাতে কুলো ও অপর হাতে বরমুদ্রা। দেবীর নাসিকা বিশাল। বিস্ফারিত। দেহ ভঙ্গিমা অতি কুটিল। তাঁর দৃষ্টিও কুটিল। তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতরা, তিনি কলহপ্রিয়া। তাঁর মুখগহ্বর দন্তহীন ও তিনি ভীষণদর্শনা।

ধূমাবতী দেবীব শ্রেষ্ঠ মন্ত্র — ওঁ ধূঁ ধূঁ ধূমাবতী স্বাহা।

মন্ত্র জপ সংখ্যা—এক লক্ষ।

ধূমাবতী গায়ত্রী—ধূমেশ্বরায় বিদ্মহে পার্বতীং ধীমহী তন্নো ধূমাবতী প্রচোদয়াৎ।

ধূমাবতীর দেবীর ভৈরব—ধূমেশ্বর শিব (মতান্তরে ধূমাবতী দেবী বিধবা সুতরাং ওঁর কোন ভৈরব নেই)।

বগলামুখী

একবার সৃষ্টি প্রায় ধ্বংস হয় হয। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বহু চেষ্টা করেও বিনাশ প্রতিরোধে সক্ষম না হয়ে ত্রিপুরাম্বিকা দেবীব তপস্যায় মগ্ন হলেন। ব্রহ্মার তপস্যায় প্রীত হয়ে পীতবর্ণের হ্রদ থেকে এক পীতবর্ণা দেবী আবির্ভূতা হলেন। ইনিই বগলা দেবী। বিভিন্ন তন্ত্রে বগলামুখীর উৎপত্তি সম্পর্কে অন্য একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। রু রু অসুরের মহাপরাক্রমশালী পুত্র দুর্গম অমবত্ব লাভের জন্য ব্রহ্মার তপস্যা শুরু করলে দেবতারা বিপদেব আশঙ্কায ভগবতী মহামাযাকে আবাহন করলেন। দেবী ভগবতী দেবতাদের সাধনায সন্তুষ্ট হযে পীতবর্ণের বগলামুখী রূপে সমুদ্র থেকে উত্থিতা হলেন।

দেবী বগলামুখী কলকচাঁপার মত গাত্রবর্ণ বিশিষ্টা। এক হাতে শিলা ও মুদ্গর ধারণ কবে অন্য হাতে অসুরের জিভ টেনে ধরে গদার আঘাতে তাকে হত্যা করছেন।

বগলামুখী দেবী অমৃত সমুদ্রের রক্তবর্ণ পদ্মের উপরিভাগে শত্রুদের দেহ আসন রূপে কল্পনা করে অবস্থিতা আছেন। যাঁর গাত্রবর্ণ স্বর্ণের মত উজ্জ্বল সেই বগলামুখী দেবীকে যিনি ধ্যান করেন তাঁর সমস্ত পাপ ক্ষয় ও যাবতীয় বিপদ আপদ দূর হয়ে যায়। বগলামুখী মন্ত্র জপে বশীকরণ, স্তম্ভন ও মারণ তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্মের মধ্যে এই ত্রিকর্ম সমাধা করা সম্ভব। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে বগলামুখী দেবী পূজা, হোম, যজ্ঞ, জপ, স্তব ও কবচ পাঠে প্রসন্না হন ও সাধকের শত্রুগণের বাক স্তম্ভন, বশীকরণ ও বিনাশ করেন।

বগলামুখী দেবীর ধ্যান,

মধ্যে সুধাব্ধি মণি মণ্ডপ রত্নবেদী সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীত বর্ণাম
পীতাম্বরা ভরণ মাল্য বিভূষিতাঙ্গীং দিবিং স্বরামি ধৃত মুদগর-বৈরিজিহ্বানাম্
জিহ্বাবাগ্রমাদায় করেন দেবীং বামেন শত্রুং পরিপীড়য় স্ত্রীম্
গদাভিঘাতেন'চ দক্ষিনেন পীতাম্বরঢং দ্বিভুজাং নমামি

পীতবসনা দেবী বগলামুখী সুধাসাগর মধ্যে মণিময় মণ্ডপে রত্নখচিত বেদীর উপর স্থাপিত সিংহাসনে উপবিষ্টা। তিনি বাম হস্তে শত্রুর জিহ্বা আকর্ষণ করে ডান হাতে গদাঘাতে শত্রু নিধন করছেন। পীতবর্ণা দ্বিভূভুজা বগলামুখীকে আমি প্রণাম করছি।

বগলামুখী দেবীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র—ওঁ হ্লীং বগলামুখী সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা।

মন্ত্র জপ সংখ্যা—দশ হাজার।

বগলামুখী দেবীর ভৈরব—মহারুদ্র শিব।

বগলামুখী গায়ত্রী—মহাগৌরী বিমহে অসুবনাশিনী দ্বীমহী তন্নো বগলা প্রচোদয়াৎ।

মাতঙ্গী

সতীর দেহত্যাগের পর সেই দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্যকারী শিবের রুদ্ররূপ। মাতঙ্গের (হস্তী) মত স্থূলাঙ্গী প্রচণ্ড শক্তিশালিনী দেবী মাতঙ্গী। পার্বতীর মাতা মেনকা বিশাল এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন এবং সেই যজ্ঞে পার্বতীকে নিয়ে আসার জন্য কৈলাসে গিরিরাজ হিমালযের পুত্র কৌস্তুকে পাঠালেন। পার্বতী শিবকেও সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। শিব বললেন, "বিনা নিমন্ত্রণে আমার যাবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু তুমি যখন চাইছ তখন নিশ্চয়ই যাব, তবে আমি যাব ছদ্মবেশে।"

পার্বতী পিতৃগৃহে চলে যেতেই মহাদেব বেশ কিছু শাঁখা জোগাড় করে শাঁখারির রূপ ধরে সেখানে এলেন। তিনি সমস্ত সধবা নারীদের হাতে শাঁখা পরিয়ে দিলেন। কিন্তু পার্বতীকে দিলেন না। পার্বতী শঙ্খকারের কাছে শাঁখা প্রার্থনা করলে শাঁখারিবেশী শিব বললেন, "হে শিবা, আমি আপনাকে শাঁখা দিতে পারি কিন্তু একটি শর্তে।" পার্বতী বললেন, "যে কোন শর্তে আমি রাজী। আপনি আমায় শাঁখা পরিয়ে দিন।"

ছদ্মবেশী শিব রহস্য করে বললেন, "দেবী আমি কামপীড়িত। আপনি আমায় আপনার অতুলনীয় দেহ দান করে তৃপ্ত করুন।" দেবী পার্বতী ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে শঙ্খকারকে অভিশাপ দিতে গিয়ে যোগবলে জানতে পারলেন শাঁখারি আর কেউ নন স্বয়ং মহাদেব। দেবী মুচকি হেসে বললেন, "বেশ তোমাকে আমার দেহ দানে তৃপ্ত করব। কিন্তু এখন নয়, সেই রাত্রিবেলা।"

এদিকে নিশাকালে দেবী পার্বতী চণ্ডাল কন্যার রূপ ধরে মহাদেবের কাছে গেলেন। কিরাতিনী স্থূলাঙ্গী হলেও অপরূপা সুন্দরী। শিব কামে মত্ত হয়ে চণ্ডালীর সঙ্গ কামনা করলে কিরাতবেশী পার্বতী বললেন, "আমি দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যায় মগ্ন, আপনি আমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটাবেন না।"

শিব যোগবলে বুঝলেন কিরাতনী স্বয়ং দেবী পার্বতী সুতরাং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে কিরাত রূপ ধারণ করে পার্বতীর সঙ্গে মৈথুনে তৃপ্ত হয়ে বললেন, "হে দেবি, তুমি আমাকে তৃপ্ত করতে স্থূলাঙ্গী চণ্ডালীর রূপ ধরেছ। এখন তুমি এই রূপেই পূজিতা হবে। তোমার এই অপরূপ রূপ মাতঙ্গী নামে খ্যাত হবে।"

মাতঙ্গী দেবী শ্যামবর্ণা। চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী ও রক্তবর্ণ বসনে সজ্জিতা। দেবীর ডান হাতদ্বয়ে খড়্গ ও অঙ্কুশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে খেটক ও পাশ।

বৈদান্তিক বিচারে মানব মন কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যুক্ত হলে .·· মাতঙ্গী দেবীর মত অতি পরাক্রম লাভ করে।

গ্রীষ্ম ঋতুতে উদীয়মান সূর্য রশ্মির মধ্যে দেবী মাতঙ্গীর রূপ কল্পিত হয়েছে। দেবীর চতুর্ভুজ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারটি দিক। দক্ষিণে শমন ভবন তাই দক্ষিণ করে উনি তরবারি ধারণ করেছেন আশ্রিত জনকে রক্ষার জন্য। ডানদিকে অপর হস্তে অঙ্কুশ ধারণের অর্থ পৃথিবী পূর্ব হতে পশ্চিমে ঘূর্ণায়মান সেইজন্য চৌম্বক আকর্ষণী শক্তির উদ্ভব। বাম হস্তে ধর্মদণ্ড ও ক্রিচক্র অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাতীত অবস্থায় সাধকের মুক্তি।

বামকেশ্বর তন্ত্র মতে দেবী মাতঙ্গী সর্বসিদ্ধিদাত্রী। দেবীর সাধনা মাত্রই সিদ্ধি করায়ত্ত্ব হয়।

মাতঙ্গী দেবী বিভিন্ন নামে অভিহিতা, যেমন বশামাতঙ্গী, কর্ণমাতঙ্গী, সুমুখী, রাজমাতঙ্গী প্রভৃতি।

ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা দেবী মাতঙ্গীর আরাধনায় পরম সৌভাগ্য লাভ করেছেন। দেবীর কৃপায় হৃদয়ে বেদবিদ্যা জাগরিত হয়।

মাতঙ্গী দেবীর ধ্যান ঃ

শ্যামাঙ্গীংশশিশেখরাং ত্রিনয়ণাং রত্ন সিংহাসন স্থিতাম

বেদৈর্বাহুদন্ডৈরসি খেটক পাশাঙ্কুশ ধরাম

দেবী মাতঙ্গী শ্যামাঙ্গিনী। ওঁর কপালে (মস্তকে) অর্ধচন্দ্র, তিনি ত্রিনয়নী ও রত্নখচিত সিংহাসনে অবস্থান করছেন। দেবী তাঁর চারটি হাতে খাঁড়া, ঢাল, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করেন। মাতঙ্গী দেবীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গৈ ফট্ স্বাহা।

জপ সংখ্যা—ছয় হাজার।

মাতঙ্গী গায়ত্রী—মতঙ্গে বিদ্মহে চণ্ডালিন্যৈ ধীমহী তন্নো মাতঙ্গী প্রচোদয়াৎ।

মাতঙ্গী দেবীর ভৈরব—মতঙ্গ শিব। ইনি চণ্ডাল হিসেবে পরিচিত।

কমলা

কমলাদেবী স্বর্ণনিন্দিত উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্টা। হিমালয় পর্বত জাত চারটি বিশালাকার শ্বেত হস্তী সুধাপূর্ণ স্বর্ণকলস দ্বারা দেবী কমলার মস্তক সিঞ্চন করছে।

একদা দেবরাজ ইন্দ্র অপ্সরা রম্ভাকে দেখে তার প্রেমে মত্ত হয়ে আলাপ নিরত হলেন। হঠাৎ দুর্বাসা মুনি সেখানে এসে উপস্থিত। দুর্বাসাকে দেখে ইন্দ্র সংযত হয়ে মুনিবরকে প্রণাম করলেন। দুর্বাসা খুশি হয়ে ইন্দ্রকে অতি দুর্লভ স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্প উপহার দিলেন। ইন্দ্র রম্ভার চিন্তায় এত মগ্ন ছিলেন যে পারিজাত পুষ্পটি উনি অন্যমনস্কতা বশতঃ স্বীয় হস্তী ঐরাবতের মস্তকে স্থাপনা করলেন। মহামূল্যবান পারিজাত পুষ্পটির পরিণতিতে দুর্বাসা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন, "রে মতিচ্ছন্ন দেবরাজ, তুমি দেবতাশ্রেষ্ঠ হয়েও সামান্য নারীর কামে মত্ত হয়েছ? তোমার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পেতে হবে তোমায়। ইন্দ্রপুরী লক্ষ্মীহীনা হবে।"

মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপ মিথ্যা হবার নয়। সঙ্গে সঙ্গে মহালক্ষ্মী স্বর্গ ছেড়ে পাতালে প্রস্থান করলেন যার ফলে স্বর্গ শ্রীহীন হয়ে পড়লো।

তারপর সমুদ্র মন্থনের কাহিনী তো সবারই জানা। সমুদ্র মন্থনে বহু কিছুর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীও উঠে এলেন পারিজাত পুষ্প হাতে। ইনিই ঐশ্বর্য, সম্পদ ও শ্রীময়ী দেবী কমলা।

দেবী কমলা চতুর্ভুজা। তাঁর হস্তে দুটি পদ্ম, বর ও অভয় মুদ্রা শোভা পাচ্ছে। দেবীর শিরোপরি রত্নমুকুট। দেবী পট্টবস্ত্র পরিহিতা ও কমলোপরি আসীনা।

বেদান্ত মতে বর্ষা ঋতুর মধ্যাহ্নে শ্বেত বর্ণ মেঘের টুকরোর আবরণে প্রায় আবৃত সূর্যের স্বর্ণাভ প্রভার আলোয় বৃষ্টিপাত কালের যে অবস্থা তাই দেবী কমলার প্রতিচ্ছবি।

হস্তী চতুষ্টয় শ্বেতবর্ণ জলদ। স্বর্ণময় কলস সূর্যের কনক প্রভা। এবং সুধাবর্ষণ অর্থে বারিবর্ষণ বা বৃষ্টিপাত।

সাধকের মূলাধারে যে রক্তবর্ণ পদ্মের অবস্থান সেই পদ্ম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হলে সাধক কমলা দেবীকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন। কমল বা পদ্মের মত স্নিগ্ধ, ধীর, স্থির, স্থিতধী, একাগ্র সাধক দেবী কমলার প্রসাদ লাভে সমর্থ।

দেবী কমলা মহালক্ষ্মী, কমলাত্মিকা ও লক্ষ্মীবিদ্যা নামেও পরিচিতা। দেবী কমলার সাক্ষাৎ মাত্রই ত্রিলোকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ও সঠিক সৌভাগ্য লাভ হয়।

কমলা দেবীর ধ্যান ঃ

> কান্ত্যাং কাঞ্চন সন্নিভাং হিমগিরি প্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ
> হস্তোৎক্ষিপ্ত হিরন্ময়ামৃত ঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম
> বিভ্রানাং বরমাব্জযুগ্ম মভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাম্
> ক্ষৌমাবদ্ধ নিতম্ব বিললিতাং বন্দেঽরবিন্দ স্থিতাম্

দেবী কমলার দেহকান্তি স্বর্ণময় উজ্জ্বল। হিমালয় পর্বতের মত শ্বেতবর্ণের চারটি হস্তী চারটি শুঁড়ে চারটি অমৃতপূর্ণ সোনার কলসে দেবীকে অভিষিক্ত করছে। দেবী চতুর্ভুজে

বরমুদ্রা, দুটি কমল ও অভয় মুদ্রা ধারণ করেছেন। দেবীর মস্তকে মুকুট শোভিত। দেবী পট্টবস্ত্র পরিহিতা। কমলা দেবীর নিতম্ব চমৎকার। তিনি কমলাসীনা। এইরূপে কমলা দেবীর বন্দনা করি।

কমলাদেবীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং।

মন্ত্র জপ সংখ্যা—বারো লক্ষ।

কমলা গায়ত্রী—মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রীয়ৈ ধীমহী তন্নো শ্রী প্রচোদয়াৎ।

কমলা দেবীর ভৈরব—কমলাত্মিকা শিব (মতান্তরে বিষ্ণুরূপী সদাশিব। কমলাদেবী সমুদ্র মন্থনে উত্থিতা হয়ে বিষ্ণুর গলায় বরমাল্য দিয়েছিলেন। ইনি মঙ্গলময় শান্তরূপ)।

এই দশ মহাবিদ্যারূপ যে মহাদেবী সৃষ্ট সেই দুর্গাদেবী দশটি হাতে দশজন মহাবিদ্যাকে ধারণ করে আছেন। আদ্যাশক্তি মহামায়া চণ্ডী, ভগবতী দুর্গা একাধারে বিশ্বাতিরিক্তা আবার অন্যদিকে বিশ্ববিস্মৃতা, সর্বরূপধারিণী মহাশক্তি স্বরূপিনী পরমা প্রকৃতি মহামায়া।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে

—শ্রীশ্রীচণ্ডী

তিনি ব্রহ্মস্বরূপিনী এক ও অদ্বিতীয়া, প্রকৃত অর্থে তিনি নিরাকারা। তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই, প্রাকৃত কোন মূর্তিও নেই। দুর্গা, চণ্ডী ইত্যাদি ব্রহ্মের পরাশক্তি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। কালি, তারা ইত্যাদি এই দশমহাবিদ্যা রূপও সেই মূল শক্তির বিভিন্ন বর্ণময় রূপান্তর

ত্বমাদ্যা সর্ববিদ্যানাম অস্মাকমপি জন্মভূঃ
ত্বং জানস জগৎ সর্বং ন ত্বাং জানতি কশ্চন
ত্বং কালী তারিনী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা
ত্বমন্নপূর্ণা বাগদেবী ত্বং দেবী কমলালয়া
সর্বশক্তি স্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ

—মহানির্বাণ তন্ত্র

তুমি সর্ববিদ্যার আদি শক্তি স্বরূপিনী। তোমার জন্মই বা কী! তুমি সর্বজগৎ সম্পর্কে জ্ঞাত আছ কিন্তু তোমায় কেউ জানতে পারে না। তুমি কালী, তারা, দুর্গা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী। তুমিই বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা। তুমিই অন্নপূর্ণা, বাগদেবী, কমলা। তুমি সর্বশক্তিরূপা, তুমি সর্বদেবশরীর ধারণকারিণী।

নীলতন্ত্র মতে ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতার, যেমন কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি এঁরা এক এক জন মহাবিদ্যার সাধক কিংবা ওঁদেরই পরিবর্তিত শরীর অর্থাৎ কৃষ্ণ (কালী), রাম (তারা) এইরকম। দশ মহাবিদ্যা রূপ অতি গুহ্য। যে সাধক তন্ত্রমতে সম্মিলিত ভাবে দুর্গার এই দশ রূপের সাধনা করতে সক্ষম, তাঁর যাবতীয় সিদ্ধি সিদ্ধাই করায়ত্ত হয়।

ভুতুড়ে তান্ত্রিক

যেমন ভুতুড়ে তান্ত্রিক থাকেও তেমনি অদ্ভুতুড়ে জায়গায। চৌহদ্দি ঘিরে ঘন বাঁশবন। ঘোর জঙ্গল। চারদিকে ছোট বড় ডোবা, পুকুর। বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা গোখরো সাপ আর তিনটে শেয়াল দেখে আঁৎকে উঠে, তান্ত্রিকের ডেরায় গিয়ে পৌঁছলাম।

মস্ত একটা শেওড়া গাছের নীচে ইঁট সাজিয়ে তার ওপর ছেঁড়া খোঁড়া বাঘছাল বিছিয়ে ভুতুড়ে তান্ত্রিক সিংহাসনে উপবিষ্ট। আসন ঘিরে অসংখ্য মড়ার খুলি আর হাড়গোড়। কিছুটা দূরে একটা ছোট্ট ঝুপড়ি। তান্ত্রিকেব মাথা গোঁজার ঠাঁই। শুনেছি, নেহাৎ ঝড়, বৃষ্টি আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে তান্ত্রিক ঐ ঘরে ঢোকে না। এই 'সিদ্ধাসন' -এ গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে। বড় একটা নড়ে চড়ে না। ঐখানে বসেই মন্ত্র তন্ত্র আর তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ করে। তান্ত্রিক নাকি অনেক প্রেতাত্মা মানে ভূতকে বশ করেছে। ওদের দিয়েই কাজ সারে।।

তান্ত্রিক বিকট দর্শন। গায়ের রঙ মিশকালো, মাথায় জটা, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। মধ্যবয়সী। একটা চুল দাড়িও পাকেনি। চোখদুটো বড় বড়। ভাঁটার মত লাল। দুই কানে বালার সাইজের মস্ত দুটো দুল। দু হাতে অসংখ্য কবচ, তাবিচ, মাদুলি, শেকড় বাকড, আর রঙ বেরঙের পাথর বাঁধা।

তান্ত্রিক চেলা চামুণ্ডা পরিবেষ্টিত হয়ে খোশগল্পে মশগুল। গাঁজার ছিলিম হাতে হাতে ঘুরছে। আমাকে দেখে বিরক্ত হযে বাজখাঁই গলায় বলল, "কে রে ব্যাটা তুই? সকাল বেলাতেই কি ধান্ধায় এসেছিস?"

ধান্ধা তো একটাই। ভূত দেখা আর ভূতের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ। সেটা শুনে, আমাকে ইশারায় বসার নির্দেশ দিয়ে 'ব্যোমশঙ্কর' বলে গ্যাঁজার ছিলিমে একটা রামটান দিয়ে বুক ভরে দম নিয়ে বলল, "ভূত সম্পর্কে তোর ধারণাটা আগে বল"। বছর তিনেক আগে সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার ও নলিনী দাশ সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'ভূতযন্ত্র' শিরোনামে একটা গল্প লিখেছিলাম। গল্পটা বহুজনের প্রশংসা পেয়েছে। ভূত সম্পর্কে আমার ধারণা বিস্তারিত ভাবে গল্পটিতেই লেখা আছে। পত্রিকাটির পাতা খুলে তান্ত্রিকের হাতে দিয়ে বললাম, "গল্পটা পড়ুন তা হলে ভূত সম্পর্কে আমার ধারণাটা বুঝতে পারবেন।"

তান্ত্রিক খুব অবাক হয়ে বলল, "দ্যাখ বাবা, অনেক বছর তন্ত্র মন্ত্র করছি। বহু লোকজন আমার কাছে আসে। নানা প্রশ্ন করে। উদ্ভট কথাও বলে। কিন্তু কেউ কখনো আমাকে বই পড়তে দেয়নি। তা বাপু অত লেকা টেকা পড়ার ধৈর্য নেই আমার। তুই বরং পড় আমি শুনি।"

ভূতের গল্প শুনতে কে না চায়। তান্ত্রিকের চেলা চামুণ্ডারা খুব উৎফুল্ল হয়ে আমার গা ঘেঁষে এসে বসল। আমি শুরু করলাম।

ভূতনাথ বাবুকে ভূতে পেয়েছে।

একটু বিষদ করে বলা যাক। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর ভূতনাথ ভট্টাচার্য এখন ভূত নিয়ে মেতেছেন।

স্বপ্ন-কেদারার ভেল্কী দেখার পর থেকে ওঁকে সযত্নে এড়িয়ে চলছিলাম। কিন্তু কমলি নেহী ছোড়তা। বার বার টেলিফোনে তলব করে ভূতমাহাত্ম্য শোনাচ্ছেন।

ওঁর বাড়ি, মানে ল্যাবরেটারীতে এখন পাহাড় পরিমাণ ভূতের বই যের জমায়েৎ। দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের ভূতেদের হরেক রকম অদ্ভুত ছবি।

শুধু কি তাই! ভিডিও ক্যাসেটে ভূত সম্পর্কে চলচ্চিত্রও দেখাচ্ছেন। সত্যজিৎ রায়ের গুপী গাইন বাঘা বাইনের ভূতের দৃশ্যাবলী কতবার যে দেখানো হয়েছে সে আর কহতব্য নয়। ভাবব না ভাবব না করেও, ভূত ভূত ভাবতে ভাবতে আমার অবচেতন মনে নিজের অজান্তেই ভূতের নৃত্য শুরু হয়েছে। ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই, কিন্তু নাকি সুরে কিছু কিছু কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছি যেন। হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে সঙ্গে অশরীরী কারা যেন ঘোরাঘুরি করছে। প্রতিজ্ঞা করেছি ভূতনাথ বাবু হাজার ডাকলেও আমি আর যাচ্ছি না। নিজেই যদি মনোরোগী বনে যাই, তা হলে বোধ হয় মনের দুঃখে বনেই চলে যেতে হবে। এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে হাসপাতালে যাচ্ছি রোগী দেখতে।

পি.জি. হাসপাতালের 'নিউরো মেডিসিন ও মেন্টাল' আউটডোর হাট বাজারকেও হার মানায়।

কোন রকমে জন অরণ্য ভেদ করে ভেতরে ঢুকে দেখি স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ তৃষিত রায় গম্ভীর হয়ে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে একটা চিঠি পড়ায় ব্যস্ত। আমাকে দেখেই চমকে উঠে বলল, "এই যে দাদা, চিরকুটটা ভূতনাথ বাবু পাঠিয়েছেন।" মাত্র একলাইন লেখা চিরকুট—চ্যাটার্জী পত্রপাঠ চলে এস। জরুরী দরকার। ভূ-ভ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "কে দিল এই চিঠিটা?" তৃষিতের চকিত কণ্ঠস্বর, "একটা খ্যাংড়াকাটির মত রোগা লোক। বাপরে বাপ গায়ে কি জোর! ভীড় ঠেলে চিরকুটটা দিয়েই নিমেষে উধাও। কয়েকজন রে রে করে তেড়েও গেল, কিন্তু ততক্ষণে সে ধরাছোঁয়ার বাইরে। খুব রহস্যময় ব্যাপার মনে হচ্ছে।"

রোগী দেখা মাথায় উঠল। খানিকটা চিন্তিত হয়ে বললাম, "বুঝলি তৃষিত, আমি আসছি। এবার আর না গিয়ে উপায় নেই।"

যাব না যাব না করে যেতে হচ্ছে কেন! এটা কি ভূতনাথ বাবুর টেলিপ্যাথি? নাকি স্রেফ মনের দুর্বলতা?

কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত ভূতামৃত শুনতে শুনতে সে দিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম "আচ্ছা ভূতনাথ বাবু, আপনি এতবড় বৈজ্ঞানিক, দেশ আপনার কাছ থেকে অনেক

কিছু আশা করে। হাজারো সমস্যা থাকতে হঠাৎ ভূত নিয়ে মেতেছেন কেন?" ভূতনাথবাবু বলেছিলেন, "ভূতকে তুমি তাচ্ছিল্য করছ?" আমি বলেছিলাম, "কিছু লোকের অতীতকে নিয়ে মাতামাতি করার একটা প্রবণতা আছে। একে আপনি নষ্টালজিয়া বা স্মৃতিভারাকুলতাও বলতে পারেন।"

ভূতনাথবাবু রহস্য করে বলেছিলেন, "বেশ, ভূত মানে যদি অতীতই বল, তা হলে জেনে রাখো, অতীতের সঠিক মূল্যায়ন না হলে বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্তই অন্ধকার।"

"এই যে স্যার, আমরা এসে গেছি।" ড্রাইভার মহাবীর পাশোযানের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এল। খুব আশ্চর্য হয়ে বললাম, "এখানে যে আসব বুঝলে কি করে? সে রকম তো কিছু বলিনি তোমায়।"

মহাবীর খানিকটা ভয়ার্ত গলায় বলল, "একজন প্যাঁকাটি পানা কালো রঙের মানুষ নাকী সুরে বলে গিয়েছিলেন! "ডাক্তার বাবু এখনই আসছেন, ভূতনাথ ভট্টাচার্যের ল্যাবরেটারীতে যাবেন"। ভূতনাথবাবুর নিউরো-সাইকো-ফিলসফিক্যাল ল্যাবরেটারির দরজা বন্ধ। তিনবার টোকা দিলাম। ভেতর থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "খোলা আছে। ঠেলে এসো।" ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ। "দরজাটা ভেজিয়ে দাও।" ঘুটঘুটে অন্ধকার, দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ। কিছুক্ষণ পর খানিকটা চোখ সয়ে গেল। দেখলাম, ভূতনাথ বাবু তাঁর প্রিয় আরাম কেদারায় ধ্যানমগ্ন।

সামনে ছোট্ট একটা টেবিলের ওপর, অনেকটা টেলিভিসন সেটের মত দেখতে কিন্তু আকারে লম্বাটে ধরনের একটা যন্ত্র। ঐ যন্ত্র থেকে বিচ্ছুরিত হালকা একটা নীলাভ আলো পরিবেশকে রহস্যময় করে তুলেছে।

"এটা হচ্ছে ডার্ক কনডেনসার" ভূতনাথবাবু যন্ত্রটির পরিচয় দিলেন।

"মানে, অন্ধকার ঘনীভূতক যন্ত্র।"

আমার বঙ্গানুবাদ শুনে উনি খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন, "খাসা বলেছ তো হে। অন্ধকার ঘনীভূতক! বেশ ভূত ভূত গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।"

উঃ আবার সেই ভূত!

প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বললাম, "অন্ধকারের প্রতি আপনার এত মোহ কেন? একে তো লোডশেডিং এর ঠেলায় সন্ধ্যে থেকেই অন্ধকারের বাড়বাড়ন্ত, তার ওপর দিনের বেলায় অন্ধকার ঘরে বসে তাকে আবার যন্ত্র দিয়ে জমাট বাঁধানোর এই প্রচেষ্টাটা খুব একটা ভাল ঠেকছে না।"

ভূতনাথবাবু বললেন, "ত্রৈলোক্যনাথের লুল্লু ভূতের গল্প পড়েছো তো, যেমন জল জমে বরফ হয়, তেমনি অন্ধকার জমাট বেঁধে হয় ভূত। আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি, তুমি ইচ্ছে করলে ইজিচেয়ারে এসে বসতে পার।"

"ক্ষেপেছেন?" আঁতকে উঠলাম আমি, "এখানে কি সমস্ত কলকাঠি নেড়ে রেখেছেন, কোন সময় হয়তো সত্যি সত্যিই ভূত দেখে ফেলব।"

"বেশ, তা হলে যেখানে খুশি বসে ভূত দেখ—" ভূতনাথবাবুর টিপ্পনি।

"যা বিশ্বাস করি না, আর যে ব্যাপারে মোটেও আগ্রহ নেই, সেই সমস্ত রাবিশ দেখার ইচ্ছেও নেই," বললাম আমি।

"ভূত বিশ্বাস কর না? অন্তর থেকে বলছ তো কথাটা?" ভূতনাথবাবু এই প্রশ্নটা আগেও অনেকবার আমাকে করেছেন। সেই একই উত্তর দিলাম, "না, করি না। ভূত কস্মিন কালেও ছিল না। এখনও নেই। কোনদিন থাকবেও না, ও সমস্ত আমাদের মনগড়া কল্পনাবিলাস।"

ভূতনাথবাবু গম্ভীর গলায় বললেন "তবে শুনে রাখ, ভূত ছিল, ভূত আছে, ভূত থাকবে। আমি পাশের ঘরে আছি, ভয় পেলে ডেকো।" বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে ভুললেন না উনি।

ঐ যন্ত্রটা আর যন্ত্রের নীলাভ আলো কিন্তু ভারী চমৎকার। চোখ জুড়িয়ে যায় যেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে কি রকম ধাঁধাঁর মত লাগে। বেশ নেশা ধরে যায়। পরিবেশটাও দারুণ হয়েছে। নেহাৎ ভূতে বিশ্বাস নেই তাই না হলে ভূত দেখার মতই বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু একি! মনে হচ্ছে যন্ত্রটার পেছনে অন্ধকার বেশ ঘন হচ্ছে। কি আশ্চর্য! দেখতে দেখতে ওটা একটা মানুষের আকার নিল।

স্বপ্ন দেখছি না তো! নিজের হাতে বেশ জোরে একটা চিমটি কাটলুম। না, ঠিকই আছে।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা মিশকালো মানুষ, আকারে অনেকটা বড়। গোল ভাঁটার মত লাল লাল চোখ। বড় বড় কান। লম্বা লম্বা দুধ-সাদা দাঁত।

কিম্ভূতকিমাকার ঐ বস্তুটি কি?

"কিরে ডাকছিস কেন?"

খ্যানখেনে নাকি সুরের বিকট শব্দে আঁতকে উঠলাম।

"কে ডাকছে? কাকে ডাকছে?"

"তুই ডাকছিস। আমায় ডাকছিস।"

"কে তুমি?"

"আমি ভূত।"

"হ্যাঁ ভূত বললেই ভূত! কি ভূত?"

"ভূতের আবার জাতপাত আছে নাকি? ভূত ইজ ভূত। ভূমণ্ডলে ভূতের ঐ একমাত্র পরিচয়।"

"ভূতে আমার মোটেও বিশ্বাস নেই।"

"যাকে বিশ্বাস করিস না, তাকে ডাকছিস কেন?"

"বাজে কথা। একবারও ডাকিনি।"

"একবার নয় বারবার ডাকছিস। শুধু আজ নয়, কদিন ধরেই আকুল হয়ে ডাকছিস। বহুবার তোকে দেখা দেবার চেষ্টাও করেছি। কত কথা বলেওছি। কিন্তু তুই অতি অস্থির

মতি। ভাল করে দেখবি না, শুনবি না তো আমি কি করব? ভূতনাথের এই ভূতযন্ত্রটা তোর মন স্থির করে আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে বলেই আমাকে এখন দেখতে পাচ্ছিস। আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস।"

ভূতনাথ বাবুর পাল্লায় পড়ে ক্রমশ ক্রমাগত ভূত ভূত শুনতে শুনতে ভূতের ছবি দেখতে দেখতে ভূত ভূত ভাবতে ভাবতে আমার অচেতন মন ভূতময় হয়ে উঠেছে। অনুকূল পরিবেশে আমার আজগুবি ভাবনা চিন্তাগুলো এখন স্বপ্নের মত দেখা যাচ্ছে। এটা মতিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

"ভাঙ্গবি তবু মচকাবি না? চোখের সামনে দেখেও প্রত্যয় হচ্ছে না?" ভূতের দেখছি ভাষার ওপর বেশ দখল। ছোটবেলায় ভূত পেত্নী বিশ্বাস করতাম। ভয় পেলেও ভূতের গল্প শুনতে বেশ ভালই লাগত। একটা রোমাঞ্চকর শিহরণ, গা ছমছমে ভাব। রাত বিরেতে একা থাকতে ভয় করত। এখন ঐ সমস্ত ঘটনা সত্যিই ভূত মানে অতীত স্মৃতি। প্রস্তরীভূত ফসিলও বলা যায়।

"খবরের কাগজ পড়িস তো? কি লিখেছে সে দিন?"

নীরবতা ভেঙ্গে ভূতের কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠল, "গুনিন গ্রামে ভূতের উপদ্রব। উড়িয়ে দিতে পারিস ব্যাপারটা?"

"ঐ সমস্ত অজ পাড়াগাঁয় তোমাদের অস্তিত্ব হয়তো টিঁকে আছে, কিন্তু শহরে, বিশেষ করে এই কলকাতায়, ভূতদের টিকি দেখা যাবে না।"

ভূত খিঁচিয়ে উঠল, "কলকাতায় ভূত কিলবিল করছে। নানান বেশ ধরে বেশ স্টাইল করে রয়েছে বলে ঠিক চিনতে পারছিস না। ভাল করে তাকালেই দেখতে পাবি। গোলদিঘীর ধারে সরকারী মস্ত লাল বাড়িটা থেকে সুরু করে—ঐ যে বাড়িটা যেখানে কাজ ছাড়া বাকী সমস্ত কিছুই হয়, মহাঅকর্মণ্য নাকি ঐরকম গালভরা নাম আছে বাড়িটার...।"

আমি সরকারী চাকুরে। খোঁচাটা ঠিক হজম করতে পারলাম না। ভূতের কথার মাঝখানেই গম্ভীর হয়ে বললাম, "দেখো ভূত, মহাকরণে কাজ হয় না এটা ঠিক বলছ না তুমি...।"

"থাম্ তুই, আর সাফাই গাইতে হবে না।" দাবড়ে উঠল ভূত, "কত যে কাজ হয় ওখানে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। উলুবেড়ের প্রাণগোবিন্দ প্রামাণিক বারো বছর আগে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে, এই এক যুগ ধরে নানারকম চেষ্টা চরিত্র করেও পেনশন না পেয়ে দুশ্চিন্তায় হার্ট ফেল করে ভূতত্ব পেয়েছে সম্প্রতি। কদিন আগে আমায় দুঃখু করে বলছিল, নিজের পেনশনটা তো পেলাম না, এখন স্ত্রীর মানে বিধবার পেনশনটাও যদি না পাওয়া যায় সংসারের যে কী হাল হবে! শুনে খুব খারাপ লাগল, তাই গিয়েছিলাম ঐ লাল বাড়িটায় প্রাণগোবিন্দের হারানো ফাইলটা উদ্ধার করতে। গিয়ে তো আমি তাজ্জব! চেয়ারগুলো বেবাক ফাঁকা। ঘর দালান খাঁ খাঁ করছে। দু চার জন যারা এসেছে তারা হয় বাইরের বারান্দায় আর নয় নিচের উঠোনে জটলা করছে। মাঝে মধ্যে আকাশের দিকে ঘুসি পাকিয়ে কাকে যেন গালাগাল দিচ্ছে!"

"গালাগাল নয়, ওটা হচ্ছে স্লোগান" আমি ভূতের ভুল শুধরে দিলাম।

ভূত অবাক হয়ে বলল "বলেছিস ভাল। ঐ রকম গানের ছিরি! বাপরে কি আওয়াজ।

মেসিনগানকেও হার মানায়। শুনে তো ঝাড়া ছত্রিশ ঘন্টা কানে তালা লেগে গিয়েছিল আমার। এদিকে হাড়গোড় ভেঙ্গেছে।"

"তা হাড়গোড় ভাঙ্গল কি করে?" জিজ্ঞেস না করে আর পারলাম না। ভূত বলল "ও! সে ব্যাপারটা তো তোকে বলাই হয় নি। ঐ লাল বাড়িটার অফিসে লোকজন নেই দেখে প্রথমে তো চেয়ার টেবিল গুলোকে খুব ধমকে দিলাম। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখি ফাইলের পাহাড়। ভাবলাম নিজেই খুঁজে বার করি প্রাণগোবিন্দের ফাইলটা। ভূতের অসাধ্য তো কিছুই নেই। ওমা, যেই একটা ফাইল ধরে টান দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে পাহাড়টা আমার ওপর ভেঙ্গে পড়ল। ওরে বাবারে! কি যন্ত্রণা রে! এখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না।"

"আহারে চুক্ চুক্, তা ব্যথা কমানোর ওষুধ খাচ্ছ না কেন?" আমার সহানুভূতির প্রত্যুত্তরে খিঁচিয়ে উঠল ভূত "থাম তুই। আর দরদ দেখাতে হবে না। ওষুধ বিষুধে আমার রুচি নেই, তার ওপর তোদের মত হাতুড়েদের ওষুধে হিতে বিপরীত হবে। ও ব্যথা আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। যাক যা বলছিলাম...।"

"আর শুনতে চাই না, ভূতের অসাধ্য বলে কিছু আছে? আবার মহাকরণে গিয়ে প্রাণগোবিন্দের ফাইলটা উদ্ধার কর" উৎসাহ দিলাম ভূতকে।

"ক্ষেপেছিস! আবার ও মুখো হচ্ছি? বাপরে কি উদ্ভট জায়গা। ঐ ফাইল উদ্ধার আমার দ্বারা হবে না।"

"এত দমে যাচ্ছ কেন?" ভূতকে সাহস দেবার চেষ্টা করলাম। "ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম---- পারিব না এ কথাটি বলিও না আর। তুমি চেষ্টা কর নিশ্চয়ই পাবে। আবার বলছি ভূতের অসাধ্য বলে কিছু নেই।"

ভূত ব্যাজার হয়ে বলল "এদ্দিন তো ঐ রকমই ধারণা ছিল আমার। কিন্তু এখন দেখছি মহা...মহা...কি যেন নাম? ঐ বাড়িটা থেকে ফাইল উদ্ধার করা ভূতেরও অসাধ্য।"

খানিকক্ষণ দম নিয়ে ভূত আবার সুরু করল। "কলকাতায় ভূত নেই বলছিলি! ঐ লাল বাড়িটা থেকে সুরু করে ছাপাখানা, খবরের কাগজের অফিস, আকাশবাণী, দূরদর্শন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, টেলিফোন ভবন, হাসপাতাল সর্বত্রই ভূতেদের রাম রাজত্ব।"

ভূতের মুখে রাম নাম শুনে আমি তো থ! বললাম "রাম নাম যখন করলে বলতো রাম মন্দির নিয়ে এত হই চই, রাজনীতি কেন?"

"রাজনীতি না তোর মুণ্ডু, এটা হচ্ছে ভূতপ্রীতি। তা না হলে কবে কোথায় কি ছিল না ছিল তা নিয়ে এত মাতা ফাটাফাটি কেন? আসলে মানুষ হচ্ছে ভীষণ ভূত ভক্ত জীব। অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকতেই তার আনন্দ! মানে রাম আনন্দ।"

"তোমার মুখে বার বার রাম নাম শুনে আমি খুব তাজ্জব বনে যাচ্ছি। সেই জ্ঞান হওয়া ইস্তক জানি ভূত আর রাম আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক..." আমার কথার মাঝখানেই ধমকে উঠল ভূত "ও সমস্ত আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, ভূত বিদ্বেষী প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত। যেমন ভূতের সঙ্গে ভয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এই রকম ভুল ধারণা তোদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোরা বিপদে পড়লেই আমরা দৌড়ে আসি তোদের

পাশে দাঁড়াতে, কিন্তু ভূত দেখেই যদি তোদের চোখ কপালে তুলে দাঁতকপাটি লাগে। ভয়ে যদি তোরা ভিরমি যাস সেটা কি ভূতের দোষ?"

"আমি বাপু শহরে একটা ভূতও দেখিনি" না বলে আর পারলাম না।

"চোখ থাকলে তো দেখবি", বলল ভূত "আচ্ছা বাস ট্রামের উপচে পড়া ভীড়ের দিকে কোনদিন ভাল করে তাকিয়ে দেখেছিস? যে লোকগুলো হাতল ধরে বাদুড়ঝোলা ঝুলছে...অনেকে আবার কিছু ধরতে না পেরে স্রেফ আঙ্গুল ঠেকিয়েই ঝুলন্ত, ওরা সবাই কি মানুষ বলে তোর ধারণা?"

"কথাটা মন্দ বলনি" তারিফ করতেই হল "অনেকদিন আগে লীলাদির একটা লেখা পড়েছিলুম। উনিও ঐ রকম কিছু সন্দেহ করেছিলেন বলে মনে হচ্ছে।"

ভূত এবার উৎফুল্ল হয়ে বলল "তবেই দ্যাখ্, লীলা মজুমদারের মত অত বড় সাহিত্যিকও ভূতকে একেবারে উড়িয়ে দেন নি। আর তুই এসেছিস ভূতকে অস্বীকার করতে, তুই কোথাকার কোন হরিদাস পাল?" আমি বেজায় চটে গেলাম। "দেখো ভূত, তুমি খুব অপমানজনক কথাবার্তা বলছ, এর ফল ভাল হবে না।"

ভূত তাচ্ছিল্য করে বলল "বেশ বলেছি, আবার বলব। কি করবি তুই?" তাইতো কি করব আমি? দারুণ বিপাকে পড়ে গেলাম। হঠাৎ মনে এল, ছেলেবেলায়, পাড়ার ক্লাবে কদিন বক্সিং শিখেছিলাম। খুব শক্ত করে একটা ঘুঁসি পাকিয়ে বললাম "দেখেছো তো এটা। এর ওজন কত জান?"

ভূত তো হেসেই খুন "ঘুঁসি মারবি? মেরেই দ্যাখ্ না একবার, কি চিত্তিরটা হয়! আমাকে স্পর্শ করতে তো পারবিই না। উল্টে ঘুসিটা পেছনের দেওয়ালে লেগে, হাত ভেঙ্গে দ হয়ে যাবি।"

আমি সংশয় প্রকাশ করলাম "তোমাকে স্পর্শ করতে পারব না কেন? তুমি কি অস্পৃশ্য নাকি?"

ভূত রহস্যময় গলায় বলল "ঐ তো মজা! আমরা ইচ্ছে করলেই তোদের ঝুঁটি ধরে পল্কা নাচাতে পারি, কিন্তু তোরা আমাদের ছুঁতেই পারবি না। আমরা তোদের সামনে রূপ ধরে দেখা দেব, আমাদের কথাবার্তাও শুনতে পাবি, কিন্তু ভূতদেহ স্পর্শ করা যায় না, এটাই ভূতেদের ভৌত ধর্ম"।

"বেশ ছুঁতে না পারলেও গালাগাল তো দিতে পারি" ব্যাজার হয়ে বললুম।

"তা ছাড় দু চারটে। দেখি তোর গালি গালাজের স্টকটা কেমন?" ভূত আমাকে উৎসাহ দিল। আমি খুব চিন্তা করে বললাম "তুমি হলে গিয়ে হাড় হাভাতে, অলবড্ডে, বাউণ্ডুলে।" ভূত টিটকিরি করে বলল "ঐ সমস্ত বস্তাপচা গালিগুলো ঠাকুর্দার আমলে চালু ছিল, নতুন কিছু বল।"

আমি আরও খানিকটা ভেবে বললাম "তুমি হলে গিয়ে ম্যালেরিয়া, ক্যানসার, জণ্ডিস।"

শুনে তো ভূত হেসেই অস্থির "তিনটে বিপজ্জনক রোগের নাম করলি বটে, কিন্তু এগুলো ঠিক গালাগালের পর্যায়ে পড়ে না, জবরদস্ত কিছু বল এবার।"

দিনে রাতে কতলোকের গালাগাল তো শুনছি, মাঝে মধ্যে দু এক জনকে দু একটা দিচ্ছিও। কিন্তু এই সঙ্কটজনক মুহূর্তেও একটা যুৎসই গালি মনে আসছে না আশ্চর্ব!

অনেক ভেবে কুলকিনারা না করতে পেরে বিরক্ত হয়ে বললাম "তুমি একটা কিম্ভূত।"

ব্যাস আর যাবে কোথায়, সুরু হল ভূতের তাণ্ডব নৃত্য। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল "কি বললিরে বেল্লিক, কিম্ভূত? কিম্ভূত হল গিয়ে অতি নিম্নস্তরের প্রেতাত্মা। ওদের ভূতত্ব পেতে গেলে অনেক জন্ম তপস্যা করতে হয়। আমরা হলাম গিয়ে আঠাশ পুরুষের খানদানি বনেদী ভূত। আমায় কিনা কিম্ভূত বলে অপমান? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।"

ভূত দাঁত খিঁচিয়ে লিকলিকে হাতদুটো বাড়িয়ে তেড়ে এল। 'কিম্ভূত' শব্দটার এ রকম মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে কল্পনাও করতে পারিনি। মনে মনে বেজায় ঘাবড়ে গেলেও বাইরে খুব একটা সাহসী ভাব দেখিয়ে বললাম "এই যে ভয় দেখানো, এটাই তোমাদের ব্রহ্মাস্ত্র। ভয় পেলেই ফোঁস কেউটে হয়ে তেড়ে আসবে আর ভয় না পেলে একেবারে গুটিয়ে কেঁচো।"

ভূত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

"কেঁচো কি কেউটে, মট্ করে ঘাড় মটকালেই টের পাবি।"

ভূত ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। ওর হাড় জিরজিরে হাত দুটো আমার গলার কাছে পৌঁছে গেছে। ভূতের বরফের মত ঠান্ডা নিশ্বাস, একেবারে ঘাড়েব ওপর এসে পড়েছে। আতঙ্কে আমার কাঁপুনি সুরু হয়ে গেছে। নিজের হৃদপিন্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, পাগলা ঘোড়ার মত লাফাচ্ছে যেন। তবে কি সত্যি সত্যিই ভয় পেয়েছি? কি করি এখন! মাথার মধ্যে সমস্ত কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যা হয় হোক। ভূতনাথ বাবুকে ডাকব না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না।

ডাকব না ডাকব না করে, চেঁচিয়ে ভূতনাথ বাবুকেই ডাকতে গেলাম .."ভূ...ভূ....ভূ..."

মুখে চোখে ঠান্ডা জলের ঝাপটায় জ্ঞান ফিরে এল। ঘরের দরজা জানালা সমস্ত খোলা। আলোয় আলোময়। মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ফুলস্পীডে পাখা ঘুরছে।

ভূতনাথ বাবু আমার মুখের ওপর আবার জলের ঝাপটা দিয়ে মুচকি হেসে বললেন "না হে আর ভয় নেই। ভূত চলে গেছে।"

ধড়মড় করে উঠে বসলাম, ভূতনাথ বাবুর মিচকে হাসি গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল যেন "কি গো বীরপুরুষ কি হল?"

ইতঃস্তত করে বললাম "কি আবার হবে? ঐ নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হল আর কি! একদিকে আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন অবুঝ মন, অন্যদিকে বিজ্ঞান সচেতন যুক্তিবাদী মন...এই দুই -এর একটা সংঘাত, মানে টানাপোড়েন".... আড়চোখে ভূতনাথ বাবুর মুখটা একবার দেখে নিয়ে ব্যাজার হয়েই বলে ফেললাম "ঐ মানে, সাময়িক ভাবে সংস্কারেরই জয় হল বটে, কিন্তু তা বলে তো সেটাকে আর প্রাধান্য দেওয়া যায় না...

এটা মনের গভীরতম স্তরে....” “থামো” ধমক দিলেন ভূতনাথ বাবু “ওসব লম্বা চওড়া লেকচার শুনতে চাই না। মোদ্দা কথাটা বলতো এবার, ভূত আছে না নেই?” “না নেই” গলা ফাঠিয়ে চিৎকার করে উঠলাম “ভূত কস্মিনকালে ছিল না, এখনও নেই, কোনোদিন থাকবেও না।”

কিন্তু নিজের কানকে তো আর অস্বীকার করতে পারি না, পরিষ্কার স্ব-কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম ঃ

“ভূত ছিল, ভূত আছে, ভূত থাকবে।”

গল্প থামতেই তান্ত্রিক খিঁচিয়ে উঠল “ঐ তোদের দোষ, মুখে বলবি ভূত বিশ্বাস করি না, ভূতেদের নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করবি আর ভেতরে ভূতের ভয়ে জু জু হয়ে থাকবি। এসেছিস যখন এখেনে থাক কদিন। ভূত, প্রেত, পেত্নী, শাঁকচুন্নি আর অনেক রকম বিকট অশরীরীদের স্বচক্ষে দেখে যা। স্বকর্ণে ওদের কথাবার্তাও শুনে যা।”

তান্ত্রিকের চেলাগুলো একসঙ্গে মাথা নাড়িয়ে “হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকঠিক, এখানে যখন এয়েচ, কদিন নিজেই ভূতেদের ব্যাপার স্যাপার দেখে শুনেই যাও না বাপু, পরের মুখে ঝাল খেয়ে কি লাভ?” বলেই গ্যাঁজা টানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা শোরগোলের শব্দ উঠল। অদূরে দেখা গেল একজন মাঝবয়সী লোক একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। ওদের সঙ্গে হৈচৈ করতে করতে আসছে এক দঙ্গল জনতা।

মাঝবয়সী লোকটি তান্ত্রিকের কাছে এসে “বাবাঠাকুর আমার মেয়েকে ভূতে পেয়েছে। ভূত ছাড়াও” বলেই মেয়েটির ঘাড়ে মারল এক রাম ধাক্কা। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে তান্ত্রিকের ওপর।

ঘটনাটি এই রকম ঃ

মেয়েটির নাম টিয়া, পাশের গ্রামের ভুবন নামের একটি ছেলের সঙ্গে ওর ভাব ভালবাসা ছিল। এই নিয়ে উভয়ের বাড়ির মধ্যে তুমুল অশান্তি। সেটা কদিন আগে চরম অবস্থায় গেলে ভুবন ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা করে। তারপর থেকেই টিয়ার মধ্যে নানারকম অস্বাভাবিকত্ব দেখা যাচ্ছে। সে আপন মনে হাসছে কাঁদছে। একটু কিছুতেই চটে গিয়ে বাড়ির লোকেদের মারধোর অশ্লীল গালিগালাজ আর তুলকালাম কান্ড করছে। যখন তখন বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। লজ্জা সরম একেবারে লোপ পেয়েছে, এতবড় ধিঙ্গী মেয়ে যার তার সামনে একেবারে উদোম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টিয়ার বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীদের ধারণা তাকে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে। নির্ঘাৎ ভুবনের আত্মা টিয়ার ঘাড়ে ভর করেছে।

ইতিমধ্যে টিয়াকে ছোটখাট ওঝা, গুণিন দিয়ে ঝাড়ফুঁক করানো হয়েছে তাতে বিশেষ সুবিধে না হওয়ায় নিয়ে এসেছে এ তল্লাটের গুণিন শ্রেষ্ঠ ভুতুড়ে তান্ত্রিকের কাছে। “এই রকম একটা ঘটনার পর এ ধরনের মানসিক বিকার হতেই পারে। এটা মনের রোগ মানে সাইকোলজিক্যাল কেস। ডাক্তারি চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে”—আমার

কথা শুনেই খেঁকিয়ে উঠল তান্ত্রিক, "থাম্ বেশি বাহাদুরি মারতে হবে না। মনের রোগ না মুন্ডু। টিয়াকে ভূতেই ধরেছে। কেমন করে ভূত ছাড়াই এবার দ্যাখ্" বলতে না বলতেই তান্ত্রিকের মুখ চোখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে হাতে একটা মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে টিয়াকে বেধড়ক পেটাতে সুরু করল। মুখে বিকট চিৎকার "বল্ তুই কে? নইলে মেরেই শেষ করে দোব।"

বেশ কয়েক ঘা ঝাঁটা পেটা খেয়ে মেয়েটা অনেকটা ছেলেদের মত মোটা গলা করে বলল, "আমি ভুবন। টিয়ার প্রেমিক।" তান্ত্রিক হুংকার ছাড়ল, "টিয়াকে ছেড়ে দে।"

টিয়া অর্থাৎ ভুবনের আত্মা বলল, "ছাড়ব না।"

"তবে রে শুয়োরের বাচ্চা। দাঁড়া এবার মজা দেখাচ্ছি তোকে" বলেই তান্ত্রিক এক চেলাকে হুকুম দিল, "যা ঝুপরি থেকে পেতলের ঘড়াটা নিয়ে জল ভরে আন।"

চেলাটি দৌড়ে গিয়ে ঝুপরি থেকে বেশ বড় গোছের একটা পেতলের ঘড়া নিয়ে সামনের পুকুরে ডুবিয়ে জল ভর্তি করল। বহু লোক চারদিকে ভীড় করে রয়েছে, কিন্তু নিস্তব্ধ। সবাই রুদ্ধশ্বাসে টিয়ার ভূত ছাড়ানো দেখছে।

জল ভর্তি ঘড়াটা টিয়ার সামনে রেখে তান্ত্রিক বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে হাতের ঝ্যাঁটা নাচিয়ে সুরু করল ভূত ঝাড়ন মন্ত্র ঃ

সুতো কাটেন শ্রীরামচন্দ্র বনেতে বসিয়া
সীতাদেবী দেখেন তাহা কাছেতে রহিয়া
রামচন্দ্র সুতো কাটেন সীতাদেবী দেখেন
সীতাদেবী কথা বলেন রামচন্দ্র শোনেন
হেনকালে দেবর লক্ষ্মণ তথায় প্রবেশিল
লক্ষ্মণের হেরি রাম বার্তা জিজ্ঞাসিল
"কিসের কারণে ভাই বিলম্ব হইল
পথে কোন বাধা বিঘ্ন হইল না হইল
বল ভাই সব কথা বলহ সত্বর
কাতর হইয়া আছে আমার অন্তর"
লক্ষ্মণ বলেন "আমি গিয়েছিনু পর্বত শিখরে
তথায় দেখিলাম ভূত হাজারে হাজারে
মানুষ তথা একটিও নাই ঘর বাড়ি ছাড়ি পালায় সবাই
লক্ষ্মণের বার্তা শুনি রাম কহিল "ভূতেদের দেখি বাড় বড় বাড়িল"
এত বলি রামচন্দ্র যেই ফুঁক মারিল
রামের এক ফুঁকে ভূত পলাইল
টিয়ার অঙ্গে আর ভূত নাই
ভূত গিয়েছে ভয়ে দূরেতে পলাই
কার আজ্ঞে—

সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞে।

মন্ত্র থামিয়ে আপন মনে বিড় বিড় করে কি সমস্ত আউড়ে তান্ত্রিক হুংকার ছাড়ল মুড়ো ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে "ভুবনের ভূত এবার জলভরা পেতলের ঘড়াটা মুখে করে তুলে ঐ গাছটার নিচে নামিয়ে আয়।" তান্ত্রিক আঙ্গুল তুলে দূরে একটা বিশাল বটগাছ দেখিয়ে দিল।

তাজ্জব ব্যাপার! টিয়ার মত এরকম একটা রোগা পটকা মেয়ে স্রেফ দাঁতে করে, জলভরা মস্ত ঘড়াটা অবলীলায় তুলে দৌড়তে দৌড়তে প্রায় এক ফার্লং দূরের বটগাছটার নিচে নামিয়ে রাখল। টিয়ার (নাকি ভুবনের ভূত) সঙ্গে সঙ্গে জনঅরণ্য দৌড়ে এসেছে এখানে। তান্ত্রিকও এসেছে। আমিও এসেছি।

টিয়া মুখ থেকে ঘড়া নামিয়ে বসে বসে হাঁপাতে থাকল। তান্ত্রিক চিৎকার করে উঠল, "কি এবার টিয়ার ঘাড় থেকে নামবি?"

"কিছুতেই নামব না" ভুবনের ভূতের হুংকার।

"তবে রে বেল্লিক এতেও তোর শিক্ষা হলো না?" ঝাঁটা তুলে তান্ত্রিক আরও কড়া গোছের ঝাড়ন মন্ত্র সুরু করল ঃ

শশী পীর বড় পীর হোঁদো নয় হানি
কেদারনাথের পূজা লইল যে মানি
নৃসিংহ মন্ত্রে ভূত কাঁপে থর থর
নসিংহ দেবের মন্ত্র ভর কর
ছারু ছারু ভূত শীঘ্র করি ছারু
তুহারে তাড়াতি মারি করি ঝাড়ু

এই মন্ত্রেও টিয়া মানে ভুবনের ভূতের কিছু ভীতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হলো না। তান্ত্রিকের দাবড়ানির প্রত্যুত্তরে সে স্পষ্ট জানিয়ে দিল টিয়ার শরীর ছেড়ে সে যাবে না। ভূত ছাড়াতে না পেরে তান্ত্রিকের সম্মানে খুব লাগছে। চটে মটে ওর মুখচোখ একেবারে রক্তবর্ণ। দাঁত খিঁচিয়ে, লেখার অযোগ্য একটা অশ্লীল খিস্তি দিয়ে তান্ত্রিক হুংকার ছাড়ল, "...এবার লঙ্কা পোড়া, সর্ষে পড়া আর ঝাঁজালো মোক্ষম মন্ত্রে তুই কেন তোর চোদ্দ পুরুষ পালাতে পথ পাবে না।" তান্ত্রিকের নির্দেশে চ্যালারা সর্ষে আর লঙ্কা এনে জড়ো করল। তান্ত্রিক বিকট চিৎকার করে আর লম্ফ ঝম্প মারতে মারতে সুরু করল ঝাঁঝালো মন্ত্র ঃ

ভূতগণ কেন সবে এত খুশী হইল টিয়ারে ঘিরি সবে নাচিতে লাগিল
অবশেষে একভূত আসি ভর করিল টিয়ারে তাই বুঝি ভূতেতে ধরিল
লাখ সেলাম সাঁইজীকা পায় যাহার স্মরণে সব ভূত পালায়
লঙ্কার বড় ঝাঁঝ ভূত সহিতে না পারে সর্ষে পড়ায় ভূত পালায় যায় দূরে
সরিষা সরিষা তুই কর চড়বড় মন্ত্রগুণে সরিষারে এবে শক্তি ধর
ক্ষুদ্র তাহা ক্ষুদ্র নয় তোর তেজের তাপে ঈশ্বর মহাদেবের ত্রিজটা যে কাঁপে
কালো সাদা হলুদ সরিষা হাতের মুঠোয় এবে আইল

ভূত তাড়া ভূত তাড়া প্রেতাদি মার মার ঝারা
সমস্ত ক্ষেত যাইয়া যারে সরিষা বাইয়া
নৃসিংহদেব সরষেতে দিলেন আসি ভর
পালারে পালারে ভূত পালারে সত্বর
কার আজ্ঞে—
হাড়ির ঝি চন্ডীর আজ্ঞে
কার আজ্ঞে—
দক্ষিণা কালিকার আজ্ঞে............
কার আজ্ঞে—
নৃসিংহ দেবের আজ্ঞে

মন্ত্র শেষ করে তান্ত্রিক একমুঠো সর্ষে ছুঁড়ে দিল টিয়ার গায়ে। তান্ত্রিকের আদেশে ওর চেলা চামুন্ডারা ধুনুচিতে লঙ্কা পুড়িয়ে তার ধোঁয়া টিয়ার নাকের কাছে ধরল।

টিয়া মানে ভুবনের ভূত এবার ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে নাকি সুরে কাঁদুনি জুড়ে দিল, "উনি বাবারে আর সইতে পারছি না..... চলে যাচ্ছি.... চলে যাচ্ছি....."

"যাচ্ছিস যে বুঝব কি করে? তুই বরং বটগাছটার একটা ডাল ভেঙ্গে পালিয়ে যা।" বলল তান্ত্রিক।

পরিষ্কার আকাশ। কোথাও কিচ্ছু নেই, মনে হলো যেন একটা ঝড় উঠল। চোখের সামনে বটগাছটার মস্ত একটা ডাল ভেঙ্গে পড়ল মড় মড় করে। বোঝা গেল টিয়ার শরীর ছেড়ে ভুবনের আত্মা পালাল এবার।

কি ভেবে তান্ত্রিক আবার হাঁক পাড়ল, "না, তোকে ছাড়া যাবে না।"

ভুত ছাড়তে দেরি করেছে বলে তান্ত্রিক তার ওপর বেজায় চটেছে। তান্ত্রিক এক চেলার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভূতো, একটা বোতল নিয়ে আয়।" তান্ত্রিকের নির্দেশ পাওয়া মাত্র সিঁটকে মার্কা একটা চেলা, একটা দিশী মদের খালি বোতল নিয়ে এল। টিয়া নিস্তেজ হযে পড়ে যাচ্ছে। তান্ত্রিক ঈশান মুখো হযে বটগাছটার দিকে তাকিয়ে বিড বিড করে দুর্বোধ্য কিছু মন্ত্র পাঠ করতেই টিয়া নড়ে চড়ে উঠে কাঁপতে সুরু করল, "আমি তো চলেই গিসলাম, আবার ডাকলে কেন?"

"তোকে বোতলে পুরে রাখব" হুংকার ছাড়ল তান্ত্রিক।

"তোমার দুটি পায়ে পড়ি এবারের মত ছেড়ে দাও আর কারো ঘাড়ে ভর করব না কোনদিন"—টিয়া মানে ভুবনের ভূতের কাতর অনুনয়।

তান্ত্রিক সেই অনুনয়ে কর্ণপাত না করে একবাটি জল মন্ত্রপূত করে বোতলে ভরল, তারপর বোতলের মুখে নাক গুঁজে তিনবার জলন্যাস করার পর সুরু করল বোতলে ভূত বন্দী মন্ত্র,

হে মহাগুরু ক্ষেত্রপাদ তুমি ধরে আনো ভূতকে
এই বোতলটার মধ্যে ওকে সারাজীবন ভরে রাখো
ও ব্যাটা যেন আর কখনও বেরিয়ে আসতে না পারে

ভগবান অষ্টাঙ্গ যে রকম আদেশ দিয়েছেন তেমনটি হোক।

এই মন্ত্রটি আউড়ে তান্ত্রিক ছিপি দিয়ে কষে বোতলের মুখটি আটকে বটগাছের তলায় গর্ত খুঁড়ে ভূত ভর্তি বোতলটা সেই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিয়ে বলল, "যাঃ ভুবনের ভূতকে চিরজীবনের মত জব্দ করে দিলাম। ও আর কোনদিন বোতলটা থেকে বাইরে বেরুতে পারবে না।"

প্রায় বেহুঁশ টিয়ার মুখে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিল তান্ত্রিক। আশ্চর্য! ঠিক যেন ঘুম থেকে উঠল টিয়া। আড়মোড়া ভেঙ্গে, হাইতুলে, চারিদিকে অনেক লোকজন দেখে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে মাঝবয়সী লোকটির (যে টিয়াকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল) দিকে তাকিয়ে খুব ক্ষীণ গলায় বলল, "বাবা, এত লোক কেন চারদিকে? কি হয়েচে আমার? এ জায়গাটাই বা কোথায়? শিগগির আমায় বাড়ি নিয়ে চলো।"

একেবারে স্বাভাবিক শান্ত শিষ্ট মেয়ের মতো আস্তে আস্তে টিয়া ওর বাবার সঙ্গে হাঁটা দিল।

ভূতুড়ে তান্ত্রিকের কাছে কিছুদিন ছিলাম। সে সুযোগে অনেক অবিশ্বাস্য, উদ্ভট কান্ডকারখানা দেখেছি। ভূত সম্পর্কে বিষদ তথ্যাবলীও জেনেছি। ঝাড়ন মন্ত্র, লঙ্কাপোড়ার ধোঁয়া, সর্ষে পড়া ছাড়াও আর যে কয়টি পদ্ধতির খুব প্রচলন সে গুলি হলো— হলুদ পড়া, মেথি পড়া, জিরে পড়া। এর মধ্যে হলুদ পড়ার চল খুব। তার পদ্ধতি ও মন্ত্র এইরকম— একটুকরো গিটে হলুদ কাঠের আগুনে পুড়িয়ে সেই ধোঁয়া ভূতে পাওয়া রোগীকে টানতে বলে ওঝা। সেই সঙ্গে চলে মন্ত্রপাঠ। ধোঁয়া টানা বন্ধ হলেই ভূত পালায় আর ভূতে পাওয়া রোগীও সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে যায়। হলুদ পড়া মন্ত্রটি এই ঃ

হলুদ তুই সোনার বরণ হলুদ তুই ভূত তাড়ন
হলুদের অশেষ গুণ যদি না থাকে নুন
মক্কা পীর আর গোসাঁই হলুদ তোর সর্বত্র বড় ঠাঁই
হলুদের অণুতে মন্ত্র করে ভর ভূত প্রেত কাঁপে থরথর
ওরে ভূত ওরে ভূত আমি হাতে নিলাম হলুদগাছের তীর
তোর ওপর চেপে বসবে হলুদ গাছের পাহাড় পর্বত
ভূত ও দুষ্ট আত্মাদের মুন্ডপাত করতে মহাবীর হনুমান আসছেন
দেবী চন্ডী ও মা কামাখ্যার আদেশে
এবং নৃসিংহ দেবের মহা আজ্ঞায়
অমুকের অঙ্গ ছেড়ে ভূত দূরে যায়...........

এখানে 'অমুক' এর জায়গায় ভূতগ্রস্থ রোগীর নাম উচ্চারণ করতে হবে।

কাউকে যদি মেয়ে ভূত মানে পেত্নী, শাঁকচুন্নীতে পায় তার মন্ত্রটি কেমন হবে এবার শোনা যাক ঃ

ডাকিনী যোগিনী প্রেতিনী শাকিনী
পিশাচিনী সর্বনাশী প্রেতিনীর মুখে হাসি

আপনার মান্য যদি চাসরে রাখিতে
উমকা রে ছাড়ি এবে পালাও ত্বরিতে
ঝটপট ঝটপট কৈলাস যাও
নইলে বসি পঞ্চমুন্ড খাও
কার আজ্ঞে— হাড়ির ঝি চন্ডীর আজ্ঞে
কার আজ্ঞে— কাঁউরের কামাখ্যার আজ্ঞে।

এই মন্ত্র সাতবার পাঠ করতে হবে। একবার মন্ত্র পাঠ করে পেত্নীগ্রস্ত রোগী গায়ে একবার ফুঁ মানে সাতবার এইরকম প্রক্রিয়া করলে পেত্নী রোগীকে ছেড়ে পালাবে। 'উমকা'র জায়গায় পেত্নীগ্রস্ত রোগীর নামোচ্চারণ প্রয়োজন।

একদিন একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে এল কয়েকজন ভূতে পেয়েছে মনে করে। তান্ত্রিক কয়েকটি ঘেঁচি কড়ি মাটিতে ফেলে, নানা রকম যোগ বিয়োগ করে (গুণে) বলল, "না, একে ভূতে পায়নি। ডাইনির নজরে পড়েছে।"

ছেলেটি আপন মনে বিড়বিড় করছে, কখনও হাসছে কখনও কাঁদছে। মাঝে মধ্যে উদাস হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর কখনও কখনও মৃগী রোগীদের মত ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে। ভুতুড়ে তান্ত্রিক ডাইনির দৃষ্টি কাটান ঝাড়ন মন্ত্র পাঠ করে ছেলেটির মাথায় তিনবার ফুঁ দিয়ে ঝাঁটা পেটা করতেই ছেলেটি তান্ত্রিককে খিমচে দিয়ে আবার ফুটবল খেলতে ছুটল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ফুটবল খেলতে খেলতেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মন্ত্রটি এইরকম ঃ

ডাইনির দৃষ্টিতে বিষ মাখা থাকে কি করবে ডাইনি কৃষ্ণ যারে রাখে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হে বীর ডাইনি তাড়াতে হও স্থির
কৃষ্ণচন্দ্র দয়া করো এবে রামধনু ধরো
দানব দানবী শিশু খাইবার কণ্ঠ পরে তার শিশুর হাড়
এমন বিপদে ঝাড়া কৃষ্ণ সার ডাইনি তাড়াতে লীলা চমৎকার
রাম লক্ষ্মণ কৃপা করি ধনু ধরিল ভয়েতে ডাইনি বুড়ী দূরে পলাইল
ডাকিনী যোগীনী আর যত পিশাচিনী
ভয়েতে পালায় দূরে রামমন্ত্রে জানি
কার আজ্ঞে— মাতা চন্ডীর আজ্ঞে
কার আজ্ঞে— কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, ভূত প্রেত সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া শ্মশানেই করা হয়। ভুতুড়ে তান্ত্রিকেরও অবস্থান শ্মশান সংলগ্ন স্থানে। যাই হোক, ভূত ছাড়ানোর পদ্ধতিগুলির মধ্যে গাছ চালানো অন্যতম। গাছ চালিয়েও কিছু কিছু ভূতকে জব্দ করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি খুব বিচিত্র— প্রথমে শ্মশানে একটি মাটির আসন (বেদী) গড়ে সেখানে ভূতগ্রস্থ রোগীটিকে নিয়ে যোগাসনে বসে গুণিন ভূতের প্রকৃতি সম্পর্কে জেনে নেয়। তারপর যাকে ভূতে পেয়েছে তার নামে ছোট একটি পুতুল তৈরী করা হয় শ্মশানের

মাটি দিয়ে। এবার পুতুলটাকে চিৎ করে ফেলে তার বুকের ওপর ঐ শ্মশানের মাটি দিয়ে তৈরী একটা সাপের ফণা বানিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়, তারপর যে ভূত ভর করেছে তার নাম ধরে সাপের ফণাটি বিদ্ধ করা হয় লোহার শলাকা দিয়ে। তারপর ছোট একটা গাছকে মন্ত্রপড়ে শক্তি দিয়ে ভূত তাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। গাছটি রোগীর গায়ে আছড়ে পড়ে ভূত তাড়ায়। গাছটিকে ভূত তাড়ানোর বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় এই মন্ত্র উচ্চারণ করেঃ

হে গাছ, হে বৃক্ষ, হে বনস্পতি
তুমি তো এখন খুব শক্তিশালী হয়েছো
দেবী কালী তোমার পরম সহায়
কালীর নাম স্মরণ করে তোমায় আদেশ দিচ্ছি
তুমি এবার ভূতগ্রস্থ রোগীর দেহ থেকে
বজ্জাত ভূতটাকে পিটিয়ে তাড়াও।

ভূত তাড়ানোর কাজে গাছ চালাতে যে সমস্ত উপকরণ লাগে সেগুলি হলো— বাইশ আঙ্গুল লম্বা বাঁশের কঞ্চির তীর ও ধনুক। এক পো বাসমতী আতপ চাল, মেটে সিঁদুর এক থান। এক ভাঁড় গঙ্গাজল, একছড়া মর্তমান কলা, কলা গাছের তিনটি পাতা। ধুপ, ধুনো, এককুড়ি সতেরোটা চীনে গোলাপ ও কিছুটা আখের গুড়।

গ্রামে গঞ্জে এক সংঘাতিক ভূতের খুব উপদ্রব। তার নাম পাঁচুগোপাল। পাঁচজন তাকে পাঁচু বা 'পেঁচো' বলেই ডাকে। এই পেঁচো বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির। হিংস্র, খল, ওর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি গজ গজ করছে। ফাঁক পেলেই এর ওর ঘাড়ে চেপে তাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। কখনো কখনো কারো কারো বাড়িতে আস্তানা গেড়ে মহা অনর্থ বাঁধায়। পাড়াগাঁয়ের মানুষ পেঁচোর ভয়ে তটস্থ, একে পেঁচোয় পেয়েছে কিংবা ওর বাড়িতে পেঁচো বাসা বেঁধেছে শুনলেই বোঝা যাবে 'এর' 'ওর' প্রভৃত সর্বনাশ। পেঁচোর শিশুদের দিকেই বেশী নজর। গ্রামে গঞ্জে ছোটদের দীর্ঘমেয়াদি রোগ অসুখ হলেই পেঁচোয় পেয়েছে এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে।

পেঁচোয় পাওয়া শিশুদের নানা বিপত্তি সুরু হয়। ক্ষুধামান্দ্য, শুকিয়ে যাওয়া, জ্বর, বিকার এমনি নানা ধরনের উপসর্গ, শেষে রোগী একেবারে কঙ্কালসার হয়ে যায় এবং তার মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।

যে বাড়িতে পেঁচো আস্তানা গাড়ে সে বাড়িতেও নানা রকম বিপত্তি সুরু হয়। সে বাড়ির ঘর দালান গোবর ছড়া ও গঙ্গাজল দিয়ে খুব ভাল করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে হয়, তারপর ওঝা, রোজা বা গুণিন এসে উত্তর কিংবা পূর্বদিকে মুখ করে বসে ক্রিয়া সুরু করে। তার আগে বড় এক টুকরো ন্যাকড়ায় গোবর মাখিয়ে একটা মাটির পাত্রে ঘরের এককোণে (সাধারণতঃ ঈশান কোণ) রেখে দেওয়া হয়।

আস্তাকুড়ের জঞ্জাল কুড়িয়ে এনে একটা মাটির উনুনের চারদিকে স্তূপীকৃত করে রাখা হয়। সেই উনুনে গনগনে আঁচে মস্ত একটা লোহার কড়ায় জল চাপিয়ে ক্রমাগত ফুটিয়ে

যেতে হয় যতক্ষণ না পেঁচো বিদেয় হচ্ছে, সঙ্গে চলে এই মন্ত্র উচ্চারণ উচ্চৈস্বরে,

ওরে পাঁচু চিনি আমি তোকে
তুই যে কি কি কুকীর্তি করিস তাও জানি
রাতের অন্ধকারই তোর বেশি পছন্দ
গ্রামের মানুষের ঘরে গিয়ে বাসা বাঁধিস
আমি ন্যায়াধীশ দেবতাদের স্মরণ করি
ওঁরা যেন তোকে দূর করে তাড়ান
এই মুহূর্তেই বিদেয় হ পাজি
নইলে তোকে ঝাঁটা পেটা করব

ক্রমাগত জল ফোটানো ও মন্ত্রপাঠ করতে করতে পাত্র যখন প্রায় জলশূন্য হয় তখন পেঁচো বিদায় নেয়।

আগেই বলেছি পেঁচো ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর চড়াও হতেই বেশি ভালবাসে। একদিন এক পেঁচোয় পাওয়া শিশুকে কয়েকজন নিয়ে এসেছিল ভুতুড়ে তান্ত্রিকের কাছে। তান্ত্রিক এই মন্ত্রটি পাঠ করে বাচ্চাটির মাথায় সাতবার ফুঁ দিয়ে পেঁচো তাড়িয়েছিল।

বাবাঠাকুর বাবাঠাকুর বটমূল থিকা আইস একবার
নইলে যে শিশুর আশা থাকে নাকো আর
চুয়ো পেঁচো কুয়ো পেঁচো শিশুরে ধরিল
বাবাঠাকুর তুমি বিনা কে আর রইল
আমার প্রার্থনা শুনি আইল বাবাঠাকুর
কুয়ো পেঁচো চুয়ো পেঁচো সব হইল দূর
কার আজ্ঞে— ধর্মবাপের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে— বাবাঠাকুরের আজ্ঞে

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কুয়ো পেঁচো, চুয়ো পেঁচো এই জাতীয় বিশেষণে বুঝতে অসুবিধে নেই যে পেঁচোর নানা ধরণ আছে। যাই হোক মন্ত্রবলে পেঁচো তাড়ানোর পর "এটা খুব ভয়ঙ্কর প্রকৃতির পেঁচো, একে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, অনেকের সর্বনাশ করবে" এই বলে তান্ত্রিক ঐ বিশাল বটগাছটার কাছে গিয়ে একমুঠো সমুদ্রের সাদা বালি মন্ত্রসিক্ত করে তাতে সর্ষে মিশিয়ে বটগাছটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে সর্ষেবালির মিশ্রণ ছড়িয়ে দিল। তারপর একটা বেশ বড় গোছের পেরেক পুঁতে দিল বটগাছের গুঁড়িতে মন্ত্র পড়তে পড়তে। ঐ মন্ত্রেই পেরেক বিদ্ধ হয়ে গাছের মধ্যে চিরকাল বন্দী হয়ে রইল ঐ সাংঘাতিক পেঁচো।

শুধু পেঁচো নয়, যে কোন ধরনের ভূতকেই এই মন্ত্রে গাছের মধ্যে (বিশেষতঃ বট, অশ্বত্থ, বেল ও অন্য বিশাল বৃক্ষ) পেরেক ঠুকে পুঁতে রাখা যায়।

ওরে ভূত
আমি স্বর্গ ও নরক উভয়কেই ডাকছি
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বিখ্যাত শ্মশান গোরস্থান আছে
সে গুলোকেও ডাকছি কামাখ্যার নাম স্মরণ করে

আর যত পুরাতন আত্মা যাঁরা কারো অনিষ্ট করেন না
তাদেরও ডাক দিচ্ছি আমি
তা ছাড়াও তাবৎ গৃহস্থবাড়ির সর্বকালীন ইষ্টকারী
মহাপুরুষদের পবিত্র আত্মা এবং ঐ জাতীয় আত্মাসমূহ
এবং অন্যান্য ক্ষমতাবান আত্মাদের আহ্বান করছি
প্রত্যেকেই এসে এই সাংঘাতিক ভূতটাকে ঐ গাছে আটকে রাখুন
এই ব্যাটা ভূত এখন যদি তুই বৃক্ষটি ছেড়ে যেতে চাস
তা হলে বরং গয়াধামে চলে যা
সেখানে বিদেহী আত্মাদের পিন্ডদানে তৃপ্ত ও মুক্ত করা হয়
তুই সেখানে গিয়ে পিন্ডায় খেয়ে মহানন্দে থাকবি
আর তা না হলে আমি আমার জানগুরুর নামে শপথ করছি
তুই যেন চিরকাল এই গাছে বন্দী হয়ে পচে মরিস

ভূত আর গাছের সম্পর্ক সম্বন্ধে এই সুযোগে কিছু বলার অবকাশ আছে।

গ্রামে গঞ্জে বেশ কিছু বিশাল বিশাল নানাজাতের বৃক্ষ থাকে (বিশেষতঃ বট, অশ্বত্থ, বেল, নিম)। সে গুলোকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সঙ্গে সমীহ করে চলে গ্রামের মানুষ, কিছু কিছু গাছকে নিয়মিত পূজা করাও হয়। কোন কোন গাছের নীচে পাথর রেখে সিঁদুর মাখিয়ে শিব প্রতিষ্ঠিত থাকেন ও পূজা পান। গাছগুলি সম্পর্কে বহু রহস্যময় কাহিনী ও উপকথাও প্রচলিত থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এক গ্রামে বিশাল এক নাম না জানা বৃক্ষের নামে দেবোত্তর (নাকি বৃক্ষোত্তর!) জমিও উৎসর্গ করা আছে। ধর্মীয় ও ভয় ভীতির আস্তরণ ও বিধিনিষেধের গন্ডীর মধ্যে গাছগুলোকে বেঁধে রাখার কারণ, কোনমতেই যেন বৃক্ষগুলির ক্ষতি কেউ না করে, কারণ গাছগুলি ভেষজগুণ সহ অন্যান্য বহু কারণে মানুষের পক্ষে খুব উপকারী। কিছু কিছু গাছ ঠাকুর দেবতার নামেও উৎসর্গীকৃত থাকে।

এই জাতীয় বিশালকার বৃক্ষ বয়সে যারা বহু প্রাচীন এবং বিশেষতঃ পুকুর, ঝিল, খাল, বিল ও অন্যান্য জলা জায়গায় যারা সদর্পে মাথা উঁচু করে, বহু ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ অগ্রাহ্য করে, স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে থাকে, সেই পাদপদের সঙ্গে ভূত প্রেতদের নিবিড় সম্পর্ক বলেই গ্রামবাসীদের বিশ্বাস। ঐ গাছগুলোতে নাকি অশরীরীদের আস্তানা। একেই তো গাছগুলোকে দেখলে আপনা থেকেই মনের মধ্যে একটা রহস্যময় আবেশের সৃষ্টি হয়, তার উপর গাছগুলি সম্পর্কে প্রচলিত সত্য মিথ্যা মেশানো নানা ভীতিপ্রদ উপাখ্যান এমন একটা ভাবের উদ্ভব করে রাখে যে রাতবিরেতে তো বটেই এমন কি দিনদুপুরেও ঐ বনস্পতিকুলের কাছাকাছি গেলে গা ছম ছম করে, কাঁটা দেয়।

ভূতকে আবার গন্ডী দিয়েও আটকে রাখা যায়। এটা সাধারণতঃ গুণীনরা নিজেদের স্বার্থেই করে। যাতে ভূত গুনীনদের কোন ক্ষতি এবং গোপন ক্রিয়াকলাপে কোনরকম বিঘ্ন না ঘটাতে পারে। তা ছাড়াও ভূতেরা ওঝাদের ওপর বেজায় চটে থাকে। তাল

পেলেই ঘাড় মটকে সাবাড় করে দিতে পারে। সে জন্য ওঝারা শরীরবন্ধন মন্ত্রে নিজেদের বেঁধে ভূতেদের হাত থেকে নিরাপদে থাকে। ভূতবন্দী ছাড়াও ভূত তাড়ানোর নানারকম মন্ত্র আছে তার মধ্যে একটি

ওরে বাবা ভূত কি বিচ্ছিরি দেখতে তোকে
ঠিক যেন বিদঘুটে একটা চেটালো তেলের পাত্রের নীচে
ঝুলছে ভাঙ্গা কাস্তের মত একসারি দাঁত
চোখদুটো মস্ত গোলাকার ভাঁটা যেন কানদুটো কুলোপানা
হে বাবা ভূত তুমি এসেছ বদ উদ্দেশ্য নিয়ে
উদ্দেশ্য সফল করবে বলেই মুচকি হাসছ
কি বিতিকিচ্ছিরি হাসি রে তোর
নাও বাপধন ভূত এবার গেলো তো এই ডিমগুলো
একটা হাঁসের একটা মুরগির আর একটা কচ্ছপের
একটা গাঁদাল গাছ এখানে খাড়া করে রাখা আছে
কারো কোন ক্ষতি না করে এখান থেকে কেটে পড়ো

মন্ত্রটি পাঠ করে বার কয়েক জোর হাততালি দিলেই ভূত পালাবে। তাছাড়া ভূতেদের সায়েস্তা করার রাম নাম মহামন্ত্র তো রয়েছেই।

নীচের মন্ত্রটি পাঠ করলে ভূত অনিষ্ট করতে পারে না।

আমি শ্রদ্ধা করি হাটবাজার ও জনবহুল স্থান
আমি শ্রদ্ধা করি পথ ঘাট গ্রাম শহর
সাপ ও যাবতীয় ইতর প্রাণীকেও আমি শ্রদ্ধা জানাই
মৃতদেহকেও আমি যথেষ্ট সম্মান করি
যে সমস্ত ভূত প্রেত অপদেবতা আছেন তাঁরাও আমার সম্মানীয়
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদেহী আত্মাও আমার শ্রদ্ধেয়
তেত্রিশ কোটী দেবদেবীও আমার পরম পূজনীয়
দেশের কোটী কোটী মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি
তোমাদের সকলকেই অনুরোধ করছি কেউ আমার কাছে এসো না
আমি মহামুনি নরসিংহের শিষ্য
আমি সেই মহামুনির নামে তোমাদের কাছে আসতে নিষেধ করছি

ভূতকে গন্ডীতে বন্দী করতে চাইলে নীচের মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে।

ওহে ভূত ওহে প্রেত ওহে অপদেবতা
আমি তোমাকে এই গন্ডীর লৌহকপাটে বন্দী করলাম
তুমি এবার শ্মশানে মশানে পড়ে শবদাহের আগুনে দগ্ধ হও
এবং মশা মাছি ও পোকামাকড়ের কামড় ও উপদ্রব সহ্য কর
এইখানে তুমি বিছানা পেতে ঘুমোও এখন
আমি বন্ধ দরজাটা আরো শক্ত করে এঁটে দিচ্ছি

দেবগুরু বৃহস্পতিকে নিয়ে দ্রুত রথ নামিয়ে আনছে সারথি
সেই সঙ্গে প্রভু গরুড় পক্ষীও বিশাল ডানা মেলে উড়ে আসছেন
গরুড়ের বাঁ দিকে মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনও তড়িৎ গতিতে আসছেন
এদের ছোঁড়া তীর সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে
এই ব্যাপারটি রাম লক্ষণ সীতা আগেই নির্ধারণ করে রেখেছেন
অতএব আমার আজ্ঞা পালন করো না হলে নরকেও তোমার নিস্তার নেই

কত রকমের যে ভূত আছে সে আর কহতব্য নয়। ভূত, প্রেত, পেত্নী, শাঁকচুন্নী আরো কত কী! অকালে বিশেষতঃ অপঘাতে মারা গেলে ছেলেরা ভূত প্রেত ও মেয়েরা পেত্নী শাঁকচুন্নী হয়। এদের জীবনের যে যে সমস্ত কামনা বাসনা অপূর্ণ থাকে, তারা অশরীরী অবস্থায় সে গুলো পূরণের জন্য ইচ্ছেমত নানা রকম রূপ নেয়। নিমেষের মধ্যেই যেখানে খুশী দূর দূরান্তরে পৌঁছে যায়। মানুষকে ভয় দেখিয়ে ও নানা ভাবে উৎপাত করে ব্যতিব্যস্ত করে। গয়ায় প্রেতশিলায় পিন্ড দিলে এদের অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্তি পায় ও উধাও হয়।

বহুপ্রকার ভূত প্রেতের মধ্যে যারা বিশেষ পরিচিত তাদের সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করছি।

চন্ড— এই ভূতকে মন্ত্রবলে সৃষ্টি করতে হয়। এই আত্মা গুনীণদের বশীভূত থাকে। একান্ত অনুগতের মতো গুণিনের নির্দেশিত কাজ কর্ম করে। কোন ব্রাহ্মণ কিশোরকে শনি, মঙ্গলবার অথবা অমাবশ্যায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সর্বদেহে চন্দন মাখিয়ে প্রথমে তার লিঙ্গ পূজা করতে হয় তারপর দেবীস্থানে হোম যজ্ঞের পর কিশোরটিকে বলি দিয়ে সেই দেহের একটি হাড় গোপন প্রক্রিয়ায় মন্ত্রপূত করে রাখলে সেই হাড়টি চন্ডভূত রূপে আবির্ভূত হয়।

এই হাড় (চন্ডভূত) যার করায়ত্ত সেই গুণিন (ওঝা, রোজা, মায়াবী) প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়।

পিশাচিনী— যে সমস্ত ডাইনী কর্মক্ষম অবস্থায় অর্থাৎ ডাকিনী বিদ্যা ক্রিয়ারত অবস্থায় অপঘাতে মারা যায় তাদের আত্মা পিশাচিনী ভূতিনীতে রূপান্তরিত হয়। পিশাচিনী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। এরা সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করে। এবং ইচ্ছেমত নানারকম রূপ এমন কি মনুষ্যতর প্রাণী যেমন বিড়াল, কুকুর, ছাগল, শিয়াল ইত্যাদির দেহ ধারণ করতে পারে। এদের বিষ নজর খুবই সাংঘাতিক। ছোটদের দিকেই এদের দৃষ্টি বেশি।

কালপুরুষ— সাংঘাতিক ভূত এটা। আইবুড়ো ছেলেরা হঠাৎ মরে গিয়ে বিশেষতঃ ব্যর্থ প্রেমে আত্মহত্যা করলে কালপুরুষ ভূতে পরিণত হয়। এরাও ইচ্ছেমতো নানা রকম রূপ ধরতে সক্ষম।

এদের যৌন ক্ষুধা সাংঘাতিক, কম বয়সী মেয়েদের দিকেই এদের নজর বেশি। ছুঁড়ি ছুকরিদের চারদিকেই এরা ঘোরাফেরা করে ও বাগে পেলেই ঘাড়ে চাপে ও মেয়েদের যৌন পীড়নে ব্যতিব্যস্ত করে। এদের যৌনক্ষুধা উদ্ভট। এরা মেয়েদের যৌনাঙ্গ সমূহ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চুষে, কামড়ে রক্তপাত করে ছাড়ে।

কালপুরুষ ভূতে ধরলে মেয়েদের স্বর, বিকার, দুর্বলতা, ও মাথার গন্ডগোল দেখা দেয়। প্রচন্ড যৌন উত্তেজনায়, কালপুরুষ ভূতে পাওয়া মেয়েরা, উলঙ্গ হয়ে ছটফট করে ছুটে বেড়ায়।

যুগিনী— এ মেয়ে ভূত বা পেত্নি। ভূতিনী হলেও শীতলা দেবীর অনুচরী ও পরিচারিকা। শীতলা দেবী ক্রুদ্ধা হয়ে বসন্ত, হাম ইত্যাদি রোগের মহামারী ঘটালে সেই মহামারী ব্যাপক আকারে চর্তুদিকে ছড়িয়ে দেবার গুরু দায়িত্বটি পালন করে যুগিনী। মড়কে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেলে যুগিনীর খুব স্ফূর্তি। পচা মড়ার মাংস যুগিনীর প্রিয় খাদ্য।

যুগিনীর চোখ দুটো খুব বড় বড় ড্যাবডেবে ও উজ্জ্বল। স্তন যুগল লম্বা ও নাভি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। এ ভূতিনী সর্বদা উলঙ্গিনী থাকে। বিশাল বিশাল মূলোর মত লম্বা লম্বা দাঁত। যুগিনী বিচিত্ররূপিণী আবার ইচ্ছামত রূপগ্রহণে সক্ষম।

মজার ব্যাপার এই, কেউ যুগিনীর আক্রমণে ভূতগ্রস্থ হলে গুণিনরা সেই রোগীর দেহ থেকে যুগিনীকে তাড়াতে স্বয়ং যুগিনীরই কৃপা ভিক্ষা করে। কিছু কিছু আদিবাসী মহলে কালো মুরগি বলি দিয়ে যুগিনীর পূজো করা হয়। বড় ধরণের কোন রোগভোগের পর (বিশেষতঃ সংক্রামক ব্যাধি) যুগিনীর পূজো দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

যক্ষ (যখ্) ও যক্ষিনী— এই ভূত ভূতিনীরা জলের তলায় থাকে। বিশেষতঃ গাঙ, ঝিল, বিল, বিশাল জলাশয়, পুকুর এবং জলা জায়গায় যেখানে প্রচুর গাছপালা থাকে সেখানেই এদের অবস্থান। এদের সম্পর্কে জনমানসে প্রচলিত ধারণা এই রকম— প্রচুর অর্থ উপার্জনকারী কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ পুরুষ ও নারী দেহান্তে আপনা থেকেই যক্ষ বা যক্ষিনীতে রূপান্তরিত হয় এবং তাদের জমানো পুঁজি অর্থাৎ ধনদৌলত আগলে বসে থাকে।

জীবিত কালে এরা এদের সঞ্চিত টাকা, পয়সা, সোনা, দানা, হীরে, জহরৎ ইত্যাদি বড় বড় কলসী বা জালায় কিংবা হাঁড়িতে পুবে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখে অতি গোপনে ও সর্ন্তপণে। এই জাতীয় কৃপণ নারী পুরুষ মরে গিয়ে যক্ষ বা যক্ষিণী রূপে আবার ফিরে এসে তাদের গচ্ছিত ধন দৌলত পাহারা দেয়। এই থেকেই যক্ষের ধন বা যখের ধন প্রবাদটির প্রচলন। গ্রামের মানুষেরা বড় বড় জলাশয়কে খুব ভয় পায়। এদের ধারণা এই জাতীয় জলাশয়ের নীচে যক্ষযক্ষিনীদের বাস এবং কেউ যদি একটু অসাবধান হয় যক্ষ যক্ষিনীরা তাদের ডুবিয়ে মারে।

মুনিশ— এরা প্রেতাত্মা হলেও কারো কোন ক্ষতি করে না বরং এরা যে বাড়িতে থাকে সেই গৃহস্থদের কল্যাণ হয়। এরা বংশ পরম্পরায় বনেদী ভূত।

এই রকম একটা ধারণা আছে কোন বাড়ির কোন সৎ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর সংসারের মায়ার টানে মুনিশ ভূত রূপে ফিরে এসে সেই পরিবারের মঙ্গল করতে সচেষ্ট হয়। এরা পরিবারের বিপদে আপদে সাহায্য করে এবং কোন অশুভ কিছু ঘটার ইঙ্গিত আগে থেকেই স্বপ্নে জানিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দেয়। তবে এরা পুজো পেতে খুব ভালবাসে। পুজো না পেলে রুষ্ট হয়ে স্থানত্যাগ করে। এদের দেহ সুগঠিত। এরা শুদ্ধাচারে থাকে ও পায়ে খড়ম পরে।

কোন কারণে পরিবারটির উপর বীতশ্রদ্ধ হলে মুনিশ গভীর রাতে জোরে খট্ খট্

করে খড়মের শব্দ তুলে চারদিকে দাপিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এই ভাবেই তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে।

মুনিশ অসন্তুষ্ট হলে তাকে তুষ্ট করার জন্য গুণিন ডাকা হয়। গুণিন বাড়ির মাঝ বরাবর (উঠোন হলেই ভালো হয়) অথবা বাগানে একটা ছোট জলচৌকীতে পেতলের ঘটে কিংবা ঘটিতে গঙ্গাজল অথবা মন্ত্রপূত পুকুরের জলে একটি আমগাছের ডাল মুনিশের নাম করে রেখে দেয়। ঘটের চারদিকে সিঁদুর মাখিয়ে দেওয়া হয়। স্থানটিও বিভিন্ন রকম ফুল, বেলপাতা ও তুলসী পাতায় সজ্জিত থাকে।

এবারে একটি কোরা ধুতি, একবাটি দুধ, প্রচুর ফল ও মিষ্টি পেতল, কাঁসা বা মাটির থালায় সাজিয়ে মন্ত্র পড়ে মুনিশের পূজো দিলে মুনিশ সন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় গৃহস্থের মঙ্গল করতে থাকে।

সুপুরুষ— উপনয়ন অনুষ্ঠানের সময় কোন ব্রাহ্মণ কুমারের মৃত্যু হলে সে সুপুরুষ নামে দুষ্ট, অনিষ্টকারী, ক্ষতিকর আত্মায় পরিণত হয়। এদের বহুরকম উৎপাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য যুবতীদের আক্রমণ। যুবতীদের দেহে ভর করার জন্য এরা ওৎ পেতে থাকে। এরা দেখতে সুন্দর সে জন্য সুপুরুষ নাম। যুবতী মেয়েরা এদের রূপে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করে।

ব্রহ্মদৈত্য— কোন ব্রাহ্মণ বালক উপনযনের সময় দন্ডীঘরে হঠাৎ দুর্ঘটনা বা রোগ ভোগে মারা গেলে তার আত্মা ব্রহ্মদৈত্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু আশ্চর্য ব্রহ্মদৈত্যের যত বর্ণনা পাওয়া যায় সে মাঝবয়সী কিংবা প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ।

এঁরা অপদেবতা হলেও অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির; সন্ন্যাসীর মত জীবন এঁদের। পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র, গায়ে গেরুয়া চাদর, গলায় পৈতে। পায়ে খড়ম। এরা বেলগাছে বসবাস পছন্দ করেন।

এঁরা থাকলে সেই পরিবারের লাভ বৈ ক্ষতি হয় না কিন্তু এঁরা অত্যন্ত শুদ্ধাচারী সুতরাং কোন রকম অনাচার দেখলে বা কারো উপর অসন্তুষ্ট হলে নিমেষেই স্থান ত্যাগ করেন।

চিরগুণি— এই প্রেতাত্মা ভূতিনী, প্রেতিনী বা শাঁকচুন্নী অত্যন্ত দুষ্ট, খল প্রকৃতির ও খুব ক্ষতিকর। যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব কালে কোন কারণে মারা যায় সে চিরগুণি ভূতিনীতে পরিণত হয়। এরা সাধারণতঃ শ্মশান ও নির্জন প্রান্তর পছন্দ করে। কিন্তু অত্যন্ত কামুক প্রকৃতির হওয়ায় মানুষের সঙ্গ লাভের আশায় লোকালয়ে চলে আসে। এরা সমকামিতাও ভালবাসে। সুতরাং নারী ও পুরুষ উভয়কেই ব্যতিব্যস্ত করে।

পাঁচু বা পেঁচো— এই ভূত সম্পর্কে আগেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি করলাম না।

মানুষ মরে যেমন ভূত পেত্নী হয় তেমনি কিছু কিছু জন্তু জানোয়ারও দেহান্তে প্রেতযোনি পায়। আবার কোন কোন মানুষ ভূতও জীবজন্তুর রূপ ধরে। যেমন,

মেছুয়া— বেড়াল মরে মেছুয়া বা মেছো ভূতের সৃষ্টি। এরা সাধারণতঃ জলাশয়ের

ধারে কাছে থাকে। মাঝে মধ্যে গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে উৎপাত করে। এদের গায়ে তীব্র আঁশটে গন্ধই এদের উপস্থিতি জানান দেয়।

রাত বিরেতে পুকুর বিলে জাল ফেলতে গিয়ে জেলেরা মাঝে মধ্যে এদের দর্শন পায়। মেছো ভূত খুব একটা অনিষ্টকারী না হলেও কারো বাড়িতে ঢুকলে সে পরিবারের বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পেটের অসুখ হয়। গুনিনের জলপড়া মেছুয়া ভূতে পাওয়ার মহৌষধ।

গোভূত— গরু মারা গেলে গোভূতের উৎপত্তি হয়। বিশেষতঃ গোয়ালঘর ও তার আশেপাশে এরা ঘোরাঘুরি করে। এরা নিরীহ প্রকৃতির। কিন্তু এদের দেখে ভয় পেলে এরা গুঁতিয়ে দেয। ভয় না পেলে কিংবা এদেব বিরক্ত না করলে এরা কারো কোন ক্ষতি করে না।

ঘোড়া ভূত— ঘোড়া মরলে তার আত্মা ঘোড়াভূত হয়। এরাও বড় একটা ক্ষতিকারক নয়। রাত বিরেত বিশেষতঃ পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় এরা আপন মনে দৌড়ে বেড়ায়। অবশ্য মাঝে মধ্যে এরা অদ্ভুত একটা শব্দ করে যা শুনে মানুষ ভয় পেয়ে যায়।

বাগোয়া— বাগোয়া বা বাঘা ভূত বাঘে খাওয়া মানুষের আত্মা। এরা ভয়ঙ্কর ও প্রচন্ড হিংস্র প্রকৃতির। বাঘের রূপ ধরে বাঘের মত গর্জন করে। তাল পেলেই মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘের মতই কামড়ে খায়। বিশেষতঃ সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলেই বাগোয়া ভূতের উপদ্রব।

ভুলো ভূত— খেয়ালী মানুষ অপঘাতে মারা গেলে ভুলো ভূত হয়। এরা তেমন অনিষ্টকর নয়। তবে সুযোগ পেলে মানুষকে ভুল পথে ঘুরিয়ে মজা পায।

এই রকম রকমারি ভূতে বাহার আর ভূত্যবিদ্যায় কতরকম বিচিত্র মন্ত্র এবং অদ্ভুত সমস্ত উপকরণের ব্যবহার কেন করা হয় তা গবেষণার বিষয়।

যে মন্ত্রগুলো বাংলায় রচিত সে গুলো হুবহু লিখেছি। যে সমস্ত মন্ত্র সংস্কৃত ও আঞ্চলিক মিশ্রভাষায় সৃষ্টি ওগুলোর মূল ভাব যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে বাংলায় অনুবাদ করেছি।

জনশ্রুতি আছে ভুতুড়ে তান্ত্রিক নাকি প্রেতসিদ্ধ। অর্থাৎ প্রেত সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর সে কয়েকটি ভূতকে বশীভূত করেছে। সেই ভূতেদের জোরেই ভুতুড়ে তান্ত্রিকের এত রমরমা।

এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতে তান্ত্রিক বলেছিল "ঠিকই শুনেছিস, আমি প্রেতসিদ্ধ। বেশ কয়েকটা ভূত আমার বশে আছে"

প্রেত সাধনা সম্পর্কে তান্ত্রিক আমায় বিস্তারিত জানিয়েছিল, এখানে সংক্ষেপে 'প্রেত সাধনা প্রকরণ' লিখছি।

শনি, মঙ্গলবার অথবা অমাবস্যার রাত্রে (শনিবার অমাবস্যা হলে সেটা শ্রেষ্ঠ যোগ) শ্মশানে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে চিতাভস্মের তিলক কপালে ধারণ করে শ্মশান মূলের তটে যোগাসনে বসে একাগ্র চিত্তে এক হাজার বার জপ করতে হবে এই ভৈরবী মন্ত্র

'স্থৈঁ হ্স ক্লু বী স্থৌঁ'

এই মন্ত্র জপের সময় সাধক নানারকম বিভীষিকা দেখতে পাবেন। তাতেও বিচলিত না হলে ভূতেরা সাধকের গায়ে মড়ার খুলি, হাড় গোড়, ইঁট পাটকেল ইত্যাদি ছুঁড়তে থাকবে সাধককে সাধনচ্যুত করার চেষ্টায়। ভয় পেয়ে জপ বন্ধ করলে ভূত প্রেতবা ঘাড় মটকে সাধককে শেষ করে দেবে।

এইরকম ভীতিপ্রদ ও ভয়াবহ অবস্থায় সাধক যদি নির্ভীক থেকে এক হাজার বার ভৈরবী মন্ত্রটি জপ করতে সক্ষম হন তা হলে ভৈরবী সাধককে দর্শন দেবেন ও চারটি প্রেত দান করবেন। এর পর উনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন। ভৈরবী অদৃশ্য হলে সাধক প্রেতদের আহ্বান করবেন একশো আটবার প্রেত আহ্বান মন্ত্র জপ করে,

জং ঠং সঃ এ ঈল র্জঃ ঠঃ

প্রেত আহ্বান মন্ত্র খুব সাবধানে জপ করতে হয়। মন্ত্রের অক্ষর ভুল উচ্চারণ হলে প্রেতেরা সাধককে হত্যা করবে। সঠিক ভাবে জপ ও আহ্বান করলে সাধক প্রেতসিদ্ধ হবেন এবং ঐ প্রেতেরা সাধকের ভৃত্যের মত অনুগত হবে এবং এদের সহায়তায় প্রেতসিদ্ধ সাধক বহু অসাধ্য সাধন ও অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ করতে পারবেন।

•

চলে আসার দিন ভুতুড়ে তান্ত্রিককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি তো ভূত প্রেতদের নাস্তানাবুদ করছেন। ওরা আপনাব ওপর চটে থাকছে নিশ্চয়ই। তালে পেলে ঘাড় মটকে দেবে না?"

ভুতুড়ে তান্ত্রিক উচ্চৈস্বরে হেসে বলল "ওরে মূর্খ, আমরা মানে ভূতের ওঝারা নিজেদের বাঁচাতে শরীর বন্ধন, আত্মরক্ষা মন্ত্র, রক্ষা কবচ, তাবিচ, মাদুলি, জড়ি, বুটি, পাথর আরো কত উপায় ও উপাদান ধারণ মানে কত কত কাণ্ডই না করি। তবে ভূতপ্রেত নিয়ে কারবার করতে গেলে...." কিছুক্ষণ থেমে তান্ত্রিক আকাশের দিকে হাততুলে বলল "সেই ভূতেশ্বর, ভূতভাবন বাবা ভূতনাথের কৃপা প্রয়োজন। এই যে আমার কপালে যে তিলকটা জ্বল জ্বল করছে এটা কি কি উপাদানে তৈরি বল দেখি?.. অবশ্য তুই বা জানবি কি করে? শোন তবে

বিল্বপত্রং গৃহীত্বা তু কৃষ্ণসর্পবসাসমং
বৃষকেশ গৃহীত্বা তু গন্ধকঞ্চ মনঃ শিলাং
এভিস্তু তিলকং কৃত্বা যথা সাক্ষাৎ সদাশিবঃ

বেলপাতা, কালো সাপের চর্বি, ষাঁড়ের লোম, গন্ধক ও মনঃশিলা এই পাঁচটি উপাদান সমান পরিমাণে খুব ভাল করে মিশিয়ে ও মেখে নিয়ে কপালে তিলক হিসেবে ধারণ করলে শিবের মত মূর্তি ধরা যায়। এই যেমন আমি ধরেছি। এ মূর্তি ধরলে ভূত প্রেত তো কোন ছার স্বয়ং যমও কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবেন না।"

বামদেব

আমার এক বন্ধু আছেন। সুভাষ দে।

উনি কে ও কী যদি এই প্রশ্ন ওঠে তবে এককথায় উত্তর দেওয়া খুব কঠিন।

উনি অ্যাডভোকেট। আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আবার কলকাতার বিখ্যাত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। তা ছাড়াও উনি সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখেন। সুলেখক, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্য নির্দেশক। 'সুরীনা' নামে ওঁর নিজস্ব একটি কৃষ্টি সংগঠন আছে। এক সময় ওঁর 'অশ্লীল' নাটকটি বেশ আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

এ ছাড়াও ওঁর অন্য একটি পরিচয় উনি চিত্রপরিচালক, প্রযোজক ইত্যাদি। ইতিমধ্যে ওঁর ছবি 'মহাপীঠ তারাপীঠ' ও 'পেন্নাম কলকাতা' সফল হয়েছে এবং তৃতীয় ছবি 'রামশ্যাম' প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। এই ছবিতে ওঁর অনুরোধে আমিও একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি।

সুভাষবাবু গভীর অধ্যাত্ম চেতনা সম্পন্ন মানুষ। উনি তারা অর্থাৎ তারিণী দেবীর ভক্ত।

সুভাষবাবুর সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নানা জায়গায়। আমাদের পি,জি, হাসপাতালে, টালিগঞ্জের ফিল্ম ষ্টুডিওতে, আমার বালির বাড়িতে, ওঁর চেতলার বাসায়, গল্ফ ক্লাব রোডের ফিল্ম সার্ভিসে। ওঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

একদিন উনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ওঁর প্রথম ছবি 'মহাপীঠ তারাপীঠ' তৈরির ইতিবৃত্ত।

সুভাষবাবুর ভাষায়ঃ

মহাপীঠ তারাপীঠ ছবিটি তৈরীর পিছনে একটা সত্যিকারের ঘটনা আছে। আমি একবার প্রখ্যাত অভিনেতা পরিচালক সুখেন দাসের সঙ্গে ভাসায় অমর রির্সোট বলে যে জায়গাটা আছে সেখানে একটা গল্প লিখতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যের পর সবাই মিলে নৌকাতে চড়ে ঘুরছিলাম, সেইসময় অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখি। প্রায় দুটো তালগাছ সমান এক মহিলা যেন পুকুর পাড় দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। সেই দৃশ্য দেখার পরই আমাদের নৌকোটা উল্টে যায়। আমরা জলে পড়ে যাই। আমি একদম সাঁতার জানি না। ক্রমশঃ জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি। মৃত্যু অনিবার্য। মাকে শুধু একবার স্মরণ করলাম, মা, আমি এইভাবে মরতে চাই না। তারা মা তুমি আমায় বাঁচাও। তারপর তারা মার কৃপায় আমি অলৌকিক ভাবে বেঁচে যাই। এই ঘটনায় আমি উপলব্ধি করলাম সমস্ত কিছুর উর্ধে এক মহাশক্তি আছেন। যাঁর কৃপা পেলে যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। মনস্কামনা

সিদ্ধ হয়। অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। আমার কাছে সেই শক্তিই হল তারা মা। অলৌকিক ভাবে পুনর্জীবন পেয়ে (সুভাষ বাবুর ধারণা ওর তারা মার কৃপায়) অভিভূত সুভাষ দে তারা মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই 'মহাপীঠ তারাপীঠ' ছবি করেছিলেন।

সুভাষ বাবুর কাহিনী শুনতে শুনতে মন চলে গিয়েছিলো সুদূর অতীতের এক অধ্যায়ে। তখন আমি তন্ত্রসাধনা করতাম।

তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দক্ষিণাকালীর ভয়াল ভয়ঙ্কর স্নিগ্ধ সুন্দর মূর্তি। পঞ্চমুন্ডীর আসন। ষোড়োশোপচারে কারণ সহ পূজা। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিলো না।

কিছু সাধুসঙ্গ, কিছু অধ্যয়ন, কিছু অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিলব্ধ চেতনায় তারিণী দেবীর যে ইমেজটি এতকাল অচেতন মনের গভীরতম স্তরে প্রায় বিস্মৃতির আস্তরণে আচ্ছাদিত ছিল সে যেন চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল।

সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হলাহল পান করে দেবাদিদেব মহাদেব যখন যন্ত্রণায় কাতর ও আকুল হয়ে তাঁরই হ্লাদিনী শক্তি দুর্গতিনাশিনীর শরণাপন্ন তখন দেবী দুর্গা মাতৃরূপে শিব-কে স্তন দান করে বিষমুক্ত করেছিলেন। সেই তাঁর তাবা রূপ। ভাবতে ভাবতে বেশ একটা 'ভাব' এসে গেল। আমিও সুভাষ বাবুকে তারাতত্ত্ব সর্ম্পকে অনেক কিছু বললাম। সুভাষবাবু মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন আমার।

কিন্তু ঐ বিষয়ে আমার জ্ঞানগম্যি কতটুকু! যাঁর মুখনিঃসৃত তারামৃত বাণী শ্রেফ তোতাপাখির মত আউড়ে গিয়েছিলাম, প্রকৃত প্রশংসা যাঁর প্রাপ্য, তাঁর কথা বেমালুম চেপে গিয়ে সুভাষ বাবুর প্রশংসা আত্মসাৎ করেছিলাম। তাঁর কাহিনীই এখানে লিখছি।

আমার জীবনে সেটা আশ্চর্য রহস্যময় ঘটনা।

সাম্প্রতিক কালের মধ্যে সেই যে বছর খুব বন্যা হয়েছিল, সালটা বোধহয় উনিশশো আটাত্তর।

পারিবারিক কিছু কারণে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিলাম।

না, মোল্লাব দৌড় হিমালয় বা অন্য কোন সুদূর স্থান নয়। কলকাতারই কাছাকাছি খড়দা থানার রহড়ার কল্যাণনগর নামের একটা জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে ছিলাম কিছুকাল।

ছোট একটা পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি। 'ভূতের বাড়ি' বলে সেটার খুব বদনাম। সে বাড়িতে এক রাত্তিরের বেশি কেউ নাকি থাকতে পারে না। বাড়ির মালিকও পারেন নি, অন্যত্র বাসা করে চলে গেছেন।

আমি থাকব শুনে উনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন "ভাড়া টাড়া দিতে হবে না। বাড়িটা তো পড়েই রয়েছে, কোনদিন না বেদখল হয়ে যায়, তা ছাড়া আপনি সাধক মানুষ, আপনি এখানে থাকলে ভূতের বাড়ি দুর্নামটাও ঘুচবে। তারপর যখন চলে যাবেন বাড়ি আর খালি পড়ে থাকবে না। ভাড়াটেও পেয়ে যাব।"

পরিবেশ রীতিমত রোমাঞ্চকর সন্দেহ নেই।

কলকাতার এত কাছে এইরকম একটা সাধনোপযোগী ক্ষেত্র আছে, এখানে না থাকলে কোনদিনই জানতে পারতাম না।

সামনে কাঁচা মাটির রাস্তা, পাশেই মস্ত একটা 'এগ্রিকালচালার এষ্টেট' নামেই, আসলে বিশাল জঙ্গল। স্থানীয় লোকেরা যাকে দস্তিদারের বাগান বলে। হরেক রকম পাখি আর জন্তু জানোয়ারের অভয়ারণ্য। সাপ বেজি শেয়াল কুকুরদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

দিনের বেলাতেও কেউ একটা এদিক বড় মাড়ায় না। সন্ধে হতে না হতেই গা ছমছমে ভয় জাগানো পরিস্থিতি। সেখানেই থাকতাম একা।

খুব সকালে হাসপাতালের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তাম। ফিরতে ফিরতে বিকেল। অন্ধকার ঘন হতেই ডুবে যেতাম জপ-ধ্যানে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। কেউ বিরক্ত করার নেই। নিটোল মসৃণ অবসর।

সে সন্ধ্যায়ও যথারীতি ধ্যানে বসেছি।

একটানা ঝিঁ ঝিঁর ডাক আর মাঝে মধ্যে শিবাকুলের উল্লাস ছাড়া নিস্তব্ধ পরিবেশ।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ যেন দমকা ঝড়ে দরজাটা খুলে গেল। চমকে তাকিয়ে দেখি এক অপরিচিত মানুষ। মাঝবয়সী। ছোটোখাটো সিঁটকে মার্কা চেহারা। পরণে শতচ্ছিন্ন ময়লা ধুতি, ফতুয়া। একমুখ সাদা কালো গোঁফ। মাথার চুলগুলোর সঙ্গে বহুদিন তেল জলের কোন সম্পর্ক নেই। মাঝে মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে।

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই লোকটা বাজখাঁই গলায় খেঁকিয়ে উঠল।

"এই ব্যাটা, তুই তো শুনেছি ডাক্তার, এখানে বনবাদাড়ে বসে কি ভণ্ডামি করছিস ?"

একেবারে তুই তোকারি দিয়ে সুরু। আমার সম্পর্কে কিছুটা খোঁজখবর রাখে দেখছি। একে কোথাও দেখেছি বলে তো মনে হয় না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম "কে আপনি ?" আমার ঘরের দেওয়াল জুড়ে অসংখ্য দেবদেবীর ছবি। তার মধ্যে ঠিক সেদিনই এক ওষুধ কোম্পানি বেশ বড একটা তারা মূর্তির ছবির ক্যালেন্ডার দিয়েছে। সেটা সামনেই ঝুলিয়েছি, সদ্য। রহস্যময় ব্যক্তিটি তারার ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বীভৎস হাসিতে ফেটে পড়ল "আমায় চিনতে পারছিস না ? আমি বামদেব।"

"বামদেব মানে ?" আমার বিস্ময় বেড়ে চলেছে ক্রমশ।

"বামদেব মানে বামাক্ষ্যাপা, তারাপীঠ ভৈরব। গো মুখ্খু এইটুকু বোঝার ক্ষমতাও নেই উনি আবার চোখবুজে ধ্যান করতে বসেছেন।" কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ "তারা তারা বামদেব" বলে বিকট হুংকার ছাড়ল। বাপ্‌রে বাপ্, এইটুকু যন্ত্র থেকে এত শব্দ হয়! নির্ঘাৎ পাগল। লোকটা আমার পাশে এসে গা ঘেঁষে বসলো। বেজায় ঘাবড়ে খানিকটা দূরে সরে গেলাম। বুক ধুকপুক করছে আমার। যদি আঁচড়ে কামড়ে দেয়! আমাকে ঘাবড়াতে দেখে একটা ধমক দিল সে "আ মোলো, অত ভয় পাচ্ছিস কেন? হ্যাঁ যা জিজ্ঞেস করেছিলাম তার জবাব তো এখনও দিলি না। এখানে কি মতলবে এসেছিস ?"

কাঁপতে কাঁপতে বললাম "যোগসাধনা করছি।"

শুনেই অট্টহাসি "যোগসাধনা! অত সস্তা ব্যাপার? বল দেখি এক আর এক যোগ করলে কত হয়?"

এ যেন পন্ডিত মশাই অঙ্ক শেখাচ্ছেন। চুপ করে থাকলেও মুশকিল। আপদটা বিদেয় হলেই বাঁচি। বললাম "এক আর এক যোগ করলে দুই হয়।"

এবার ওর কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর "দূর বোকা, সে তো সাধারণ লোকের হিসেব। সাধনমার্গে যোগের নিয়মটা অন্য রকম। সেখানে এক আর এক যোগ করলে ঐ একই হয়। আর যদি ঐ একত্বের যোগ সাধনায় পারব্রহ্মে লয় হয়ে যেতে পারিস তা হলে বিশ্বব্রহ্মান্ড শূন্য হয়ে যাবে।"

আবার আমার গায়ে ঘেঁষে এল সে। আতঙ্কে হার্টফেল করার মত অবস্থা আমার। দৌড়ে পালাব কিনা ভাবছি....

ইতিমধ্যে সে স্থির হয়ে পদ্মাসনে বসে 'আকাশ সংহিতা' থেকে আবৃত্তি সুরু করেছে,

শূন্যে ব্রহ্মান্ড গোলেতু পঞ্চশৎ শূন্য মধ্যমে
পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্বান্তে কালিকা স্থিতা
আকাশস্তু মহাকাশং পরাকাশং পরাৎ পরং
তত্ত্বাকাশং সূর্যাকাশং আকাশং পঞ্চলক্ষণং

উদাত্ত কণ্ঠ ভক্তিরসে আপ্লুত। বিশুদ্ধ পরিষ্কার দেবভাষা উচ্চারণ। যাকে একটু আগে পাগল ঠাউরেছিলাম, এই মুহূর্তে তাঁকেই মনে হচ্ছে স্বয়ং বামদেব। মহাসাধক বামাক্ষ্যাপা। কৃপা করে ছদ্মবেশে এসেছেন আমার তৃষিত চিত্তে জ্ঞানবারি সিঞ্চন করতে।

সেই দুর্লভ সন্ধ্যায় উনি দীর্ঘসময় সাধন রহস্য ও তারাতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক মণিমাণিক্য উপহার দিয়েছিলেন আমায়, তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করছি যথাসম্ভব ওঁর ভাষা অবিকৃত রেখে।

শূন্য পূর্ণ পুরুষ প্রকৃতি— এই হচ্ছে আমাদের সাধনা মার্গের বিশেষতঃ তন্ত্র সাধনার মূল রহস্য।

সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহু হয়ে নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই শূন্য আবার তিনিই পূর্ণ। আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মের ভিত্তি প্রথম উপনিষদের (ঈশ উপনিষদ) শুরুতেই শান্তিপাঠের মধ্যেই রয়েছে এর ইঙ্গিত।

ওঁ পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্নাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে

এ জগৎ পারব্রহ্মে পরিপূর্ণ। আর সেই পূর্ণস্বভাব ব্রহ্ম থেকে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও সেই পূর্ণ মানে পারব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

সহজ কথায় এই বোঝায় ব্রহ্ম জগতাতীত এবং জগৎব্যাপী। জন্ম কিংবা সৃষ্টি অথবা লয় কিংবা ধ্বংস কোন কিছুই ব্রহ্মের একত্ব বা পূর্ণত্বের পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম বিকার রহিত।

সেই ব্রহ্ম পঞ্চআকাশে পরিব্যাপ্ত। আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ এবং তত্ত্বাকাশ এবং

তারও ঊর্ধে সূর্যাকাশে বিরাজ করছেন তারিণী দেবী।

চিন্ময়ী শ্রুতি রূপা যা
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মিকা
অরূপা সর্বরূপা সা
সারদে মে প্রসিদতম

এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মিকা ব্রহ্মার চিৎশক্তিরূপিণী। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধিআত্মিক (আধ্যাত্মিক) এই ত্রিতাপ নাশিনী, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ সম্ভূতা, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কারিণী ত্রিগুণাত্মিকা গুণময়ী প্রকৃতি তথা ত্রিগুণাতীতা পরাকাষ্ঠা স্বরূপিনী, অরূপা, স্বরূপা সর্বরূপা ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী, জগজ্জননী, তিনিই তারা অর্থাৎ তারিণী দেবী।

পরম পুরুষ বিশুদ্ধ জ্ঞান আর দ্বৈত ভাবে ভাবলে ভক্তি অথবা শক্তিই হলেন পরা প্রকৃতি।

অনন্ত কোটী ব্রহ্মান্ড এক মহাশক্তির নিয়মাধীন। বিজ্ঞানের বিচারে তা জড়, দূরতিক্রম্য, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বার প্রাকৃতিক শক্তি। কিন্তু সাধকের উপলব্ধিতে তিনি চৈতন্যময়ী পরমা প্রকৃতি, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে পরম ক্রিয়াশীলা ঐশী শক্তি।

ব্রহ্ম অর্থাৎ ভূমা, এত বিশাল যে তার পরিমাপ সম্ভব নয়। তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই, প্রাকৃত কোন মূর্তিই নেই। তিনি অব্যক্ত অথচ চেতন অচেতন সর্বভূতেই তাঁর মহিমামন্ডিত আত্মপ্রকাশ।

সাধকের কল্পনার রঙে মূর্ত প্রতীক উপাসনা বা আইডিয়ালাট্রি, রূপ সাগরে ডুব দিয়ে এবং সেই রূপকেও অতিক্রম করে অরূপ রতন লাভের এক অপরূপ প্রয়াস।

কুলার্নব তন্ত্রে যে রূপ সাধনার ইঙ্গিত রয়েছে

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিস্কলস্যাশরিরীণঃ
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা

তারই সার্থক প্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায় মহানির্বাণ তন্ত্রে।

ত্বং পরা প্রকৃতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ পরমাত্মণ
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্বং জগজ্জননী শিবে

সেই নির্গুণ ব্রহ্মাই গুণময়ী প্রকৃতিতে রূপান্তরিত। পরাশক্তির যে অব্যক্ত অচিন্তনীয় অবস্থা বা অপরাশক্তি যেটা সাধারণের বোধগম্য নয় সেই অপরা শক্তিই সাধকের কাছে পূর্ণব্রহ্ম, সনাতনী ও চৈতন্য-স্বরূপিনী। মহাশক্তিকে জগজ্জননী জ্ঞানে সাধনাই তন্ত্রের মাধুর্য। বিশুদ্ধ জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম এবং দ্বৈত ভাবে প্রকাশিত তাঁর শক্তিই পরা প্রকৃতি। এই পুরুষ প্রকৃতি তথা শিবশক্তি বিশ্বসৃষ্টির মূল রহস্য।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ যখন সাম্যাবস্থায় ছিলো তখন কোন বিভেদ বা উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম 'তদৈক্ষত অহম বহুশ্যাম' অর্থাৎ বহু হয়ে লীলার বাসনা প্রকাশ করলেন তখন ঐ সাম্যাবস্থা পুরুষ ও প্রকৃতিতে দ্বিধাবিভক্ত হল।

একই বস্তু হতে উৎপন্ন, মিলনেচ্ছা অতীব তীব্র, কিন্তু সরাসরি মিলনের পথে নানারকম বাধা উপস্থিত হয়ে প্রকৃতিকে পুরুষের বিপরীতে স্থাপন করল।

সেই 'বিপরীত রতাতুরা' মায়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারী। এবং সমুদ্র মন্থনে উত্থিত বিষপানে ক্লিষ্ট মহাদেবকে আপন বক্ষসুধা দানে নবজীবন দায়িনী শিবা তথা শিবের সাক্ষাৎ আত্মশক্তি, এক্ষেত্রে মাতৃরূপিণী এবং প্রকৃতি স্বরূপা স্বয়ং দেবাদিবের ঊর্ধা অংশ উদ্ভূতা অর্ধনারীশ্বরী।

সহজ কথায় বলা যায় তন্ত্রমতে শিব স্বয়ং প্রকৃতি রূপ অর্থাৎ শিবা রূপ ধারণ করেছিলেন তাই তাঁর নিম্ন অংশ পুরুষ ও ঊর্ধা অংশ নারী (প্রকৃতি)। সেই অর্ধনারীশ্বরী মূর্তিই তারিণী দেবী।

বেদান্তের বিচারে তারাতত্ত্ব অতীব গুহ্য, রহস্যাবৃত এবং গরিমাময়ী শ্রেষ্ঠ শিব-শিবা রূপকল্পনা।

তারা পূজার প্রচলন করেন অক্ষোভ্য ঋষি। তিনি ছিলেন উত্তর মেরুর বাসিন্দা। ক্রমশঃ সিদ্ধনাগার্জুন ভারতবর্ষ ও চীনে তারা মূর্তির প্রচলন ও পূজার ব্যবস্থা করেন। তারা দেবীর শিরে সর্পরূপে অক্ষোভ্য ঠাঁই পেয়েছেন।

অক্ষোভ্য মানে যার কোন ক্ষোভ নেই অর্থাৎ আনন্দময় পুরুষ। বৈদান্তিকগণের ধারণা তিনিই ঋষি বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ অর্থে যিনি ইষ্টকে বশ করতে পেরেছেন। এই বশিষ্ঠই শ্রীরামচন্দ্রের গুরু। আবার নীলতন্ত্রমতে শ্রীরাম ও তারা অভিন্ন। কেউ কেউ আবার মনে করেন তারা সাধক বামাক্ষ্যাপা বশিষ্ঠদেবেরই পরিবর্তিত শরীর।

মাণ্ডুক শ্রুতি মতে "প্রপঞ্চ পশমং শান্তম শিবম দ্বৈতম্ চতুর্থং" প্রলয় কালে সমস্তই শূন্য অর্থাৎ সব কিছুই লয় প্রাপ্ত হয়। শিব অর্থে দ্বৈত এবং অদ্বৈত অর্থাৎ সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম। শিবই তারা মূর্তি ধারণ করেছেন। শিব হচ্ছেন প্রলয় বা মোক্ষ অবস্থা।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিন ভাবের মধ্যে ব্রহ্মা স্থূলরূপে জাগ্রদাবস্থা। বিষ্ণু সূক্ষ্ম রূপে স্বপ্নাবস্থা ও শিব কারণরূপে সুষুপ্ত অবস্থা। ব্রহ্মউপনিষদের একটি শ্লোকে এর সমর্থন পাওয়া যায় "জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তে রুদ্র এবং তুরীয়ে পরমাক্ষরম্"।

জাগ্রত অবস্থায় সৃষ্টি, স্বপ্নাবস্থায় ও তুরীয়তে তার লয়। এই সুষুপ্তি অবস্থা থেকেই এটা বোঝা যায় যে ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু শিব হতেই উৎপন্ন ও শিবেই লয় প্রাপ্ত হয়।

সেই শিবের আত্মশক্তিই হলেন প্রকৃতিরূপিনী মহামায়া। তাঁরই পদতলে পরম নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মচৈতন্য দেবাদিদেব শিব শবরূপে শায়িত অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্যসত্তা। সেই চৈতন্য যখন সৃষ্টির ইচ্ছায় ক্রিয়াশীল হলেন তখনই ধারণ করলেন তারিণী মূর্তি। এই তারিণী বা তারা পরমাপ্রকৃতি যুগপৎ রৌদ্রা ও সৌম্যা এবং ভয়ঙ্করী ও সুন্দরী। শ্রীশ্রী চণ্ডী যাঁকে

সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌমেভ্যস্তুতি সুন্দরী
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী

আখ্যা দিয়েছেন।

দেবী ভাগবতম্ মতে

"সমুদয় বেদস্বরূপ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিয়া সেই পরমাশক্তির চরণামৃতরূপে অমূল্য

রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। সেই পরমেশ্বরী ভিন্ন অন্য কেহই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিবরূপ পঞ্চব্রহ্মময় আসনে আরূঢ় হইতে পারেন না। সেই মহাদেবী মূঢ় ব্যক্তিগণকে স্বীয় শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার নিমিত্তই উক্ত পঞ্চব্রহ্ম, ক্ষিত্যাদি যে মঞ্চমহাভূতের অধিপতি, সেই পঞ্চভূতগণ যাহা হইতে উৎপন্ন সেই বস্তুই বেদে ব্যক্ত ও অব্যাকৃতাদি নামে কথিত হইয়াছে এবং সমুদায় জগৎই ওতপ্রোতভাবে যাহাতে অবস্থিত তাঁহাকে সেই বস্তুই বুঝিবে।"

সর্বস্বরূপে, সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে সেই শিবের আত্মশক্তি, তিনিই শিবা, তিনিই তারা, তিনিই দুর্গা।

ঠিক জ্ঞানলুপ্তি নয়। চেতনার পরিবর্তিত অবস্থায় বেশ খানিকটা আছন্নের মত ছিলাম। ওঁর কথাগুলি কানের ভেতর দিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে জ্ঞান-ভক্তি আপ্লুত এক মিশ্র অধ্যাত্ম রসের করছিল। একটানা অনেকক্ষণ উনি তারাতত্ত্ব ও সাধনমার্গের অমৃতবাণী শুনিয়েছিলেন।

যখন সম্বিৎ ফিরল চোখ মেলে দেখলাম দিব্য সুরভিতে ঘর আমোদিত। 'বামদেব' কখন অন্তর্ধান করেছেন জানি না। যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিতেও ভোলেন নি।

তুরীয় ধ্যান

"এর জন্যে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার প্রয়োজন নেই কিংবা কোন কঠোর সাধনার দরকারও নেই। প্রত্যেক দিন সময় করে কিছুক্ষণ তুরীয় ধ্যান অভ্যাস করলে মনের শক্তি বাড়ে, দেহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ধ্যান বিজ্ঞান সম্মত" বললেন স্বামী তুরীয়ানন্দ।

তুরীয় ধ্যান শিক্ষা দেন বলে ওঁর নাম তুরীয়ানন্দ হয়েছে কিনা জানিনা, তবে উনি ঐ নামেই পরিচিত। ওঁর 'আশ্রম' কোনো নির্জন বনাঞ্চলে নয়। এই শহরের উপকণ্ঠেই একটা ছোট আধুনিক ফ্ল্যাট। মোটামুটি বড় একটা ঘরে অনেকগুলো কম্বলের আসন পাতা। ঘরটি আসবাবশূন্য। দেওয়াল জুড়ে কয়েকজন যোগীর প্রতিকৃতি। সুগন্ধি ধূপে ঘরটি আমোদিত। হাল্কা নীলাভ সবুজ বিদ্যুৎ বাতির কারসাজিতে শান্ত স্নিগ্ধ আলো- আঁধারির এক স্বপ্নময় পরিবেশ।

তুরীয় ধ্যান সম্পর্কে ওঁর কাছে জানতে গিয়েছিলাম। সুপুরুষ প্রৌঢ় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানে পি, এইচ, ডি। একটি বেসরকারী সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কার্যসূত্রেই একদিন আচার্য মহেশ যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারপর মহেশ যোগীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তুরীয় ধ্যান শিক্ষা করে খুব ভাল ফল পেয়েছেন। এখন কর্ম থেকে অবসর নিয়ে অন্যদের বিশেষ করে যুবক যুবতীদের তুরীয় ধ্যান শিক্ষা দেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ নামটি বোধহয় ওঁর ছাত্রছাত্রীরাই দিয়েছে। "মহেশ যোগীর একটা কথা আমার খুব মনে ধরেছিলো, ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই তুরীয় ধ্যান তো নতুন কিছু নয়। ভারতীয় রাজযোগ সাধনার কিছু পরিবর্তিত রূপ, সাধন ক্ষেত্রে এই ধ্যানের বিশেষ অবদান কি? উনি উত্তর দিয়েছিলেন---দেখো দিল্লী থেকে বোম্বাই সাইকেলেও যাওয়া যায়, মটরগাড়িতেও যাওয়া যায় আবার এরোপ্লেনেও যাওয়া যায়। আমি তোমাদের জন্য দ্রুততম আধুনিক জেট প্লেন নিয়ে এসেছি।" স্বামী তুরীয়ানন্দ দীর্ঘসময় তুরীয় ধ্যান সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছিলেন। সংক্ষেপে কিছু এখানে লিখছি।

তুরীয় ধ্যান বা 'ট্রান্সসেনডেন্টাল মেডিটেসন' সংক্ষেপে টি, এম, আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে সমাদৃত হয়েছে। এর জনপ্রিয়তার মূলে আচার্য মহেশ যোগীর অবদান অনস্বীকার্য।

এই 'তুরীয় ধ্যান' বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার ভিন্ন কিছুই নয়। বিশৃংখল, বিক্ষিপ্ত, বিকারগ্রস্ত মন ও স্নায়ুমণ্ডলীকে ওষুধের পরিবর্তে যৌগিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণে এনে শান্ত করার একটি বিকল্প উপায়।

বৈদিক যুগের মুনিঋষিদের অধ্যাত্ম চেতনার অভিজ্ঞতায় আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক (আধিআত্মিক), এই ত্রিবিধ বিঘ্ন দূর করে, দেহ ও মনকে নিরোগ রেখে আত্মিক উন্নতি তথা মুক্তি ও মোক্ষ সাধনার প্রচেষ্টা অর্থাৎ 'দেহ মন আত্মা' মানুষের এই ত্রিঅবয়বকে সমান ভাবে প্রাধান্য দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যোগ সাধনার সূত্রপাত হয় অথর্ববেদে,

স্থিরৈবঙ্গৈ স্তুষ্টুবাং সস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতম যদায়ুঃ
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

অর্থাৎ স্থির দৃঢ় শরীর এবং মনের দ্বারা তোমাদের সন্তুষ্ট রেখে দেবগণের বিহিত আয়ু যেন প্রাপ্ত হই। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঋষি পতঞ্জল খৃষ্টপূর্ব চারের শতকে যোগীদের কল্যাণার্থে কিছু যোগসূত্র উদ্ভাবন করেন যা 'পাতঞ্জল যোগ' নামে খ্যাত।

তুরীয় ধ্যান মূলতঃ পাতঞ্জল যোগসূত্র নির্ভর।

এই ধ্যান কিছু কিছু স্নায়ু ও মনোরোগ বিশেষতঃ মনজ স্নায়ুরোগ বা বায়ুরোগ (নিউরোসিস), মানসিক ও স্নায়বিক বিকার ইত্যাদিতে বিশেষ ফলপ্রদ তো বটেই তা ছাড়াও এটি সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য দেহ ও মনের পক্ষে একটি অত্যন্ত হিতকর অভ্যাস। এটি বিজ্ঞানসম্মত চমৎকার যৌগিক প্রক্রিয়া। এই ধ্যান নিয়মিত অভ্যাসে স্নায়ুসমূহের ক্রিয়া দীর্ঘকাল অটুট থাকে ও মনোবল বৃদ্ধি পায়।

আগেই বলেছি তুরীয় ধ্যান পাতঞ্জল যোগসূত্র নির্ভর, উক্ত যোগসূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ "আমাদের সবিশেষ ভাবের পশ্চাতে অবস্থিত একটি নির্বিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ।"

সেই নির্বিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশে সবিশেষ ভাবের আবেগজাত আলোড়ন আমাদের মনন অর্থাৎ চিত্তে নানাবিধ বৃত্তি জাগরণের প্রধান কারণ।

পাতঞ্জল যোগসূত্রের মূলমন্ত্র "যোগচিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" অর্থাৎ চিত্তকে নানারকম প্রক্ষোভজনিত (ইমোসনাল) বৃত্তি থেকেই নিবৃত্ত রাখার নামই যোগ। যদিও বৃত্তিসমূহ মনজ, মন কিন্তু চৈতন্যময় নয়, চৈতন্যময় আত্মা মনের নিয়ন্ত্রক বলেই মনকে চৈতন্যময় বলে ভুল হয়। কিন্তু মন যেহেতু বহির্জগতের উদ্দীপনাময় প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলক এবং আচরণ নিয়ামক সুতরাং মনঃসংযমই প্রধান লক্ষ্য।

ঋষি পতঞ্জলের মতে "অভ্যাসবৈরাগ্যানাং তন্নিরোধঃ"। মন সদা চঞ্চল, বহির্মুখী, অতীব শক্তিশালী, দৃঢ় ও অনমনীয়। একমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশে আনা সম্ভব।

এ যেন গীতায় শ্রীভগবান কতৃক অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলীর প্রতিধ্বনি।

অসংসয়ো মহাবাহো মন দুর্নিগ্রহম চলম
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে

—অভ্যাস যোগ

অভ্যাস ও বৈরাগ্য আয়ত্তে আনতে পতঞ্জল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের বিধান দিয়েছিলেন যা দেহ ও মন উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের আত্মিক উন্নতিতে সক্ষম।

তুরীয় ধ্যান কিছুটা এই পদ্ধতির অনুসরক। তুরীয় ধ্যান পরিবর্তিত শারিরীক ও মানসিক অবস্থায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়কে কিছুটা নিষ্ক্রিয় রেখে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন

করে পুনঃসংযোজন ও সংবেদনহীন অবস্থায় প্রশান্তি এনে আচরণের স্থিরতা, অন্তঃদৃষ্টি উন্মেষ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে সহায়ক।

তুরীয় ধ্যান নিস্তরঙ্গ মনের নির্বাক সাবলীল প্রবহমান এবং চৈতন্যময় অবস্থা বিশেষ, সেখানে মন সাময়িক ভাবে দেহাত্মবোধহীন অখণ্ড আত্মার সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং বিকার রহিত। এই বৃত্তিমুক্ত চিত্ত আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মদর্শনের দর্পণ স্বরূপ।

তুরীয় ধ্যানের প্রক্রিয়া মোটামুটি এইরকম।

কোন সুবিধাজনক আসনে সহজভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে যথাসম্ভব দেহকে শিথিল রেখে 'ত্রাটক' ক্রিয়ায় ভ্রুযুগলের মাঝখানে কোন উজ্জ্বল বস্তু বা অকম্পিত প্রদীপ শিখার দিকে দৃষ্টি স্থির ভাবে নিবদ্ধ রেখে অথবা চোখ বুজে মনকে মুক্ত বিহঙ্গের মত চিদাকাশে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়ে ক্রমশঃ বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে হবে।

বিশ্ববিখ্যাত মনবিজ্ঞানী সিগমণ্ড ফ্রয়েডের মুক্ত অনুসঙ্গ বা ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন পদ্ধতিটি মনে হয় উক্ত প্রক্রিয়ারই অনুসরক।

যাই হোক এবার শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে এনে, এই শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিটিকে বলা হয় 'প্রাণায়াম'। মন সদাচঞ্চল ও বহির্মুখী। তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা প্রায় দুঃসাধ্য। এই প্রাণায়ামের সাহায্যে মনকে কিছুটা বশে আনা সম্ভব। প্রাণায়াম পদ্ধতি হঠযোগ ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাজযোগ, হঠযোগের এই একটি মাত্র পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হবার পর কোন মন্ত্র বা ছন্দবদ্ধ শ্লোক (যেমন গায়ত্রী মন্ত্র) নিঃশ্বাসের তালে তালে জপ করতে হবে। যাকে 'অজপা' জপ বলা হয়।

এবার যে কোন প্রতীকে মন স্থির রেখে তার ধ্যান করতে হবে। এই প্রতীক যার যা প্রাণ চায় বা ভালো লাগে সেইরকম কিংবা গুরু নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তুরীয় ধ্যান অভ্যাসে শরীর বিশেষতঃ মস্তিষ্ক বিশ্রাম পায়। মন শান্ত হয়। বহির্জগতের বিক্ষেপন স্তিমিত হয়ে মন অন্তর্লোকে এক অনির্বচনীয় আনন্দময় জগতে বিরাজ করে।

তুরীয় ধ্যান দেহ ও মন উভয়ের পক্ষেই হিতকর। ড্রাগ, সিগারেট ও বিভিন্ন ধরনের নেশা এবং বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিতে ওষুধের সঙ্গে তুরীয় ধ্যানে কিংবা কেবলমাত্র তুরীয় ধ্যানেই নিরাময় সম্ভব।

পরিশেষে সাংখ্য প্রবচনের একটি সূত্রের উল্লেখ মনে হয় এক্ষেত্রে খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যোগসিদ্ধয়োহপ্যৌষধাসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়া

অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগে রোগ সারে সুতরাং ঔষধের শক্তি অস্বীকার করা যায় না। ঠিক তেমনই যোগজ সিদ্ধিও ঔষধ আরোগ্যের মতই ফলপ্রদ ও অনস্বীকার্য।

যাদুদণ্ড

'মিরাকুল্যাস কিওর', 'ফেথ হিলিং' অর্থাৎ অলৌকিক উপায়ে আরোগ্য, বিশ্বাসে ব্যাধি মুক্তি, মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, ঝাড়ফুঁকে নানারকম দুরারোগ্য অসুখ বিসুখ নাকি সেরে যায় এরকম তো ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। বিভিন্ন বইতে এ ধরনের ঘটনার কথা অনেক পড়েছি। তবে ওগুলো কতখানি বিশ্বাসযোগ্য বলতে পারি না।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐ রকম অদ্ভুত উপায়ে রোগ সেরেছে সে ধরনের দু চারটে রোগী যে দেখিনি এমন নয়। তবে বিশ্বাসে যে কাজ হয় সেটা আমার দীর্ঘ ডাক্তারি প্র্যাকটিস জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতায় প্রমাণ পেয়েছি।

সমস্ত কিছু একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়াও তো ঠিক নয়।

এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের একটা কথা বার বার মনে পড়ে। 'সন্দেশ' পত্রিকার সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যায় লিখেওছি তা।

ঐ পত্রিকায় লেখার সূত্রে সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিলো। প্রথমে ৩নং লেক টেম্পল রোড ও পরে ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে তন্ত্রমন্ত্র, যোগসাধনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, প্যারাসাইকোলজি মানে পরামনবিদ্যা, অলৌকিক উপায়ে রোগ আরোগ্য, বিশ্বাসে ব্যাধি মুক্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহুদিন দীর্ঘসময় ওঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

সত্যজিৎ বাবুর মস্ত একটা গুণ ছিলো। এই সমস্ত হেঁয়ালি জাতীয় কুয়াশাচ্ছন্ন বিষয়গুলোকেও উনি কখনও ছোট করে দেখেন নি। একদিন কথায় কথায় উনি বলেছিলেন, "দেখ সুবীর, যে জিনিস সমাজের বুকে দীর্ঘদিন চলছে, সমাজ যাকে এখনও দূরে সরিয়ে দেয়নি মানে ডিসকার্ড করেনি, যুক্তি সঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছি না বলে, কোনরকম বিচার বিশ্লেষণ না করে একেবারে বোগাস বলে উড়িয়ে দেওয়াও ঠিক নয়।" কথাটা অত্যন্ত খাঁটি।

যাই হোক অলৌকিক আরোগ্যের রহস্যের মূলোৎঘাটন হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু একটা ঘটনার কথা বলতে পারি যার বিশ্লেষণ করলে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি খুঁজে পাওয়াও যেতে পারে।

'যাদুবাবা' নাকি অলৌকিক উপায়ে রোগ সারান। লোকমুখে খবরটি পেয়ে গেলাম একদিন ওঁর কাছে। সে প্রায় বছর ষোলো আগের কথা। তখন আমি তন্ত্রচিকিৎসা ও অলৌকিক আরোগ্য নিয়ে কিছু কাজ করছিলাম।

আমার এক বন্ধু বলেছিলো, "একেবারে ভোর বেলায় যেও। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ও বাড়ে।"

রাত থাকতে উঠে রওনা দিয়ে একেবারে কাকভোরে বাবার ডেরায় গিয়ে পৌঁছলাম।

নির্জন গ্রাম। চমৎকার পরিবেশ। ছোট একটা হোগলার ঘরের সামনে সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ যাদুবাবা মহাসনে উপবিষ্ট।

ওঁর পিছনে একটা বিশাল বটবৃক্ষ অসংখ্য ঝুরি নামিয়ে দীর্ঘ স্থান জুড়ে বিরাজমান। গাছের তলায় শিবলিঙ্গ। ফুল, বেলপাতা আর হরেক রকম মালায় সাজানো। সুগন্ধি ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। বেশ একটা দিব্য অনুভূতি আপনা থেকেই জেগে ওঠে। 'স্থান মাহাত্ম্য' বলে একটা কথা আছে সেটা যে মিথ্যে নয় ওখানে গিয়েই টের পেলাম।

অদূরে একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাঁয়ের মেঠো পথ বেয়েই এসেছে গাড়িটা।

প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক, সঙ্গে ওঁর বাড়ির লোকজন বাবার সামনে বসে। গাড়ি হাঁকিয়ে এসেছেন যখন নিশ্চয়ই বড়লোক রোগী।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ইনিয়ে বিনিয়ে বলছেন শুনলাম "মস্ত বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি বাবা। পরীক্ষা নিরীক্ষা যা যা করতে বলেছে সমস্ত করেছি। ওরা গাদা গুচ্ছের ওষুধ গিলিয়েছে, খেয়েছি। মোটা টাকা ফি গুনেছি। কিন্তু রোগ সারা তো দূরের কথা উল্টে বেড়েই চলেছে...আপনার পায়ে পড়ি বাবা আমায় ভালো করে দিন, না হলে ঘর সংসার, ব্যবসা পত্তর সব রসাতলে যাবে।"

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাবা ইশারায় বসতে বললেন। বটগাছের গাঁ ঘেষে আয়েস করে ঘাসের ওপর বসলাম পদ্মাসনে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের উপসর্গের অন্ত নেই। মনে হল যেন যাবতীয় রোগ ব্যাধি যুক্তি করে ওর দেহে বাসা বেঁধেছে আর সেই সঙ্গে ওঁর মনটাকেও ওলোট পালোট করে দিচ্ছে।

কথাবার্তা শুনে বুঝতে পরলাম ওঁর বিশাল ব্যবসা। প্রচুর টাকা পয়সা আর সেইসঙ্গে দুশ্চিন্তারও অন্ত নেই। উনি বিলাসের মধ্যেই থাকেন, কায়িক পরিশ্রম বড় একটা করেন না।

যাদুবাবা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথাগুলো মন দিয়ে শুনে চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পর নিজেই উঠে গিয়ে ঘর থেকে নিয়ে এলেন একটা মোটা লাঠি, দেখলেই বোঝা যায় ওটা বহুদিনের পুরোনো।

লাঠিটা প্রৌঢ়ের হাতে দিয়ে বাবা গম্ভীর গলায় বললেন "এই যষ্টি তোকে দেবার নির্দেশ পেলাম। এটি আমায় দিয়েছিলেন এক মহাসাধক। সে অনেকদিন আগের কথা। তখন আমি এক দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধিতে ভুগছিলাম। যাই হোক... এটা মন্ত্রপূত লাঠি। রোগ সারানোর অলৌকিক ক্ষমতা আছে এর।"

লঠিটা নিয়ে কি করতে হবে, এই জাতীয় কিছু নিয়মাবলী ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন বাবা। প্রৌঢ় ও ওঁর বাড়ির লোকেরা বাবাকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

বাবার উপদেশ ও নিয়মাবলীর মধ্যেই আরোগ্য লাভের মূল রহস্যটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। তবুও বাবা কিছু বলার আগেই ওঁর মুখ থেকে সেটা শোনার জন্য জিজ্ঞেস করলাম "আচ্ছা বাবা, ঐ ভদ্রলোক তো নানারকম রোগে ভুগছেন, অনেক

বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছেন কিন্তু রোগ সারে নি। লাঠিটার মধ্যে কি সত্যিই কোন মন্ত্র দেওয়া আছে, যার শক্তিতে উনি রোগমুক্ত হবেন?"

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন যাদুবাবা "বেটা, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। তন্ত্র মন্ত্রের কোন ব্যাপারই নেই লাঠিটার মধ্যে। ওটা একটা সাধারণ লাঠি। আমি যখন পরিব্রাজক ছিলাম ঐ লাঠিটা সব সময় আমার সঙ্গে থাকতো...তবে হ্যাঁ ঐ রোগীটি যদি আমার নির্দেশ মেনে লাঠির সদ্ব্যবহার করতে পারে তবে নিশ্চয়ই ওর অসুখ সেরে যাবে। কি করে সারবে তা এই গল্পটা শুনলেই বুঝতে পারবি।"

রসিক মানুষ যাদুবাবা। বেশ সরস করেই গল্পটি বললেন।

প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজামশায়ের কঠিন ব্যামো হয়েছে।

মনে শান্তি নেই। শরীরটা দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। ক্ষুধামান্দ্য, হজমের গোলমাল, বুক ধড়ফড়, কাজ কর্মে উৎসাহ নেই, ঠিকমত ঘুম হয় না। ক্লান্তি, অবসাদ, দুর্বলতা.... হরেক রকম উপসর্গ।

দেশ বিদেশের ডাক্তার, বদ্যি, হাকিম, কবরেজ আসছেন। পিলে চমকানো নানা রোগের নাম করছেন। কারো সঙ্গে কারো মতের মিল নেই। একজন বলেন 'মনোবিকার' তো অন্যজন বলেন 'শরীরের রোগ'। ওঁরা নিত্য নতুন ওষুধ পত্তর দিচ্ছেন আর মোটা টাকা ফি নিচ্ছেন।

কিন্তু রোগ ভালো তো হচ্ছেই না বরং দিনকে দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে।

প্রত্যন্ত নগরে দুঃস্বপ্নের দিন এসেছে।

সেই দেশের গয়লার ছেলে হীরা। সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবক। খায় দায় গান গায় আপন মনে গরু চরায়, পরমানন্দে আছে। শুধু তার সংসারে মন নেই। বিয়ে থা করতে চায় না। রাজকন্যা ছাড়া আর কাউকেই তার নাকি মনে ধরে না। এই নিয়ে হীরার বাপ মার খুব দুশ্চিন্তা।

হীরা একদিন সাহস করে রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির। দ্বাররক্ষী তো কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না। হীরাও নাছোড়বান্দা। সে খুব অনুনয় বিনয় করে বললো "আমি মহারাজের অসুখ সারিয়ে দোব। একবার শুধু তার কাছে আমায় যেতে দাও।"

খবর পেয়ে রাজামশাই বললেন "ওকে নিয়ে এসো। রোগের জন্যে তো অনেক কিছুই করলুম। দেখি এবার হীরে কি বলে!"

হীরা মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললো "মহারাজ সকাল বিকাল দুবেলা মুক্তবায়ু সেবন আর নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। রোগ আপদ বাপ্ বাপ্ বলে পালিয়ে যাবে।"

শুনে রাজা খুব বিরক্ত হয়ে হীরাকে অপমান করে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন।

হীরা খুব ক্ষুণ্ন হলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল এ অপমানের শোধ সে তুলবেই।

কিন্তু স্বয়ং রাজামশাইকে জব্দ করা সে তো আর সোজা ব্যাপার নয়। খুব ফাঁপরে

পড়লো হীরা। শেষে অনেক ভাবতে ভাবতে একটা সূক্ষ্ম বুদ্ধি বেরিয়ে এলো ওর মোটা মাথা থেকে।

ওর গরু চরানোর লাঠিটাকে রঙ বেরঙে সঙ সাজালো হীরা আর গাঁয়ের যাত্রাদলের অধিকারীকে জপিয়ে জটাজুটো, গোঁফ দাড়ি এইসব পরচুলা আর একটা রুদ্রাক্ষের মালা ধার করে নিয়ে এল।

তারপর সাধুবেশে ডাণ্ডা হাতে রাজবাড়িতে গিয়ে হাঁক পাড়লো "আমি দেহাত্মানন্দ মহারাজ। হিমালয় থেকে এসেছি। মন্ত্রবলে মহারাজের রোগ সারিয়ে দোব।"

চেহারাটাতো ভালোই, সাধুবেশে হীরাকে মানিয়েছেও বেশ। মহারাজ সসম্মানে সাধুমহারাজকে রাজ দরবারে আনতে আদেশ দিলেন। সাধুবাবা বললেন "আমি কে আর কেন যে এসেছি সে তো তুমি শুনেইছো রাজা।"

রাজামশাই সাধুবাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন "প্রভু অপার করুণা আপনার। আমার রোগ ভালো করে দিন, যা চাইবেন তাই দোব।"

গরুচরানোর লাঠিটাকে বাগিয়ে ধরে সাধুবেশী হীরা বললো "এইটে মন্ত্রপূত [illegible] কৈলাসে গিয়েছিলাম। স্বয়ং শিব আমাকে দিয়েছেন। রোগ সারানোর অলৌকিক ক্ষমতা আছে এই দণ্ডটির। তবে এর মন্ত্রশক্তি বিকাশের জন্যে কিছু প্রক্রিয়া করতে হবে।"

"কি করতে হবে বলুন বাবা, নিশ্চই করব" বললেন মহারাজ। সাধুবেশী হীরা বলল "এই যাদুদণ্ডটি নিয়ে, সকাল বিকাল নদীর ধারে গিয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, নৈঋত, বায়ু, অগ্নি, ঊর্ধ্ব ও অধঃ এই দশদিকে দশ বার করে যাদুদণ্ডটি ঘোরাতে হবে আর সেই সঙ্গে চলবে এই মন্ত্র জপ

মনে স্ফূর্তি দেহে বল
আধিব্যাধি দূর চল

তবে হ্যাঁ, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নয়। প্রতিক্ষেত্রে দশ পা করে দৌড়ে দশ দিকে, অর্থাৎ একশো পা ছুটে একশোবার যাদুদণ্ডটি ঘোরাতে হবে।"

রাজামশাই ব্যাজার হয়ে বললেন "এই কঠিন পরিশ্রম কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

"খুব সম্ভব" ধমকে উঠলেন সাধুবাবা "কদিন একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখবে কাজটা খুব সহজ হয়ে এসেছে। যাদুদণ্ডের মন্ত্রবলে ক্রমশঃ দেহ মন রোগমুক্ত হবে তখন নিজেই বুঝবে এই সামান্য পরিশ্রম তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজামশাই বললেন "কি দক্ষিণা দিতে হবে বলুন বাবা?"

"এখন নয় ঠিক একমাস পরে আমি আসব আর সুদক্ষিণা গ্রহণ করবো। দেবে তো ঠিক?"

"নিশ্চই দোব" কথা দিলেন মহারাজ।

কি আশ্চর্য!

সাধুবাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো। প্রথম কদিন একটু কষ্ট হলেও লাঠি, মানে যাদুদণ্ড ঘোরানোর কাজটা কিছুদিনের মধ্যেই জলবৎ তরল হয়ে গেলো। আর

যাদুদণ্ডের কি অলৌকিক মন্ত্রশক্তি! রাজামশায়ের গায়ে গত্তি লাগলো। মনে আনন্দের জোয়ার এল। রোগ যেন পালানোর পথ পেলো না।

প্রত্যন্ত নগরে খুশির প্লাবন বয়ে গেলো।

ঠিক একমাস পরেই সাধুবাবা আবার এসে হাজির।

মহারাজ তো এক দৌড়ে পায়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন "সাধুবাবা আপনি আমায় নতুন জীবন দিয়েছেন। অত্যাশ্চর্য মন্ত্রশক্তি এই যাদুদণ্ডের। দেহ ব্যাধিমুক্ত হয়েছে। মনে শান্তি ফিরে এসেছে।"

"আরে আরে করছেন কি রাজামশাই?" আঁৎকে উঠে পিছিয়ে গেলেন সাধুবাবা। পরচুলটুলগুলো আর ধড়াচুড়ো খুলে আত্মপ্রকাশ করলো হীরা "মহারাজ অপরাধ মার্জনা করবেন। গরীব মানুষের সহজ কথা তো শুনলেন না। তাই নিরুপায় হয়ে ছল চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলাম। যাদুদণ্ড তো আমার গোরু চরাবার লাঠি। মন্ত্র সে তো আপনার মনের বিশ্বাস। রোগ সেরেছে মুক্ত বায়ু সেবন আর নিয়মিত শরীর চর্চায়।"

হীরার কথা শুনে রাজামশাই সভাসদবর্গ তো বিস্ময়ে হতবাক।

মনে মনে কিছুটা ক্ষুন্ন হলেও মুখে গাম্ভীর্য এনে রাজামশাই বললেন "খুব গর্হিত কাজ করেছ সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্যকারণ যাই হোক তোমার জন্যই তো আমি শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছি। মনে স্ফূর্তির বান ডেকেছে। কিন্তু কৃতকর্মের জন্য শাস্তি তোমায় পেতেই হবে।"

"যা দেবেন মাথা পেতে নেব মহারাজ। আপনি ব্যাধিমুক্ত হয়েছেন, এটাই আমার কাছে পরম পাওয়া" বলল হীরা।

রাজামশাই বললেন "তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি হীরা। সেদিন তুমি সুকৌশলে আমাব একমাত্র মেয়ে সুদক্ষিণাকে প্রার্থনা করেছিলে। কথার খেলাপ করতে পারব না। তবে যাদুদণ্ডের ভাঁওতাবাজির জন্য তোমায় কিছু কঠিন দণ্ড দেব। রাজকন্যার সঙ্গে আমার অর্ধেক রাজত্বের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তাও করে দিলাম তোমায়।"

পুরুষ প্রকৃতি

তন্ত্রশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব শিব (পুরুষ) ও শক্তি (প্রকৃতি)। এরা উভয়েই পূর্ণ। শিব ও শক্তি একই সত্তার দুটি অংশ হিসেবে বর্ণিত। শৈবাগম মতে পুরুষই (শিব) প্রধান। শিব সংযুক্তা অপ্রধান শক্তি প্রকৃতি। কিন্তু এরা অভিন্ন। শক্তিহীন শিব, শব। তাত্ত্বিক বিচারে শাক্ত ও শৈব উভয় মতের ইতর বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। অনুমান, শক্তিবাদের প্রভাবেই পুরাণের যাবতীয় দেবতাই শক্তিযুক্ত।

শিবশক্তি মমাত্মানৌ পিণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডমেব চ

——জীবন্মুক্তি গীতা

শিব শক্তি যে রূপ একটি আত্মা, সেইরকম আমাদের দেহ ও মন একই পদার্থ। এই দেহ ও মনঃসম্বলিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং বাহ্য দৃশ্য এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উভয়েই একই পদার্থ। ষট্‌চক্র নিরূপণে বলা হয়েছেঃ

লয়স্থানং বায়োস্তদুপরি চ মহানন্দরূপং শিবার্দ্ধং
শিবাকারং শান্তং বরাভয়মং শুদ্ধবোধপ্রকাশম

আমাদের দেহে ভ্রূযুগলের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে বায়ুর যে লয়স্থান আছে তার উপর মহানন্দরূপ শান্তমূর্তি বরাভয়প্রদয় হস্তযুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ অর্ধ শিব-শিবা যে মূর্তি আছে শ্রী গুরুচরণ সেবানিরত সুশীলা যোগী যদি সেই শিবদুর্গার যুগল মূর্তি দর্শন করতে সমর্থ হন তো তাঁর সিদ্ধি করায়ত্ত হয়।

শক্তি আদিতে অতিশূন্যতারূপ কারণ সমুদ্রে একাত্ম হয়ে মিশে থাকে। স্বভাবতই সেই শক্তি অতিশূন্যতার বুকে গড়ে উঠে বিছিন্ন হয়। এই যে বিছিন্ন হওয়া এর নাম 'পত্' সেই থেকে শক্তি পুরুষের 'পত্নী' নামে পরিচিতা।

পুরুষ ও প্রকৃতি বা শিব শক্তি একই অর্থাৎ অভিন্ন ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একে অন্যেব পরিপূরক। শক্তি ব্যতীত শিব অস্তিত্বহীন।

আগেই বলেছি তাত্ত্বিক বিচারে শাক্ত ও শৈব উভয় মতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। যতদূর জানা যায় তাতে এই ধারণা হওয়া অনুচিত নয় শক্তিবাদের প্রভাবের ফলেই পুরাণে দেবতাদের বিবাহিত অর্থাৎ পত্নীযুক্ত কল্পনা করা হয়েছে। সেজন্য দেখা যায় শিবের স্ত্রী হিসেবে দুর্গা, কালী, পার্বতী ইত্যাদি নানা রূপ কল্পনা করা হয়েছে।

এই মহাবিশ্বে মহাশক্তি অনন্তকাল বিরামবিহীন লীলা প্রবাহিত রেখেছেন, সে যে অদ্বৈত শক্তি অর্থাৎ যাবতীয় শক্তির উৎসস্থল অর্থাৎ সেখান থেকেই সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তি বিকশিত। এই শক্তির লীলা জড়ও চেতন রূপায়িত। এই মহাশক্তিই বিশ্ব প্রাণদায়িনী ভগবতী মহামায়া।

পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ পুরুষকে ক্রিয়াশীল রেখেছেন ঐ পরমা প্রকৃতি রূপী আদ্যাশক্তি।

সাধক মাত্রই বিশ্বাস নির্ভর। সাধকের বিশ্বাস টলানো খুব মুশকিল। যিনি যে ভাবে ঈশ্বরের সাধনা করছেন তিনি সে ভাবেই তাঁকে পেতে চাইছেন।

মধুর ভাবের সাধকের তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক। সাধক তাকে প্রেমিকা হিসেবে পেতে চান। এখানে সোহম্ ভাবে নিজেকে ভগবান কল্পনা করে ভগবতীকে প্রিয়তমা রূপে প্রাপ্তির সাধনা।

এই আমি শিব আর পরমা প্রকৃতি দুর্গা। সেই তিনিই আমার আকুল আহ্বানে আমার কাছে এসে ধরা দেবেন, এই কথা নিজেও যেমন বলছি তেমনি শুনেওছি অনেক সাধকের মুখে। অনেকদিন আগে এই রকম এক গৃহী সাধকের সন্ধান পেয়েছিলাম। সে কাহিনীই এখানে লিখছি।

সে সময় চুটিয়ে সাধুসঙ্গ করতাম।

কোথাও কোন সাধকের খবর পেলেই ছুটতাম তার কাছে। আবার অনেক সাধক খোঁজখবর নিয়ে আমার কাছে আসতেন।

আমার আরাধ্যা দুর্গাদেবীর নির্দেশে এক রাতে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার ব্রাহ্মমুহূর্তে। অবশ্য বেশি দূর যাবার হিম্মত বা সরকারী চাকরি ছাড়ার সাহসও হয়নি। প্রথমে ছিলাম খড়দার রহড়া অঞ্চলের এক পরিত্যক্ত বাগানবাড়িতে। সাপ, বেঁজি, শেয়াল, কুকুর, ছাগল, বেড়াল ছাড়াও নানা ধরনের জন্তু জানোয়ার আর হরেক রকম পাখ পাখালির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কত রকম নাম না জানা পোকামাকড় আর পাখ পাখালি এত কাছাকাছি আছে এখানে না এলে এ রহস্য কোনদিনই জানতে পারতাম না।

কিছুদিন সেখানে থেকে চলে গেলাম ব্যারাকপুরে পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে শ্রীগুরু আশ্রমে। সেখানে মনোরম স্বর্গীয় পরিবেশে শ্রীমৎ স্বামী নীলানন্দ সরস্বতীর স্নেহচ্ছায়ায় নিশ্চিন্তে সাধন ভজনে কাল কাটালাম বেশ কিছুকাল। পি. জি. হাসপাতালের কাজটুকু ছাড়া বাকী সময়টা ডুবে থাকতাম অধ্যাত্ম জগতে জপ ধ্যান আর সাধুসঙ্গে।

সুখচরের বালক ব্রহ্মচারীর বেদ-অভেদ ধামে আসতেন স্টেট ব্যাঙ্কের হেড অফিসের এক মস্ত অফিসার। বিখ্যাত এক ব্যক্তি ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিও সাধুসঙ্গে আগ্রহী ছিলেন। স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার ভদ্রলোক সুখচরের আশ্রমে এলে ব্যারাকপুরে আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন।

সেদিনও তিনি সুখচর ঘুরে আমার কাছে এসেছিলেন। মেঘমেদুর বৃষ্টি ভেজা মিষ্টি একটা দিন। আশ্রমের মনোরম পরিবেশ আরো চমৎকার হয়ে উঠেছে। মনে পড়ছিল কালিদাসের মেঘদূত। যক্ষের বিরহ বিধুর আকুল প্রার্থনা। আষাঢ়ের আকাশে ঘন মেঘের নীলাঞ্জন ছায়ার সঞ্চারণ দেখতে দেখতে মন চলে গিয়েছিল রামগিরি শিখরে। অলকার নির্বাসিত যক্ষের বক্ষবিদীর্ণকারী বিরহের মর্মমূলে প্রেয়সীর প্রতিচ্ছবি মেঘদূত কাব্যগ্রন্থে।

তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ

শ্রোণী ভারাদলস-গমনা স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র সাদ যুবতি-বিষয়ে দৃষ্টিরাদ্যের ধাতুঃ
—উত্তর মেঘ

হে মেঘ, তুমি যাকে দেখতে পাবে সে তন্বী। তিনি শ্যামাঙ্গী। পক্ক দাড়িম্ব বীজের মতো সূক্ষ্ম শিখর যুক্ত তার দন্ত। পক্ক বিম্বফলের তুল্য তার অধর। ক্ষীণকটি, গভীর নাভি। নিতম্বের গুরুভারে শিথিল গতি। স্তনভারে সামান্যা আনতা। তোমার মনে হবে যুবতী সৃষ্টিতে সেই বিধাতার প্রথম আদর্শ।

ব্যাঙ্কের অফিসার ভদ্রলোক প্রায়ই আমার সাধন পদ্ধতি জানতে চাইতেন। এতকাল এড়িয়ে এড়িয়ে ঐ দিন দুর্বলমুহূর্তে জানিয়ে দিলাম "আমি নিজেকে শিব ভাবি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার পরমারাধ্যা দুর্গাদেবী আমার এতখানি প্রেম, ভালবাসা এই আকুল আহ্বান উপেক্ষা করতে পারবেন না। একদিন না একদিন উনি মানবীরূপে আমার কাছে আসবেন। আসতেই হবে। আমি শুধু প্রতীক্ষায় দিন গুণছি।"

সমস্ত শুনে ব্যাঙ্কের ভদ্রলোক বললেন "ঠিক আপনার মত এমনি এক সাধকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। উনি গৃহী সাধক। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। এক রেপুটেড প্রাইভেট ফার্মের মস্তবড় একজিকিউটিভ। জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। প্রচুর পড়াশোনা এবং অধ্যাত্ম জগতেও প্রবল দখল। তিনিও নিজেকে শিব জ্ঞানে দুর্গার প্রতীক্ষায় বসে থেকে থেকে এখন এই প্রৌঢ় বয়সে এক কিশোরীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন ও সকলকে বলছেন এই আমার দুর্গা। এতবছর পর মানবী রূপ ধরে আমার প্রেমে ধরা দিয়েছে। আমি জানতাম একদিন না একদিন ওকে আসতেই হবে।"

ওঁর কথা বলার ধরনটি আমায় পীড়া দিল, কারণ ওঁর বলার মধ্যে ঠাট্টার ভাব ছিল। কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললাম "দেখুন সাধকভেদে সাধন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তবে যে কোন সাধক যে কোন অবস্থায় যে কোন ভাবেই সাধনা করুন না কেন তাঁদের সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে বিচার করা উচিত নয়।"

ব্যাঙ্কের অফিসার তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে লজ্জিত হয়ে বললেন "নো নো ডঃ চ্যাটার্জি। ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ... হ্যাঁ যা বলছিলাম সেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্ট সাহেব বিবাহিত। ছেলে মেয়েও আছে। তবে উনি সংসারে থেকেও উদাসীন। ডিটাচড্, ঐ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে পাঁকাল মাছের মত থাকা বলেছেন সেই রকম আর কি! ভদ্রলোকের টাকা পয়সা প্রচুর। তাই সংসারে ওঁকে নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই। উনি এখন কিশোরী কন্যাকুমারীটিকে দুর্গা জ্ঞানে গ্রহণ করে পরমানন্দে আছেন।"

চার্টার্ড আকাউনট্যান্ট সাধকটির নাম প্রণব বসু। গেলাম একদিন ব্যাঙ্কের অফিসারের সঙ্গে প্রণববাবুর সল্টলেকের বাগান ঘেরা সুন্দর বাড়িটিতে।

বাগানের মধ্যে ছায়াসুনিবিড় একটা ছোট্ট ঘরে প্রৌঢ় প্রণববাবু তখন কিশোরী দুর্গাকে (মেয়েটির নাম এখন আর মনে নেই) নিয়ে নিভৃত নির্জনে একাগ্রচিত্তে 'পুরুষ প্রকৃতি' তত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে ইশারায় বসতে বললেন। কিন্তু ওঁর ভাব বা প্রসঙ্গ

কোনটিরই পরিবর্তন হলো না। প্রণববাবু সেদিন তাঁর দুর্গাকে পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা সংক্ষেপে এইরকম।

আমি যেহেতু তন্ত্রসাধক সেজন্য দ্বৈত সাধনায় (পুরুষ ও প্রকৃতি) বিশ্বাসী। অর্থাৎ আমিই শিব আর আমার প্রেরণাদাত্রী হ্লাদিনীশক্তি দুর্গা (প্রকৃতি)। সে মানবী।

শাস্ত্রমতে শিব নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ পরম নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মচৈতন্য। তিনি বয়োবৃদ্ধ। তাঁকে ক্রিয়াশীল রেখেছেন তাঁরই হ্লাদিনীশক্তি স্বরূপিনী ভগবতী মহামায়া। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে অল্পবয়সী নারী। লীলাময়ী বালিকা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এ তথ্য বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত আছে। যাই হোক শক্তিবিহীন শিব শববৎ। এ প্রসঙ্গে শ্রীমৎশঙ্করাচার্যের একটি উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্
নো চোদবং দেবো ন খলু কুলশঃ স্পন্দিতুমতি

অর্থাৎ শিব যদি শক্তি (দুর্গা) যুক্ত না হন তা হলে তিনি চলৎশক্তিহীন।

এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক। ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোমের (শূন্য) পরস্পর বিরোধী পঞ্চশক্তি বিরাজমান। ক্ষিতির উৎপাদিকা, অপের আর্দ্রতা, তেজের দাহিকা, মরুতের স্পর্শ ও ব্যোমের শব্দ এই পঞ্চশক্তির প্রভাবে প্রপঞ্চময় মায়ার জগৎ লীলাযিত।

উপনিষদ বলছে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব ন পরা"। এখানে মিথ্যা বলতে মায়ার কথাই বলা হয়েছে। জগৎ মায়াজাত, মায়াধীন ও মায়াময়, এ মায়া দুস্তরা, দুর্বোধ্য ও দুরতিক্রম্য। দৈবী মায়া, ভগবতী মায়া, বিষ্ণুমায়া (যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা—শ্রীশ্রীচণ্ডী)। যাই বলা হোক না কেন সেই অনন্ত মায়া অলঙ্ঘনীয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— আমার এই ত্রিগুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) দৈবী মায়া (অলৌকিকী) খুবই দুস্তরা।

'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' একমাত্র উনিই নিত্যবস্তু। বাকী সমস্ত কিছুই অনিত্য অর্থাৎ মায়া। সময় আপেক্ষিক। ক্ষণস্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী যাই হোক না কেন চিরস্থায়ী বলে কোন শব্দ থাকতে পারে না। কারণ লক্ষ কোটী বছরও মহাকালের চোখের পলক ফেলা মাত্র।

'অদৈক্ষত অহম বহুশ্যাম' সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম লীলার মানসে বহু হয়ে এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিই মায়া। প্রপঞ্চময় পঞ্চভূতাত্মক মায়ার জগতে অর্থাৎ মায়াময় ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চশক্তির প্রভাবে জীবের অন্তর্জগতে বহু ভাবের উদয় হয়। সেই থেকেই সৃষ্টি হয় কামনা, বাসনা ও কল্পনা।

শাস্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা দ্বৈতভাবে। সে জন্যই সৃষ্টি স্থিতি, লয়। এই প্রহসন ত্রয়ীর প্রভাবে জগৎ লীলায়িত। যদিও সেই একই সত্তার দুটি অংশ পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই নামে বিভূষিত কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ মিশ্রিত, ও ত্রিগুণাত্মিকা। পৃথিবীর মধ্যে গুণত্রয় অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। একসময় পরস্পরের মধ্যেই প্রাধান্য বা উত্তেজনা না থাকায় এই ত্রিগুণ সাম্য অবস্থায় বিরাজ করতো। কিন্তু

সৃষ্টির প্রয়োজনে, লীলার বাসনায় ব্রহ্মের এই গুণত্রয় দু ভাগে ভাগ হয়েছিল ঃ একটি পুরুষ ও অপরটি প্রকৃতি (নারী)।

একই সত্তা আর একই ভাব থেকে দ্বিধাবিভক্ত সুতরাং পরস্পরের মধ্যে মিলনেচ্ছা তীব্র হয়ে উঠলো। আগের মত সরাসরি রমণের বাধা সৃষ্টি হওয়ায় প্রকৃতি পুরুষের বিপরীতে সংযুক্তা হলেন। তন্ত্রশাস্ত্রমতে এই অবস্থানকেই বলা হয় 'বিপরীতরতাতুরা'।

সেই প্রথম যৌনতার সুরু। পুরুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্যেই আদিবীজ কামের বপন, রোপন, অঙ্কুরোদ্গম, ও ক্রমশঃ বৃক্ষসহ পল্লবিত ফুল ফল ও পুনরায় বীজ সৃষ্টির বিবর্তন তথা চক্রাকারে আবর্তন লীলায় ক্রমান্বয়ে সুরু হলো কামনির্ভর সৃষ্টিতত্ত্ব।

পুরুষ ও প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হচ্ছে যোনিপীঠস্থিত (দুর্গা) লিঙ্গ (শিব)। দুর্গার যোনিপীঠে এই শিবলিঙ্গ আমাদের পরম আরাধ্য যন্ত্র।

যদি সেই আদি তত্ত্ব অনুধাবন করা যায় তবে দেখা যাবে আদ্যাশক্তি হলেন প্রকৃতি (নারী) যিনি জীবজগতের লীলার আধার রূপে বিরাজিতা। আর সময় অর্থাৎ মহাকাল হলেন পুরুষ। মহাদেবের মূর্তি কল্পিত হয়েছে মহাকাল থেকে। জীবাত্মাই বা কী, আর পরমাত্মাই বা কী! সেই অখণ্ড আত্মা পরমাত্মা আর জীবাত্মা তারই অংশ বিশেষ। যেমন ঘটের মধ্যে আকাশ।

তন্ত্রসাধনা তো বটেই। আমাদের অন্যান্য সাধন সমূহও মূলতঃ কাম নির্ভর। দ্বৈতরূপ। যেমন রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি মধুর রসের মূর্ত প্রতীক।

নর (পুরুষ) ও নারীর (প্রকৃতি) যৌন মিলনই প্রকৃত কামতত্ত্ব। এই কাম ঘনীভূত হয়ে প্রেমের রূপ নেয়। সেই প্রেম স্থূল দৈহিক কাম ক্রিয়ায় থেকে দেহাতীত সূক্ষ্ম চৈতন্যময় চিদানন্দ লোকে উত্তরণ। সাধকের কল্পনার রঙে মূর্ত প্রতীক উপাসনা বা আইডিয়ালাট্রি। রূপ সাগরে ডুব দিয়ে এবং সেই রূপকেও অতিক্রম করে অরূপ রতন লাভের এক অপরূপ প্রয়াস।

বৈদান্তিক মতে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব অতি গোপন ও রহস্যময়। এবং এর চরম সার্থকতা শিব শিবা রূপ কল্পনায়। শিবের আত্মশক্তি (শিবা) হচ্ছেন প্রকৃতিরূপিনী মহামায়া। তিনিই দুর্গা।

কথা শেষ করে প্রণববাবু ওঁর দুর্গাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

উনি এতো স্বপ্নাচ্ছন্ন ও অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে আমাদের উপস্থিতি ওঁর চেতনার মধ্যে ছিলো না। ব্যাঙ্কের ভদ্রলোক ও আমি যেন একটা নেশাচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে শিব দুর্গার যুগল মিলন প্রত্যক্ষ করে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে চলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু এখনও ভাবলে আশ্চর্য লাগে, প্রণববাবু না হয় ব্রহ্মজ্ঞানী, ওঁর কাছে আমাদের অস্তিত্বের কোন মূল্য নাও থাকতে পারে। কিন্তু এই কিশোরীটি (দুর্গা) কি করে যাবতীয় লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে আমাদের জলজ্যান্ত উপস্থিতি উপেক্ষা করতে পারল। নাকি সেও পুরুষ প্রকৃতি সাধন তত্ত্বের গূঢ় রহস্যে ডুবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিস্মৃত হয়ে চেতনাতীত জগতে বিরাজ করছিল!

পাগলা সাধু

"তোমার জন্মদিনে একটা দারুণ কিছু উপহার দিতে চাই, কি নেবে বল?, বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যানগগ্ শুধোলেন তাঁর প্রেয়সীকে। "তোমার ভালবাসাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠতম উপহার। আমি আর কিছুই চাই না" ভ্যানগগের প্রেমিকার চট জলদি জবাব।

"সে বললে চলবে না। একটা কিছু নিতেই হবে" জেদ ধরলেন ভ্যানগগ্।

"বেশ নেহাৎ যদি কিছু দিতেই চাও তবে তোমার একটা কান উপহার দিও" উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়লেন ভ্যানগগের প্রেমিকা। ভ্যানগগের কান দুটো ছিল খুব বড় বড় খরগোসের মতো। এই নিয়ে পরিচিত মহলে প্রায়ই ওঁকে ঠাট্টা তামাশার সম্মুখীন হতে হতো।

জন্মদিনের সাত সকালেই কলিং বেল বেজে উঠল। ভ্যানগগের প্রেমিকা দরজা খুলে দেখলেন, অপবিচিত এক ব্যক্তি। হাতে সুদৃশ্য ছোট বাক্স।

"ভ্যানগগ্ সাহেব এটা পাঠিয়েছেন" এই বলে বাক্সটি দিয়ে সে সেলাম করে চলে গেল।

কম্পিত বক্ষে বাক্স খুলেই তো প্রেমিকার চক্ষুস্থির। একটা নিরীহ রসিকতা যে এরকম নির্মম বাস্তবে পরিণত হতে পারে এটা তার কল্পনাতীত।

বাক্সেব মধ্যে দা কাটা একটা রক্তমাখা কান। কানটি যে কার সেটা নিশ্চয়ই বিশদ করে বলতে হবে না।

প্রতিভাবান ব্যক্তিদেব কিছু কিছু আচরণ অবশ্য অস্বাভাবিকত্বের পর্যায়ে পড়ে। বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমণ্ড ফ্রয়েড স্বাভাবিকত্বের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম।

যাই হোক, নাটকীয় ভাবে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা অংশবিশেষের ছেদ করার একটা প্রবণতা দেখা যায় কিছু কিছু মনোরোগীদের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ দীর্ঘস্থায়ী 'চিত্তভ্রংশী বাতুলতা' বা ক্রনিক স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীদের মধ্যে। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'ভ্যানগগ্ সিনড্রোম'।

প্রায় তিরিশ বছর চিকিৎসা, জ্যোতিষচর্চা, তন্ত্রাভিলাষ, সাধুসঙ্গ ও দেশ বিদেশে ভ্রমণের সুবাদে আমি এই ধরনের তিন ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছি। প্রথম জনকে দেখেছিলাম দিল্লী মেন্টাল হসপিটালে, তখন আমি সেখানকার আবাসিক চিকিৎসা আধিকারিক, রোগিটি একটি স্বাস্থ্যবান শিখ যুবক, নাম চন্দন সিং। সে তার নাক কেটে ফেলতে গিয়েছিল। দ্বিতীয় জন এসেছিলেন পি. জি. হাসপাতালের মনোরোগ বহির্বিভাগে (মেন্টাল আউটডোর) বছর দুয়েক আগে। মাঝবয়সী ভদ্রলোক, নাম ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী। উনি বঁটি দিয়ে নিজের একটা হাত কেটে ফেলতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য চিত্তভ্রংশী

বাতুলতা রোগীদের বাস্তবের সঙ্গে বড় একটা যোগ থাকে না। এরা নিজেদের কল্পনার জগতেই বিচরণ করে। অনেকে আবার কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে বিচিত্র এক অবস্থায় থাকে। মনোবিজ্ঞানে এই অবস্থাটিকে বলা হয় 'অটিজম'। এটা মনোরোগীদের আপন রাজ্য।

যাই হোক ঐ রোগীদের নিয়ে আমার 'দেহ মন আত্মা' বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই বইতে অধ্যাত্ম জগৎ বিশেষতঃ তন্ত্র সম্পর্কে লিখছি তাই এই জাতীয় এক তান্ত্রিক সাধুর কাহিনীটিই শুধু বলব।

প্রায় বছর পনেরো আগের কথা। তখন আমি যোগসাধনা ও তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে কিছু কাজ করছিলাম। সুতরাং প্রায়ই আমাকে তথাকথিত সাধুসঙ্গ করতে হতো। পরিচিত এক হঠযোগীর কাছে খবর পেলাম দূর গ্রামে নির্জন এক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন তান্ত্রিক আছেন যিনি সিদ্ধবাবা নামে খ্যাত। উনি লোকজন বড একটা পছন্দ করেন না। বাইরের আবরণটা খুব কঠিন কিন্তু একটু কষ্ট করে যদি ওঁর ভেতরে ঢুকতে পারা যায় তবে তন্ত্রসাধনার অনেক রহস্য জানা যাবে।

একটা রবিবার দেখে সিদ্ধবাবার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। একাই। মফঃস্বল ষ্টেশনে যখন ট্রেন থেকে নামলাম দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় হয়।

ষ্টেশন থেকে হাঁটা পথে মাইল দেড়েক। দুপাশে ধানক্ষেত মাঝ দিয়ে আঁকা বাঁকা পায়ে চলার পথ।

সুন্দর একটা টলটলে ঝিল। চারপাশে হোগলার বন। দিনের বেলাতেই শিয়ালদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। ঝিলের উত্তর পূর্ব কোণে ঘন জঙ্গল। গা ছমছমে শান্ত নির্জনে মনোরম পরিবেশ। দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরে ভয়াল ভয়ঙ্কর দক্ষিণা কালীর মূর্তি।

সামনের কিছুটা অংশ পরিষ্কার। চারদিকে ঘাস-আগাছার সমারোহ। ছোট বড হরেক রকম চেনা অচেনা পাখ পাখালির জমায়েত। অজস্র বুনো ফুল ফুটে আছে এখানে সেখানে। নয়নাভিরাম দৃশ্য।

পাখির কলতান, জন্তু জানোয়ারদের হাঁকডাক, বুনো ফুলের গন্ধ—নিশ্ছিদ্র অপার শান্তির ঠিকানা।

জনমানবহীন নগ্ন-নির্জনে সিদ্ধবাবা বাঘছালের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী, আকাশের দিকে স্থির, শূন্য উদাস। ওঁর যে রকম বর্ণনা শুনেছিলাম —মধ্যবয়সী, দোহারা চেহারা, মাথাভর্তি উস্কোখুস্কো কাঁচা পাকা চুল, একমুখ সাদা কালো দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। পরনে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বাঁ পাশে বিশাল একটা ত্রিশূল মাটিতে গাঁথা। বাঁ হাতটি ছোট একটা লাল থলিতে ঢোকানো।

অনেক সাধক ঐ ভাবে থলিতে হাত ঢেকে জপ করেন, তবে সেটা ডান হাত। এঁর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখলাম।

আমার দিকে চোখ পড়তেই সিদ্ধবাবা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন "কোথাকার

উট্‌কো একটা ঘাটের মড়া, এখানে কি করতে এসেছিস হারামজাদা? রাঁড়ের বাড়ি ফুর্তি করতে যা না। এখানে কি মধু আছে? শালারা আমাকে একদণ্ডও শান্তিতে থাকতে দেবে না।"

এরকম যে হতে পারে আগে থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। সুতরাং বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সিদ্ধবাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম "বাবা, তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি।"

"সাধনা জানবি? ভাঁওতাবাজি! আসলে এসেছিস সিদ্ধাই দেখতে। যত সব লোভী...যোনীকীট...জানোয়ারের অধম তোরা। ঈশ্বরকে ভালবাসিস না। ওঁর ঐশ্বর্যের লোভেই তোদের নোলায় জল গড়ায়।" খিঁচিয়ে উঠলেন সিদ্ধবাবা।

বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চলল খিস্তি খেউড় আর গালিগালাজের ধূম। তারপর ভাল করে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন "বোস ব্যাটা ছাগল। ভালোমানুষের মত মুখ করে এসেছিস বটে আসলে তুই একটা পাক্কা শয়তান...ফেরেববাজ। শালা বুঝিনা আমি, যোগৈশ্বর্য দেখার ধান্ধায় এসেছিস। ওরে ও সমস্ত অতি তুচ্ছ ব্যাপার। যোগ সাধনার খুব নিচু স্তরেই ওগুলো আসে...আচ্ছা বল দেখি ঈশ্বরের পঞ্চশক্তি ষড়ৈশ্বর্য, অষ্টসিদ্ধি এমনি আরো অনেককিছু ধনদৌলত আছে। কিন্তু কি নেই ওঁর?" প্রশ্ন শুনে তো আমার মাথায় হাত। ঈশ্বর তো সমস্ত কিছুর অধীশ্বর। ওঁর আবার কোন জিনিষের অভাব! কি নেই ওঁর? এরকম তো ভাবিনি কোনদিন....।"

"এই বুদ্ধু কি ভাবছিস এতক্ষণ? শোন তবে, ঈশ্বরে ভক্তি নেই, তাই উনি ভক্তির কাঙ্গাল। একমাত্র ভক্তি দিয়েই ওঁকে পাওয়া যায়... ব্যাটা কিস্‌সু জানে না, আবার তন্ত্রসাধনা শিখতে এসেছে?..."

আপন মনে খানিক্ষণ গজ গজ করে নিজেই সুরু করলেন তন্ত্র সাধনার কথা।

কি আশ্চর্য!

মনে হলো যেন অন্য মানুষ। একেবারে আমূল পরিবর্তন। ধীর স্থির শান্ত। স্পষ্ট বাচনভঙ্গী, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। সাধন মার্গের অনেক কিছুই বললেন।

কথাগুলো বহুমুখে আগেই শোনা। পড়েওছি অনেক বইতে। সে রকম নতুন কিছু নয়। কিন্তু সিদ্ধবাবার দীপ্ত কণ্ঠস্বর, চমৎকার বাচনভঙ্গী, শুদ্ধ নির্ভুল সংস্কৃত উচ্চারণ, সমস্ত কিছু মিলিয়ে অদ্ভুত এক মাদকতার সৃষ্টি করল।

উনি নিঃসন্দেহে মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। প্রচুর কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর তপস্যা করেছেন দীর্ঘকাল।

সিদ্ধবাবা কালীমূর্তি সম্পর্কে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিলেন, কালী মহাকাল।

মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাম শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং
কর্ণাদ্বিনৃমুণ্ডযুগভভয়দাং মুণ্ডস্রজাং ভীষণাং

কালী মেঘবর্ণা। দিগম্বরা, শবশিবারূঢ়া, ত্রিনয়নী, স্নিগ্ধা, ভয়ঙ্করী, মহাকাল, বরাভয়দাত্রী।

মহাকালী প্রকৃতিরূপিনী। ঘোর তমোগুণা, তিনি শিবের আত্মশক্তি, তাই তাঁর আরেক নাম শিবা।

যেহেতু সময়ের সীমা পরিসীমা নেই ও কোন কিছুতেই তাঁকে বেঁধে রাখা সম্ভব নয় তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা ও উলঙ্গিনী। কালীর আলুলায়িত এলোকেশ অনন্তমায়ার প্রতীক। গলায় নৃমুণ্ডমালা পঞ্চাশৎবর্ণ। শিব সত্ত্বগুণী। তিনি পুরুষ ও শব, পরম নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মচৈতন্য। মহাকাল অর্থাৎ কালিকা দেবী শিবের বুকে পা রেখে তাঁর চেতনা এনে তাঁকে ক্রিয়াশীল করছেন...ইত্যাদি।

এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে প্রায়। মন চাইছে না। তবু এবার উঠতেই হবে। সিদ্ধবাবাকে প্রণাম করে ওঁর আশীর্বাদ নিয়ে ফিরতে গিয়েও হঠাৎ আচমকা একটা প্রশ্ন করে বসলাম। অতি মামুলি প্রশ্ন। সেটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল। কিন্তু যাবার সময় হঠাৎ কেন প্রশ্নটা মাথায় এল বলতে পারি না।

"বাবা, এতকাল কঠোর সাধনা করছেন কিন্তু তাঁর দেখা পেয়েছেন কি ?"

ব্যাস, ঐ প্রশ্নটাই কাল হলো। রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন সিদ্ধবাবা। শুরু হল অতি অশ্লীল ভাষায় খিস্তি খেউড় যে গুলো ছাপার অযোগ্য। অবশ্য ঐ গালিগালাজগুলি সম্পূর্ণভাবেই ওঁর আরাধ্যা কালিকা দেবীর উদ্দেশেই বর্ষিত।

খেউড় থামিয়ে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে উনি বাঁ হাতটা পুটলির মধ্যে থেকে বার করলেন। সবিস্ময়ে দেখলাম বাঁ হাতের তর্জনি, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটে আঙ্গুল একেবারে নীচ থেকে পরিষ্কারভাবে কাটা।

বাবা এবার উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে একটা ঝুলি নিয়ে এলেন। ঝুলি থেকে বেরুলো তিনটে জিনিস। একটা চারচৌকো পাথরের টুকরো, একটা হাতুড়ি, একটা ছুরি। ছুরিটা ঝকঝকে ও খুব ধারালো।

উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে সিদ্ধবাবা বললেন "ঐ হারামজাদী, সর্বনাশী, রক্তখাগিটা যদি দেখা না দেয় তবে এক এক করে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কেটে কেটে ওকে পুজো দেব। তাতেও যদি আবাগীর বেটীর খিদে না মেটে...তবে মুণ্ডুটাই নিবেদন করবো ওর চরণকমলে।"

সাধনমার্গে নানারকম কৃচ্ছ্রসাধনের নির্দেশ ও আত্মনিপীড়নের প্রথা প্রচলিত আছে। শোনা যায় ভক্ত সুরদাস দৃশ্যমান বহির্জগতে বিক্ষেপণ ঈশ্বর দর্শনের অন্তরায় হবে ভেবে লোহার শলাকা বিঁধিয়ে নিজের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ওগুলো বিকৃত মানসিকতা কিনা তা নিয়ে কটাক্ষ না করাই ভালো।

সিদ্ধবাবার কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গলো "নে একটা কাজ কর। জয় মা বলে গায়ের জোরে একটা ঘা মার ছুরির ওপর।"

বাবা নিজের বাঁ হাতের কনিষ্ঠা পাথরের টুকরোর ওপর রেখে তার মধ্যে ছুরিটা বসিয়ে হাতুড়িটা আমার হাতে দিয়ে হুকুম করলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললাম "ও আমি পারবো না"। আবার একপ্রস্থ খিস্তির বন্যা বয়ে গেল "তোর ঘাড় পারবে হারামজাদা। যা বলছি শোন নইলে ফল ভালো হবে না। এখানে তামাসা দেখতে এসেছিস ? বানচোত্...কিরে শালা এখনো দাঁড়িয়ে ? তুই কি নপুংসক ?..."

এইরকম ঘোর সঙ্কটে খুব কমই পড়েছি। কি যে করবো ঠিক ভেবে পাচ্ছি না। মাথার মধ্যে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। "কি হলো রে ব্যাটা ছুঁচো, আমাকে অবজ্ঞা? দাঁড়া, এই ছুরিটাই তোর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দোব..."।

ছুরি হাতে বাবা তেড়ে আসতেই আমি মুহূর্তের মধ্যে হাতুড়ি ফেলে পড়ি কি মরি করে দৌড় শুরু করলাম।

"ওরে হাবা, দাঁড়া দাঁড়া, কোন ভয় নেই..." আর দাঁড়াই, বাবার অভয়বাণী উপেক্ষা করে প্রাণের দায়ে দৌড়ের গতিবেগ বাড়িয়ে দিলাম। পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস পর্যন্ত নেই।

বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ে যখন খুব হাঁপিয়ে উঠেছি, ছোটার ক্ষমতা প্রায় লোপ পেয়েছে, দেখলাম দূরে মাঠের মধ্যে এক চাষী ছোট একটা টিলার ওপর বসে তামাক টানছেন।

দৌড়ের গতিপথ পরিবর্তন করে মাঠের মধ্যে টিবিটার কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মুখ থুবড়ে। চাষীটি তড়িঘড়ি হুঁকো ফেলে টিলা থেকে নেমে আমায় তুলে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে পাশের ডোবা থেকে জল এনে আমার মুখে চোখে বেশ করে কয়েকবার ঝাপটা দিয়ে বললেন "হেই বাবু, আপনি বোধ হয় খুব ভয় পেয়েছেন! কি হয়েচে?"

তখন আমার কথা বলার মতো অবস্থা নয়। হাপরের মত হাঁপাচ্ছি, নিজের বুকের শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছি। তবুও কোন রকমে খুব সংক্ষেপে ঘটনাটা বললাম।

সেই শুনে চাষীটি দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "বুজেচি বাবু আপনি ক্ষ্যাপা সাধুটার পাল্লায় পড়েছিলেন, ঠাকুরের কৃপায় খুব বাঁচা বেঁচেচেন। ও যে কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই। ওটা একটা বদ্ধ পাগল।"

গীতাতত্ত্ব

উনি কোন সিদ্ধাই দেখাতেন না। অলৌকিক উপায়ে রোগও সারাতেন না। লোক আকর্ষণের কোন স্পৃহাই ওঁর ছিলো না। তবুও যদি কেউ কোন সমস্যা নিয়ে ওঁর কাছে যেতেন উনি শুধু তাঁদের গীতার বাণী শোনাতেন।

জ্ঞানমার্গের সাধক ছিলেন। নিরীশ্বরবাদী, বৈদান্তিক। ওঁর মতে "বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ কিংবা যে-কোন শাস্ত্র বা সনাতন হিন্দু দর্শনের মূল সার ঐ এক গীতা।"

স্বামী অদ্বৈতানন্দের পোশাকি নামটা বিশেষ কেউ জানত না। লোকে ওঁকে 'গীতা-বাবা' বলেই চিনতো।

গীতাবাবার সংস্পর্শে এসে আমার গীতা পাঠে আগ্রহ বেড়েছিল। ছেলেবেলা থেকে যে গীতা অভ্যাসবশতঃ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বার বার পাঠ করেছি তার মধ্যে যে এত মাধুর্য রয়েছে গীতাবাবার সান্নিধ্যে না এলে কোনদিনই তা জানতে পারতাম না।

আসলে গীতাকে আমরা একটি ধর্মগ্রন্থ বলেই মনে করি এবং গীতা পড়লেও সেটা পাখি-পড়ার মতো মুখস্থ করি খানিকটা অভ্যাসবশতঃ কিংবা পুণ্যার্জনের মানসে অথবা কোন কার্যকারণে। আমরা সাধারণতঃ গীতাকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ, উপলব্ধি বা অনুধাবনের আন্তরিক চেষ্টা কখনও করি না।

গীতাবাবা বলতেন "কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, জীবনযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত সাধারণ মানুষের পক্ষেও সেগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ঐ উপদেশগুলির যথার্থ উপলব্ধি করতে পারলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান ও জীবনের বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে মন্ত্রের মত কাজ হবে।" ওঁর মতে "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ঈশ্বর বা অতিমানব জাতীয় কেউ নন। উনি আমাদের মতই একজন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন। তবে প্রচুর জ্ঞান, প্রখর বুদ্ধি ও প্রচণ্ড প্রজ্ঞা এবং সজ্ঞা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী এবং সে অর্থে ঐশ্বর্যশালী ছিলেন বলেই ওঁকে ভগবান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দেখো, ভগবান কখনও পাওয়া যায় না, ভগবান হতে হয় আর সেই ভগবান হতে গেলে যেটি লাভ করতে হয় তা হল 'ভগ'। ভগ অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান, ঐশীচেতনাত্ব শ্রী, সমৃদ্ধি ইত্যাদি যেটি ভগবতী ধারণ করে আছেন। এ তত্ত্ব অতি রহস্যময় ও গুহ্য।" গীতাবাবা আমায় বার বার বলতেন "এই পুস্তক এক অমূল্য সম্পদ। গীতামাহাত্ম্যে যা বলা হয়েছে তা হুবহু সত্যি কিন্তু মুশকিল কি জানো, গীতাকে কেউ ঠিকমত অনুধাবন করতে আগ্রহী নয়। আসলে ধৈর্য নেই, সে রকম ইচ্ছেও নেই আর সময়ের অভাব বা ঐ জাতীয় অজুহাত তো আছেই। গীতার প্রচার কর। এটা খুব দরকার। বিশেষ করে

বর্তমানের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে গীতা প্রচারের খুব প্রয়োজন আছে। গীতার যত প্রচার করবে ততই মানুষের মঙ্গল হবে।"

আমি বলেছিলাম "ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ গীতার নানা ধরনের সংস্করণ তো রয়েছে, বিক্রি তো ভাল্‌ই হয়, কিন্তু পড়ে কে? যাকেই বলতে যাই অনেক কথা শুনিয়ে দেয়। আর মোদ্দা ব্যাপারটা হলো সবাই ঘরসংসার নিয়ে নানাভাবে ব্যস্ত ও বিপর্যস্ত। ঐ মস্ত সাতশো শ্লোকের বই, অত পড়ার সময় কোথায়?" গীতাবাবা গীতাকে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন আমায়।

দীর্ঘকাল পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও এশিয়াটিক সোসাইটি-র সম্পাদক মনীষীপ্রতীম ডঃ চন্দন রায়চৌধুরী ঠিক ঐ অনুরোধটিই করলেন আমায়। শেষে অনেক পরিশ্রমে গীতার একশোটি মাত্র শ্লোক নির্বাচন ও সেগুলোর সহজ সরল সাবলীল ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়।

আমার লেখা 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূলতত্ত্ব ও নির্বাচিত শতক' প্রকাশ করেছে—নিউরো-সাইকো-ফিলসফিক্যাল সোসাইটি। এই সংস্থার আর্থিক সঙ্গতি ও প্রচারযন্ত্র ততটা জোরদার নয়। তবু বইটি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশংসা পেয়েছে ও ইতিমধ্যেই এর তিনটি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। এটাই আশার কথা।

গীতা বাবা যদি আজ থাকতেন উনিই সবচেয়ে খুশি হতেন। ওঁর আশীর্বাদ নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে বর্ষিত হচ্ছে। যাই হোক, বেশ কিছুকাল ওঁর সংস্পর্শে এসে গীতা সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছিলাম। এখানে খুব সংক্ষেপে তা লিখছি।

কর্তব্যদীক্ষাং চ সমত্বশিক্ষাং
জ্ঞানস্যভিক্ষাং শরণাগতিং চ
দদাতি গীতা করুণাদ্রভূতা
কৃষ্ণেন গীতা জগৎহিতায়

কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে যোদ্ধা অর্জুনকে (জীবাত্মা) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (পরমাত্মা) যে অমৃতোপম উপদেশাবলী দিয়েছিলেন তাই গীতা নামে খ্যাত। গীতার সম্পূর্ণ বিশেষণ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ' অর্থাৎ শ্রীমৎ ভগবান কর্তৃক গীত উপনিষদ। কারো কারো মতে মূল দ্বাদশটি উপনিষদের পর এইটি ত্রয়োদশ উপনিষদ।

গীতা সমস্ত উপনিষদের সার ও বেদের মতই প্রামাণ্য ও মান্য। গীতা মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে ঃ

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ

সমগ্র উপনিষদ গীতা। গোপালনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-দোহনকারী। অর্জুন গো বৎস, এবং সুধীজন দুগ্ধস্বরূপ এই মহৎ গীতামৃত পান করেন। গীতা সনাতন ধর্মের ভিত্তি 'প্রস্থান ত্রয়ীর' অন্যতম, একে বলা হয় স্মৃতিপ্রস্থান। অপর দুটি প্রস্থান উপনিষদ ও বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র।

গীতা কোন বিশেষ ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী বা বর্ণের গ্রন্থ নয়। বেদের কর্ম, সাংখ্যব প্রকৃতি তথা নিরীশ্বরবাদী আত্মতত্ত্ব, উপনিষদের ব্রহ্ম, নিরাকার ও সাকার সাধনা অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, ত্যাগ এবং সেইসঙ্গে জীবজগৎ, বিশ্বধর্ম, প্রেম, মানবতা ইত্যাদির এক অপরূপ সমন্বয়।

গীতার মূলতঃ নিষ্কাম কর্ম, নির্মল জ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তি তথা শরণাগতি ও সর্বোপরি ত্যাগের আদর্শ বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হযেছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় যা বলতেন তার মমার্থ মানুষ বার বার গীতা, গীতা বলতে বলতে ত্যাগী হয়ে যায়। এটিই সম্ভবতঃ গীতা সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তি।

গীতার রচনার সময়কাল নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় দ্বাপরের শেষ ও কলির শুরুর আগে অর্থাৎ আনুমানিক প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে গীতা রচিত হয়েছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের পঁচিশ থেকে বিয়াল্লিশ এই আঠারোটি অধ্যায়। গীতার অধ্যায় গুলিকে যোগও বলা হয় কারণ গীতা যোগমার্গের গ্রন্থ ও বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য গীতা 'ব্রহ্মবিদ্যাং যোগশাস্ত্র' নামেও পরিচিত।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যাতে স্বচক্ষে দেখতে পান সে উদ্দেশ্যে মহর্ষি বেদব্যাস জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দান করতে চেয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র স্বজন নিধন ও কুলক্ষয় দর্শনে রাজি হননি কিন্তু স্বকর্ণে যুদ্ধ-বর্ণনা শুনতে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং ব্যাসদেব রাজদূত সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু প্রদান করেন। ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় রাজপ্রাসাদে উপস্থিত থেকেও সরাসরি ধর্মক্ষেত্রের যুদ্ধবিবরণী ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছিলেন।

গীতার শ্লোক সংখ্যা সাতশো, এর মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের একটি। সঞ্জয়ের কুড়িটি। অর্জুনের চুরাশিটি ও শ্রীভগবান কর্তৃক কথিত শ্লোক পাঁচশো পঁচাত্তরটি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আমাদের অপর একটি বহুপঠিত ধর্মগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক (মন্ত্র) সংখ্যাও সাতশো। সেইজন্য এই দুই ধর্মগ্রন্থকে 'সপ্তসতী' বলা হয়।

গীতার অষ্টাদশটি অধ্যায় তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে (প্রথম ষটক) নানাভাবে কর্মের কথা ও প্রসঙ্গক্রমে কর্মের সঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যানযোগ ইত্যাদির বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই অংশ 'কর্মকাণ্ড' নামে অভিহিত। পরবর্তী ছয়টি অধ্যায় (দ্বিতীয় ষটক) মূলতঃ ভক্তিতত্ত্ব নির্ভর, সেইজন্য এই অংশকে 'ভক্তিকাণ্ড' এবং শেষ ছয়টি অধ্যায়ে (তৃতীয় ষটক) ত্রিগুণ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞানের বিষয় আলোচিত সুতরাং এই অংশকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলা হয়।

প্রথম অধ্যায় (অর্জুন বিষাদ যোগ)—ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত কৌরব ও ভীম কর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডব এই উভয় সেনার মধ্যে শ্রীভগবান কর্তৃক স্থাপিত রথোপরি মহাধনুর্ধর

অর্জুন যখন দেখলেন, তাঁকে নিকট আত্মীয় তথা স্বজন ও প্রিয়জনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তখন তাঁর সাত্ত্বিক মোহ উপস্থিত হলো। বিষাদক্লিষ্ট কুন্তীনন্দন এই যুদ্ধ অকল্যাণকর ভেবে স্বীয় ধনু (গাণ্ডীব) ও বাণ ত্যাগ করে যুদ্ধ না করাটাই যুক্তিসঙ্গত বলে ভাবলেন। এই অধ্যায়কে 'সৈন্যদর্শন যোগ'ও বলা হয়। গীতার এটি একমাত্র অধ্যায় যা ব্যক্তিবিশেষের নামাঙ্কিত। এখানে মূলতঃ অর্জুনই বক্তা। শ্রীভগবান প্রায় নীরব শ্রোতা। এই অধ্যায়ে উভয়পক্ষের যোদ্ধাদের বর্ণনা, মোহে অভিভূত অর্জুনের বিলাপ, তাঁর যুদ্ধবিরোধী মতবাদ ও যুক্তি, যুদ্ধের কুফল সম্পর্কে ব্যক্ত অভিমতই প্রধান বিষয়।

প্রথম অধ্যায়েব শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে
ন কাঙ্খে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্য সুখানি চ
—৩১

স্বজনদের হত্যা করায় আমি শুভফল দেখছি না (ন চ শ্রেযোহনু পশ্যামি—নঃ চঃ শ্রেয়ঃ অনুপশ্যামি অর্থাৎ শুভ বা কল্যাণকর কিছু দেখছি না) হে কৃষ্ণ, আমি বিজয়, রাজ্য, সুখ কিছুই চাই না।

দ্বিতীয় অধ্যায় (সাংখ্য যোগ)—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। সুতরাং শ্রীভগবানের বিবেচনায় অর্জুনের এই মোহ 'অনার্যজনোচিত স্বর্গহানিকর অকীর্তিকর ও পৌরুষহীনতা'। সুতরাং তিনি অর্জুনকে হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার জন্য উপদেশ দিতে শুরু করলেন। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান বিনাশশীল দেহ, অবিনাশী আত্মা, নিষ্কাম কর্ম, স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিরপ্রজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষের লক্ষণ ও মহিমা, কর্মে সমত্ব বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দমন, অহঙ্কাব, কামনা, মমতা, ত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতায কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটি যোগ প্রাধান্য পেয়েছে ও প্রসঙ্গক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি সত্ত্ব-বজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণ এবং মোহ মোক্ষ ইত্যাদিব বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সাংখ্যযোগে ঐগুলি নানাস্থানে বার বাব সূত্রের মত ঘুবে ফিরে উল্লেখ করায় এই অধ্যায়কে 'গীতার্থ সূত্র' ও বলা হয়। এই অধ্যায়ের মূল আলোচিত বিষয় নিরীশ্বরবাদী আত্মতত্ত্ব বা সাংখ্যদর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়েব শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

' ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নয়ৎ
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহং পুরানো
ন হণ্যতে হন্যমানে শরীরে
—২০

এই (আত্মা) কোনকালে জন্মান বা মারাও যান না। ইনি জন্মে প্রকাশিত হন না (নয়ং ভূত্বা ভবিতা বা নঃ ভূয়ঃ অর্থাৎ ইনি জাত বা উৎপন্ন হয়ে পরে অস্তিত্ব লাভ করেন এমন নয়) ইনি জন্মরহিত নিত্য শাশ্বত ও চির পুরাতন। শরীরের বিনাশ হলেও ইনি নষ্ট হন না।

তৃতীয় অধ্যায় (কর্মযোগ)—এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে কর্ম, জ্ঞান, বিশেষতঃ নিষ্কাম বা আসক্তিহীন কর্ম, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ, কম, আচরণ ও জ্ঞান আহরণে আত্মতৃপ্তি, স্বধর্ম ও পরধর্ম, কর্মে কামের (কামনা) প্রভাব ও কাম নিধন, ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তারিত উপদেশ দিয়েছেন। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় কর্মরহস্য, কর্মমাহাত্ম্য ও কর্মপ্রেরণা।

তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

তস্মাদসক্ত সততং কার্যং কর্ম সমাচর
অসক্তো হ্যাচরণ্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষ

—১৯

সেইজন্য নিরাসক্ত থেকে সবসময় কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর কেননা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে পুরুষ (মানুষ) পরমপদ লাভ করেন (পরমাপ্নোতি—পরম, আপ্নোতি অর্থাৎ পরমাত্মা বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন)।

চতুর্থ অধ্যায় (জ্ঞানযোগ)—এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান জ্ঞান মহিমা, সগুণ ঈশ্বরের প্রভাব, নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত কর্ম, অকর্ম ও নানাবিধ কর্ম, যোগী পুরুষের আচরণ ও মহিমা, সনাতন যোগধর্ম, অবতার তত্ত্ব, পুনর্জন্মবাদ, চতুর্বণ বিভাগ, বিবিধ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। জ্ঞান ও কর্ম বিশেষতঃ নিষ্কাম কর্ম মহিমা এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভাবত
অভ্যূত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে

—৭/৮

হে ভারত (ভরত বংশীয়—অর্জুন), যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উদ্ভব হয় (অভ্যূৎথানম ধর্মস্য - অভ্যুত্থানম্, অধর্মস্য) তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুস্কৃতীদের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের (পুনঃপ্রতিষ্ঠা) জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ (আবির্ভূত) হই (সম্ভবামি যুগে যুগে)।

পঞ্চম অধ্যায় (সন্ন্যাস যোগ)—নিষ্কামকর্ম, সন্ন্যাস, সাংখ্যযোগ, কর্মপ্রকৃতি, কর্তৃত্বাভিমান, শুদ্ধা ভক্তি, নির্মল জ্ঞান ও ধ্যানযোগ, সর্বভূতে সমত্ত্বদর্শন, যোগনিষ্ঠা, নির্লিপ্ত আত্মা, আত্মস্বরূপ ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান কর্তৃক ব্যক্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় তুলনামূলক বিচারে সন্ন্যাস ও কর্মযোগ।

পঞ্চম অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে

—৭

যিনি যোগযুক্ত, বিশুদ্ধ আত্মা, আত্মজয়ী, জিতেন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়জয়ী), সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম (সর্বভূতাত্মভূতাত্মা—সর্বেষাং ভূতানাং আত্মভূতঃ আত্মাঃ অর্থাৎ যিনি একই আত্মাকে সর্বভূতে এবং নিজের মধ্যেও অনুভব করেছেন) তিনি কর্ম করেও কর্মে আবদ্ধ (লিপ্ত) হন না।

ষষ্ঠ অধ্যায় (অভ্যাস যোগ)—এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান নিষ্কাম কর্ম, যোগযুক্ত পুরুষের লক্ষণ, আত্মস্বাতন্ত্র্য, আত্মউদ্ধার, সর্বভূতে আত্মদর্শন, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনঃ সংযমের উপায়, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গযোগ, যোগভ্রষ্ট পুরুষের গতি, যোগীর মহিমা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ধ্যান ও সমাধির বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোকঃ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহম চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে
—৩৫

হে মহাবাহো (মহাবীর অর্জুন), মন যে দুর্নিবার এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই কিন্তু হে কৌন্তেয় (কুন্তীতনয়—অর্জুন), অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাকে বশে আনা সম্ভব।

সপ্তম অধ্যায় (জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ)—এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ভগবানের স্বরূপ, জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ, সর্বভূতে ঈশ্বর উপলব্ধি, ত্রিগুণাত্মিকা ও ঈশ্বরের দুস্তরা মায়া, ভক্তের শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি বিষয় ব্যক্ত করেছেন। মূলতঃ জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ ও বিজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই স্বরূপ অনুভবের এই সম্পর্কেই এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোকঃ

দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব য প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে
—১৪

আমার এই ত্রিগুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) দৈবী (অলৌকিক) মায়া খুবই দুস্তরা। যাঁরা আমাকে উপাসনা করেন কেবলমাত্র তাঁরাই এই মায়া হতে উত্তীর্ণ হন। (মায়ামেতাং তরন্তি তে—মায়াম, এতাম, তরন্তি, তে, অর্থাৎ এই মায়াকে অতিক্রম করেন বা 'তরে' যান)।

অষ্টম অধ্যায় (অক্ষর ব্রহ্ম যোগ)—এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান অক্ষর ব্রহ্ম, অধ্যাত্মকর্ম, ভক্তি, অধিযজ্ঞ, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এখানে পরমেশ্বরের স্বরূপ, ক্ষর ও অক্ষর মূলতঃ আলোচিত হয়েছে।

বেদেসু যজ্ঞেসু তপঃ সু চৈব
দানেসু যৎ পূণ্যফলং প্রদিষ্টম্
অত্যাতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদাম্
—২৮

বেদপাঠ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ইত্যাদিতে যে পুণ্যফল কথিত আছে সেই রহস্য জানলে (যিনি জানেন তিনি) যোগী ঐ সমস্ত অতিক্রম করে সনাতন পরম স্থান প্রাপ্ত হন (যোগী পরং স্থান মুপৈতি চাদ্যম্—যোগী, পরম, স্থানম্, উপৈতি, চ, আদ্যম্)।

নবম অধ্যায় (রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ)—এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান প্রভাব সহ জ্ঞান, জগৎ উৎপত্তি, সর্বাত্মরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ, সকাম ও নিষ্কাম সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রধানত পরমেশ্বরের রূপ ও ভক্তিমার্গের বিষয় এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোকঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ
—৩৪

আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসনা কর, আমাকে নমস্কার কর। এইভাবে আমার প্রতি শরণাগত ও আমার সঙ্গে একাত্ম হলে (যুক্ত্বৈবমাত্মানং— যুক্ত্বা, এবম্, আত্মানম্) আমাকেই পাবে।

দশম অধ্যায় (বিভূতি যোগ)— এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান কর্তৃক সবিস্তারে স্বীয় বিভূতি সমূহ ও পরাভক্তি, পরাবিদ্যা, ফল ও প্রভাব এবং পরমেশ্বরের ব্যক্ত রূপ কথিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের মূলকথা শ্রীভগবানের বিভূতি বিস্তার। সেই প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা, বিষ্ণুনামক আদিত্য, কিরণমালী সূর্য, সামবেদ, মনরূপ ইন্দ্রিয়, হিমালয় পর্বত, অশ্বত্থ বৃক্ষ, বাসুকি নামক সর্প, সর্বগ্রাসী কাল, পশুরাজ সিংহ, গরুড় পক্ষী, গায়ত্রী মন্ত্র, বসন্ত ঋতু, সত্ত্বগুণ, বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ, পাণ্ডববংশীয় ধনঞ্জয় ইত্যাদি রূপে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন।

দশম অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ—২০

হে গুড়াকেশ (নিদ্রাজয়ী — অর্জুন), আমি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত (সর্বভূতাশয়স্থিত) আত্মা এবং আমিই ভূতগণের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় স্বরূপ (অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ —অহম্ আদি চ, মধ্যম চ, ভূতানাম্ অন্তঃ, এব, চ)।

একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপ দর্শন যোগ)— এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ অর্থাৎ স্বীয় ঐশ্বরিক অলৌকিক দিব্য রূপ দেখালেন। যেহেতু জীবাত্মা অর্জুনের পক্ষে চর্মচক্ষে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐ সর্বোত্তম পরম গুহ্য রূপ দর্শন সম্ভব ছিলো না সে জন্য শ্রীভগবান অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করলেন। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান কর্তৃক বিশ্বরূপ ও কালস্বরূপের ব্যাখ্যা, অর্জুনকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দান, বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত, চমৎকৃত অর্জুনের স্তুতি ও ক্ষমাপ্রার্থনা, সঞ্জয় কৃত শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনা,

ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে কথিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের মূল বিষয় শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ ও গীতার্থ সারগর্ভ উপদেশ।

একাদশ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণতস্ত্বমস্য
বিশ্বস্য পরং নিধানম্
বেত্তাসি বেদঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমানন্তরূপ

—৩৮

তুমিই আদিদেব, সনাতন পুরুষ, এই জগতের পরম আশ্রয়, তুমি জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়বস্তু (বেত্তাসি বেদঞ্চ— বেতা, অসি, বেদ্যম, চ) এবং পরম ধাম, তুমি অনন্তরূপ, বিশ্বব্যাপী বিরাজমান (ত্বয়া ততং বিশ্বমানন্তরূপ অর্থাৎ হে অনন্তরূপ তোমার দ্বারা বিশ্ব পরিপূর্ণ)।

দ্বাদশ অধ্যায় (ভক্তিযোগ)— এই অধ্যায়ে সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ সাধনা, ও ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও লক্ষণ, ভক্তিমার্গ ও ভক্তিযুক্ত কর্ম ও ব্যক্ত উপাসনা পদ্ধতি। কর্মফল ত্যাগের শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শ্রীভগবান বিশদ আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে
শ্রদ্ধেয়া পরয়োপেতাতে মে যুক্ততমা মতাঃ

— ২

ময্য যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে একাগ্র মনে, আবেশ্য, মনঃ অর্থাৎ আমাতে মন একাগ্র করে নিরন্তর আমাতে যুক্তঃ, (উত্তমা, অর্থাৎ যোগীগণের মধ্যেও অতি উত্তম)।

ত্রয়োদশ অধ্যায় (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ)— এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান জ্ঞান ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞান, আত্মা ও তাঁর নির্লিপ্ততা, বহুর মধ্যে একত্ব দর্শন সম্বন্ধে বলেছেন। এই অধ্যায়ে মূলতঃ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

প্রকৃতি পুরুষশ্চৈব বিদ্ব্যনাদী উভবপি
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্

—২

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি এবং বিকার (রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি) ও গুণ (ত্রিগুণাত্মক পদার্থ) প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন জানবে (বিদ্ধিপ্রকৃতি সম্ভবান্ বিদ্ধি—, প্রকৃতি, সম্ভবান্)।

চতুর্দশ অধ্যায় (গুণত্রয় বিভাগ যোগ)—এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান কর্তৃক আলোচিত হয়েছে জ্ঞান-মহিমা, পরাভক্তি, প্রকৃতি ও পুরুষ হতে জগৎ উৎপত্তি তথা সৃষ্টি-রহস্য এবং ত্রিগুণের বন্ধন, স্বভাব, ও গুণত্রয়ের ফল, ত্রিগুণাতীত হবার উপায় ও লক্ষণ। এই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ।

চতুর্দশ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি পুণ্যঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
নিরবন্ধন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্
—৫

হে মহাবাহো (মহাবলশালী—অর্জুন), সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ অবিনাশী আত্মাকে দেহ মধ্যে (দেহে দেহিনমব্যয়ম্—দেহে, দেহিনম্, অব্যয়ম্) আবদ্ধ করে রাখে।

পঞ্চদশ অধ্যায় (দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ)—দৈবী ও আসুরী সম্পদ ও ফল, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মত্যাগ ও শাস্ত্রঅনুকূল আচরণের প্রেরণা, নরকের ত্রিবিধ দ্বার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীভগবান এই অধ্যায়ে অর্জুনকে জ্ঞানদান করেছেন। এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ দৈব ও আসুরী সম্পদ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত।

ষোড়শ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতং ত্রয়ং ত্যজেৎ
—২১

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন নরকের দ্বার স্বরূপ। এরা আত্মার বিনাশকারী (নাশনমাত্মনঃ—নাশনম্, আত্মনঃ)। সেই জন্য এই ত্রয়ীকে ত্যাগ করবে (ত্রয়ং ত্যজেৎ)।

সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ)—এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রানুষ্ঠান, সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণের আহার, যজ্ঞ, তপস্যা, ও দানের ফলাফল, ওঁ তৎ সৎ শব্দ প্রয়োগের ব্যাখ্যা, ব্রহ্মনির্দেশ, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রদ্ধার স্বরূপ ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের কথাই বলা হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতাঃ
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরাঃ

ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি ব্রহ্মবাচক নাম হিসেবে নির্দিষ্ট (নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতিঃ—নির্দেশ্য, ব্রহ্মণঃ, ত্রিবিধঃ, স্মৃত অর্থাৎ এই তিন প্রকার ব্রহ্মের নাম কথিত আছে) এই নির্দেশ থেকেই প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে।

অষ্টাদশ অধ্যায় (মোক্ষযোগ)—এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিষয়, কর্মে সিদ্ধি, সাংখ্যসিদ্ধান্ত, গুণত্রয় অনুসারে জ্ঞান, কর্ম ইত্যাদির ভেদাভেদ, ফলের সঙ্গে নিষ্ঠা, জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম, গীতা মাহাত্ম্য, কর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ, মোক্ষলাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি, সর্বধর্মত্যাগ এবং ঈশ্বরে শরণাগতি ইত্যাদি সবিস্তারে ব্যক্ত করেছেন। এই অধ্যায়ে মূলতঃ সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সার ত্যাগ ও মোক্ষের বিষয় বিশদভাবে অন্তর্লক্ষিত হয়েছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্লোক ঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ
—৬৬

সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে শুধুমাত্র আমারই শরণ নাও (মামেকং শরণং ব্রজ—মাম্, একম্, শরণম্, ব্রজ অর্থাৎ কেবল এক আমার শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ কর) তুমি শোক কোরো না, আমি তোমাকে সর্বপাপ হতে মুক্ত করব।

ডাইনি

"উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার ৫ নম্বর পতিরাজপুর পঞ্চায়েতে ৬০ বছরের আদিবাসী মহিলা সাঁইলি টুডুকে সম্প্রতি ডাইনি সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ঘটনার আটদিন পরেও অপরাধীরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় জেলা জুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ইটাহার থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরে পতিরাজপুর মৌজার শ্রীধরপুর গ্রামে এখনও থমথমে ভাব। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে শনিবার রাত দশটা নাগাদ গ্রাম্য বিচারে ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত সাঁইলি টুডু মাত্র দু'শো টাকা খেসারত দিতে না পারায় নৃশংস ভাবে খুন হন। এই প্রতিবেদককে প্রথমে পুলিশের লোক বলে সন্দেহ করলেও পরবর্তী সময়ে সন্তর্পণে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে গ্রামবাসীরা সমস্ত কথাই জানিয়েছেন। নাম গোপন রাখার শর্তে গ্রামবাসীরা বলেন, সাঁইলি টুডুর মেয়ের নাতি তথা কবিরাজ মার্ডির এক বছরের বাচ্চা দীর্ঘ একমাস ধরে জ্বরে ভুগছিল। অসুখ না সারায় তারা মাহাতোর (জানগুরু) কাছে যায়। মাহাতো বিধান দেয় কবিরাজ মার্ডির শাশুড়ি ডাইনি। সে যতক্ষণ গ্রামে আছে ততদিন বাচ্চা সুস্থ হবে না। দ্রুত তাকে হত্যা করতে না পারলে গ্রামের কোন মানুষ আর বেঁচে থাকবে না। জানগুরুর নির্দেশকে দৈববাণী মনে করে আদিবাসী সমাজে জরুরী বৈঠক বসে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় ডাইনিকে হত্যা করা হবে না যদি সে ছ'শো টাকা খেসারত হিসেবে জরিমানা দেয়। এই সিদ্ধান্তের পর কবিরাজ মার্ডি বাচ্চাকে রেখে নিজের স্ত্রীকে ডাইনির মেয়ে বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

গ্রামবাসীরা জানান, ঘটনার দিন সকালে গ্রাম্য সালিশীতে সাঁইলি দেবী ৪০০ টাকা জরিমানা হিসেবে দেন। বাকী ২০০ টাকা জরিমানা রাত ৮টায় স্থানীয় এক বাঁশ ঝাড়ের পাশে বিচারকদের হাতে তুলে দেবার কথা ছিল। অপারগ সাঁইলি দেবী কদিন সময় চেয়েছিলেন। বিচারকদের কেউ কেউ বহু টানাপোড়েনের পর মৃত্যুদণ্ড রদ করেন। তাঁকে বাড়ি ফিরতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিছু দূর যাওয়ার পর বিচারকদের সিদ্ধান্ত আচমকা পাল্টে যায় এবং তাঁরা তাকে সেই রাতেই মেরে ফেলার জন্য সচেষ্ট হয়।

সাঁইলি বাড়ি ঢোকার আগেই তাঁর জামাই কবিরাজ মার্ডি সহ আরও কয়েকজনের লাঠি ও অস্ত্রের আঘাতে তাঁকে প্রাণ দি[illegible]। গ্রামের জনৈক আদিবাসী মহিলা হত্যার বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভে[illegible] বললেন, ঘাতকবাহিনী সাঁইলির কোন অনুরোধেই কান দেয়নি। বিস্ময়ে হতবাক সাঁই[illegible]ংকার করলেও কেউ এগিয়ে আসেনি।

একুশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও কেন এই অন্ধকুসংস্কার জানতে চাইলে পাশের গ্রামের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক শিক্ষিত যুবক বলেন, এদের মনে তখন সেই জানগুরুর নির্দেশ বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল, তাই ভাবী প্রজন্মের জীবন রক্ষার তাগিদে ডাইনি হত্যা তাদের জরুরি ছিল। পঞ্চায়েত-প্রধান সমস্ত ঘটনাটি জেলা প্রশাসনকে

জানিয়েছেন বলে জানান। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি বলে শ্রীধরপুর গ্রামে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। মৃতার দুই কন্যাও ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছেন।

এক আদিবাসী গৃহবধূ জানান, যারা সাঁইলিকে হত্যা করেছে তারা প্রত্যেকেই অপেক্ষাকৃত ধনী, যার ফলে এমন দুঃসাহস তাদের পক্ষে দেখানো সম্ভব হয়েছে।"

খবরের কাগজ খুললেই এই রকম ডাইনি নিধনের সংবাদ হামেশাই চোখে পড়ে। এই জঘন্য অপরাধ কমছে তো নাই বরং উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের দুই বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এক যৌথ গবেষণাপত্রে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি এই নৃশংস প্রথা রোধে কোন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেনি। এমন কি ডাইনি নিধন বিরোধী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরাও কার্যত স্থানীয় সব রাজনৈতিক দলের ভোটবাবুদের কাছে অচ্ছুৎ। এই গবেষণা পত্রটির নাম 'আ ক্রিটিক অন উইচ হান্টিং উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ষ্টেটাস অব উইমেন ইন দ্য ট্রাইবাল সোসাইটি'। গবেষকদ্বয় বলেছেন গ্রাম্য রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত ঝগড়া থেকে সৃষ্টি হওয়া আক্রোশ মেটাতে আদিবাসী সমাজের মৌলবাদীরা সুচতুর ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন অন্ধ বিশ্বাসকে। আদিবাসী সমাজে যে সংস্কৃতির অনগ্রসরতা আছে তাকে আশ্রয় করেই জাল বিস্তার করেছে তাদের সমাজের ভিতরের মৌলবাদীরা। গত ৮৮ থেকে ৯৩ পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ডাইনি সন্দেহে খুন হয়েছেন ৫৭ জন। এতো গেল নথিবদ্ধ হিসেব। এর বাইরে ঘটনার সংখ্যা আরো অনেক বেশি। অন্ধ কুসংস্কার থেকে উঠে আসা এই বর্বর প্রথার শিকার হয়েছেন মূলতঃ মহিলারা।

আদিবাসী সমাজের মহিলা যাঁরা মন্ত্র তন্ত্র তুকতাক দিয়ে গুণিনের কাজ করেন তাঁদের সাধারণতঃ 'ডাইনি' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রচলিত ধারণা এই, ঐ জাতীয় মহিলারা 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' বা কালো যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী এবং এঁরা মানুষের ক্ষতিই করে থাকেন। এঁরা দুষ্ট যাদুবিদ্যায় পারঙ্গম হন অশুভ ও অশরীরী শক্তির কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে। এঁরা মানুষের অমঙ্গল সাধনার বিশেষ শক্তি অর্জন করেন। এঁদের অর্জিত বিদ্যাকে ডাকিনী বিদ্যা (উইচ ক্র্যাফট) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বিশিষ্ট ইংরেজ তন্ত্রগবেষক স্যার জন উডরফ তাবৎ গুপ্ত বিদ্যাকেই 'উইচ ক্র্যাফট' বলেছেন।

অবশ্য বহু উপজাতির মধ্যে এইরকম ধারণা আছে ইষ্টযাদু (হোয়াইট ম্যাজিক) ও অনিষ্ট যাদু (ব্ল্যাক ম্যাজিক) অথবা যাবতীয় যাদুকরী বিদ্যা কিংবা তন্ত্রমন্ত্র শেখা গুণিনদের উভয়কেই বেশ দক্ষ ডাইনিবিদ্যা বিশারদের অধীনে থেকে দীর্ঘদিন কাজ শিখতে হয়। এ বিদ্যা খুব কঠিন এবং কঠোর শিক্ষা ও দীর্ঘ অনুশীলন সাপেক্ষ। বিশেষ করে সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনির প্রভাব ও ডাইনিভীতি সাংঘাতিক। এদের বিশ্বাস ডাইনি মহাশক্তির অধিকারিণী এবং মন্ত্রবলে যে কোন ধরনের ক্ষতি করতে সক্ষম।

সাঁওতাল সমাজে যদি কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, কারো কোন বড় গোছের সাংসারিক বিপর্যয় হয়, কিংবা হঠাৎ কেউ যদি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় তবে এগুলি ডাইনির

কারসাজি বা যাদুটোনা বলেই মনে করা হয়। সাঁওতালদের ধারণা তাদের কোন শত্রু ডাইনি নিজের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে ও নামডাক বাড়াতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অন্যের অনিষ্ট করে থাকে।

আদিবাসী সমাজে ডাইনিদের কার্যকলাপের গতিপ্রকৃতি নিরুপণ, মূল্যায়ন ও স্বরূপ নির্ধারণ করে 'গুণিন'। প্রকৃত অর্থে এরা যাকে গুণিন বলে সে কিন্তু ডান বা ডাইনি নয়। গুণিন সাধারণতঃ মানুষের ইষ্টকারী হিসেবেই গণ্য হয়।

আদিবাসী সমাজে অনিষ্টকর কোন ঘটনা ঘটলে ওরা ছোটে গুণিনের কাছে, গুণিন যা বিধান দেয় সেটা গ্রামের মোড়লও নির্দ্বিধায় পালন করতে বাধ্য।

ডাইনিদের ঘিরে বহু বিচিত্র, অদ্ভুত, রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর ধারণা রয়েছে আদিবাসীদের মধ্যে। ডাইনি এলো চুলে অনেক সময় সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় গভীর রাত্রে চারদিকে একা ঘুরে বেড়ায়। কোন কোন ডাইনি আবার সঙ্গে মাটির প্রদীপ রাখে। ডাইনি ইচ্ছা মাত্রই চক্ষের নিমেষে রূপ বদলে কিংবা একই রূপে দূর দূরান্তে বহু জনকে একসঙ্গে দর্শন দিতে পারে। ডাইনি নিশির ডাক ডেকে বাড়ি থেকে মানুষদের বাইরে নিয়ে এসে সর্বনাশ করে।

অনাবৃষ্টি, শস্যহানি, গরুর দুধ বন্ধ, মহামারী, যাবতীয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় মানে তাবৎ অনাসৃষ্টিই যে ডাইনি করতে সক্ষম এ বিশ্বাস আদিবাসীদের মনের অনেক গভীরে শিকড় বিস্তার করে রয়েছে।

ডাইনিরা কোমরে গামছা দিয়ে একটা ঝাঁটা বেঁধে রাখে। একটা ভাঙ্গা কুলো বগলদাবা করে অতি গোপনে গভীর রাতে গুরুর কাছে তন্ত্র মন্ত্র শিক্ষা নিতে যায়। ওরা শনি, মঙ্গল ও অমাবস্যার রাত বেছে নেয়। এ ব্যাপারে তান্ত্রিকদের সঙ্গে ডাইনিদের বেশ মিল।

গুরুর ডেরায় গিয়ে ডাইনি সেই গুরুর আরাধ্য লৌকিক দেব দেবীর কাছে ফুল, বেলপাতা, সিঁদুর দিয়ে পূজো করে একটা মুরগি বলি দেয়; তারপর সেই মুরগির রক্ত মেখে শুরু করে গুরু ও চেলাচামুণ্ডাদের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য। অবশেষে সেই মুরগির মাংস হোমের আগুনে ঝলসে মদের সঙ্গে ভোজন করে। গুরু বহু দুর্বোধ্য মন্ত্র ও নানারকম ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা দেয় ডাইনিকে। এমনি করে রাতের পর রাত ডাকিনী বিদ্যা তালিম নিয়ে নিয়ে ক্রমশঃ সে দক্ষ ডাইনি হয়ে ওঠে এবং সাংঘাতিক দুষ্কর্ম সাধনেও পারদর্শিনী হয়। ডাইনি নাকি কোন দুষ্ট আত্মা বা 'বংগা'কে বশীভূত করে তাকে দিয়েই নানা রকম অকাজ কুকাজ করায়।

আবার এই ডাইনিদের শায়েস্তা করার জন্যে উপজাতিদের মধ্যে ওঝা বা গুণিন থাকে। এরা মন্ত্রবলে ডাইনির কারসাজি ধরে ফেলে এবং কাটান মন্ত্র দিয়ে কিংবা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় ডাইনি কৃত অমঙ্গল খণ্ডন করে। এই গুণিনদেরও বশীভূত 'বংগা' বা আত্মা থাকে। গুণিনরা বংগাদের সহায়তাও নেয় প্রয়োজন হ'লে।

ডাইনির উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত : আদিবাসী মেয়ে পুরুষ যখন গুণিনের কাছে যায়,

সেই গুণিন বা ওঝা আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় ডাইনি চিহ্নিত করে। এই প্রক্রিয়াকে গোনা বা গণণা বলে।

গুণিনরা একজোড়া বড় শালপাতা রেড়ি বা মহুয়ার তেলে ডুবিয়ে রাখে বেশ কিছুক্ষণ। নিজের দুটি হাতে সরষের তেল মেখে নেয়। তারপর রেড়ি বা মহুয়ার তেল থেকে শালপাতা দুটো তুলে সুর করে দুর্বোধ্য, বিচিত্র মন্ত্র পড়তে পড়তে শালপাতা দুটির উপর হাত ঘষতে থাকে। বারংবার মন্ত্রপাঠ ও হাতঘষার পর গুণিনের দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। সে পাতা দুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নাকি প্রকৃত ডাইনির প্রতিমূর্তি দেখতে পায়। তবে ডাইনির ছবি ঐ গুণিনই দেখতে পায়, আর কেউ নয়।

ব্যাস! তারপর তো ছকে বাঁধা গল্প। অমুক তল্লাটের তমুক মহিলাই ডাইনি। যাবতীয় দুষ্কর্ম সেই করেছে। অতএব জরিমানা, অল্পবয়সী মেয়ে হলে উলঙ্গ করে গ্রামে গ্রামে ঘোরানো, নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভায় নানা ধরনের শারীরিক নির্যাতন। অবশেষে নৃশংস ভাবে হত্যা।

গুণিনদের আবার কিছু কিছু সংস্কার আছে। যেমন—শূন্য পাত্র, কাঁকড়া, কচ্ছপ দেখা, আর্ত চিৎকার; এ সমস্ত ক্ষেত্রে গুণিন দেরী করে গুণ করে বা গোনে। রোগীর জন্মদিনে রোগীকে দেখতে যায় না। নিজের বা খুব নিকট জনের জন্মদিনেও কোন ক্রিয়াকলাপ করে না। গুণিনরা নিজেদের আরাধ্য দেবদেবীর উপাসনার দিন বা পূজার সময় উপবাসী থাকে ও সংযম পালন করে। যে দিন কোন সংকল্প করে সেদিন খুব শুদ্ধাচারে থাকে। অবশ্য যারা প্রকৃত গুণিন এগুলো তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ধান্ধাবাজ, ভণ্ড, স্বার্থান্বেষী গুণিন নামধারীদের কোন নিয়ম-কানুন নেই। প্রকৃত গুণিনরা বিশ্বাস করে শুদ্ধাচারে না থাকলে ও নির্দিষ্ট আচার-আচরণ পালন না করলে দেব দেবীর কৃপা পাওয়া যায় না অধিকন্তু ওঁরা রুষ্ট হন ও ক্রিয়াকলাপ নিষ্ফল হয়।

যদিও ধর্মতন্ত্র ও ডাকিনীতন্ত্র এই দুই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় তবুও অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের ক্রিয়াকলাপ মন্ত্র পূজা আচার ধরণ ধারণের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে এবং জনমানসে তান্ত্রিক ও ডাকিনী দুজনেই ক্ষতিকারক, এই রকম একটা ধারণা আছে। যদিও প্রকৃত তন্ত্র বিশ্ববাসীর কল্যাণেই উৎসর্গীকৃত। এ সম্পর্কে অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তান্ত্রিকের আরাধ্যা দেবী দক্ষিণা কালী। তবে প্রয়োজনে এরা অন্যান্য দেবদেবীদের পূজা দেয়। ডাকিনীদের আরাধ্যা পিশাচিনী নামের প্রেতাত্মা। তবে এরাও প্রয়োজনে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর উপাসনা করে।

তান্ত্রিকদের যাবতীয় মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বা শ্রুত; এর মধ্যে বেশ কিছু মন্ত্র অথর্ববেদ থেকে নেওয়া। ডাইনিদের মন্ত্র আঞ্চলিক ভাষা, বাংলা, ওড়িয়া, আদিবাসী ও কিছু কিছু সংস্কৃতর মিশ্রণে তৈরি। অদ্ভুত দুর্বোধ্য শব্দের ব্যঞ্জনা, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি খুব সহজেই গ্রামবাসীদের মনে ভয়ভীতির সঞ্চার করে। সেই ভয় থেকে খানিকটা ভক্তির উদ্ভবও হয়।

আমি বহু জায়গায় ঘুরে, নানা রকম ডাকিনী মন্ত্র, গোপন ক্রিয়াকলাপ ও অত্যাশ্চর্য

রহস্যময় শক্তির প্রকাশ দেখেছি। অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাও জেনেছি যার বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা মেলা দুষ্কর। আদিবাসী বিশেষতঃ সাঁওতালদের জীবনে 'নজর' কথাটির তাৎপর্য সাংঘাতিক ও ভয়াবহ। ডাইনির নজর ওদের জীবনে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে রয়েছে। অনেকে আবার একে বাণ মারাও বলে থাকে। এই রকম একটি বাণ মন্ত্র, ডাকিনী বিদ্যার ক্রিয়াপদ্ধতি এবং ঐ জাতীয় নজর ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে 'রক্ষা কবচ', প্রতিষেধক মন্ত্র গুণিনের কবচ তৈরি সম্পর্কে জানাচ্ছি।

ডাইনি বাণ মহাবিদ্যা (মারণ)

প্রচলিত বিশ্বাস বাণ মেরে যে কোন সুস্থ সবল মানুষকে ক্রমশঃ দুর্বল করে মেরে ফেলা যায়। এক্ষেত্রে মন্ত্রের সঙ্গে কিছু কিছু ক্রিয়াপদ্ধতির প্রয়োজন আছে। বাণ মারার জন্য আনুষঙ্গিক উপকরণ যেগুলো দরকার—চিতা থেকে তুলে আনা চেলা কাঠ, সাদা কাগজের একটা টুকরো, রোদে শুকিয়ে রাখা কিছু আতপ চাল, কিছু ছোট ছোট গোলাপ ফুল, কেরোসিন তেলের লম্ফর ভুষো দিয়ে তৈরি কালি, খাগের কলম, গোরোচনা প্রভৃতি। অমাবস্যার রাতে শ্মশানে কিংবা নির্জন প্রান্তরে ডাইনি যাকে বাণ মারবে সে ব্যক্তির নাম সাদা কাগজে ভুষো কালি দিয়ে লিখে মারণ মন্ত্র পাঠ করে কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখে। তার আগে অবশ্য খুব জাঁকজমক করে আরাধ্যা দেবীর (পিশাচিনী) পূজা সেরে নেওয়া হয়।

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যায় যে লোকটিকে বাণ মারা হয়েছে সে ক্রমশঃ দুর্বল ও জীর্ণ হতে হতে একদিন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আদিবাসী ও বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে প্রস্তুত বাণ মন্ত্রটির বাংলা অনুবাদ এই রকম ঃ

হে পিশাচিনী হে চণ্ড
আমি তোমার চরণে নিবেদন করছি
কঠিন সংযম পালন করে
ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন ভগবান সাক্ষী
তোমায় ঘটা করে পুজো দিয়েছি
ভুষো কালিতে সাদা কাগজে
যার নাম লেখা হল
তুমি অব্যর্থ বাণ চালিয়ে
ওকে হত্যা করো
হে দেবী পিশাচিনী
আমি ঐ লোকটিকে ভীষণ একটা বাণ মারব

মনে রেখো আমি ফলমূল মাছ মাংস মিষ্টি
দিয়ে তোমার সুষ্ঠু পুজো করেছি
হে আমার ভয়ঙ্কর মৃত্যুবাণ
তুমি ধাঁ করে গিয়ে ঐ ব্যক্তিটির
হৃদয় বিদ্ধ কর
বাণের আঘাতে সে যদি মাটিতে পড়েও যায়
তা হলে তার বুকে কামড় বসিয়ে
রক্তাক্ত কলেবরে সিক্ত কর
হে পিশাচিনী তোমার সিঁথিতে সিঁদুর আছে
ঐ সিঁদুরের সততা ও পবিত্রতা রাখবে তুমি
ঐ ব্যক্তিটিকে খতম করো
আর তা না হলে রাম সীতা ও অন্য দেবদেবীদের
মাথা গিলে খাও
তুমি কি জানতে চাইছ একাজ কে ঠিক করেছে
পিশাচিনী ও চণ্ড অর্থাৎ তোমরাই বহুকাল আগেই
এটা নির্ধারণ করে রেখেছো

এখানে পিশাচিনী ও চণ্ড সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। আদিবাসীদের ধারণা ডাইনি মরে গিয়ে যে প্রেতাত্মা হয় তারই নাম পিশাচিনী। এই ডাইনিরা সাধারণতঃ ডাইনি তন্ত্র সংক্রান্ত আচার আচরণ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করতে গিয়েই মারা যায়। পিশাচিনীরা সাধারণতঃ শ্মশানচারিণী, ভয়ঙ্কর উগ্র প্রকৃতির, লোকজন দেখলেই হামলা করে। এরা নানারকম জন্তু জানোয়ারের রূপ ধরতে পারে। ছোটদের ক্ষতি করার দিকেই এদের ঝোঁক বেশি। এরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারিণী। পিশাচিনীকে দিয়ে ডাইনিরা বহুরকম কার্য সিদ্ধি করে।

চণ্ডও একজাতীয় আত্মা, এদের বশীভূত করে গুণিনরা নানা কাজে লাগায়। চণ্ড ভূত আপনা থেকে তৈরি হয় না, এদের সৃষ্টি করতে হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। কোন ব্রাহ্মণ কিশোরকে দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র দেখে দেবীস্থানে বিশেষতঃ কালী মন্দিরে বিশেষ পদ্ধতিতে পূজা দিয়ে উলঙ্গ করে সর্বাঙ্গে রক্তচন্দন মাখিয়ে হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া হয়। তারপর সেই মৃত কিশোরের এক টুকরো হাড় নিয়ে মন্ত্র পাঠ করে চন্ড ভূত সৃষ্টি করা হয়। হাড় (চণ্ড) দিয়ে গুণিন অসাধ্য সাধন করতে পারে ও অন্যান্য অশরীরী আত্মার গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপের খবরাখবরও পেয়ে যায় চণ্ডের মারফত।

এইবার আদিবাসী বিশেষতঃ সাঁওতাল সমাজে যেটি বিশেষ ভীতিপ্রদ সেই 'ডাইনির নজর' বা বিষ নজর (এই নজর পড়লে নাকি নানা ধরনের ব্যাধি ও অমঙ্গল থেকে

শুরু করে মৃত্যু অবধি হতে পারে) ও নজর কাটানোর প্রতিষেধক মন্ত্রটির বঙ্গানুবাদ এই রকম ঃ

ডাইনির বিষ নজর কাটান মন্ত্র

কোথা থেকে এলি তুই
ওরে শালী
তোর নিবাস কোথায়
আমি এসেছি পূব দিক থেকে
এটা কি তুই জানিস না
আমার নিবাস পশ্চিমে
এই রক্তখাকি ডাইনি কেন এলি এখানে
এইরকম সাংঘাতিক বিপজ্জনক জায়গায়
তুই রোগীর সঙ্গে অমঙ্গলের সঙ্গে
বাঁধা পড়লি কিন্তু
এক পাও নড়তে পারবি না
এবার তোকে আমি ঝাঁটার বাড়ি মারব
এই রক্তখাকি ডাইনি তাড়াতাড়ি কেটে পড়
ওরে দুশ্চরিত্রা ডাইনি
বিষনজর দিতে গেলি কেন
তোর পয়ষট্টিটা উপপত্নী আছে
যা তাদের বিয়ে করে
বাড়ি ঘর সংসার পাত্যাগ
এটা কার নির্দেশ জানিস
প্রাচীন কালের মহাপুরুষরা
এই রকম বিধান দিয়েছেন

ডাইনির বিষ নজর কাটানো ছাড়াও গুণিন বা 'অশুভ শক্তি' প্রতিরোধ রক্ষা কবচ তৈরি করে। এই রক্ষা কবচ প্রস্তুতের উপকরণ ও নিয়মাবলী এইরকম—

'রক্ষা কবচ' তৈরির আগে গুণিনরা অশুভ শক্তি প্রতিরোধকারিণী ও গুপ্তবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্ষাকালীকে ভক্তিভরে যোড়োশোপচারে পূজা দেয়। এই পূজা হয় শনি-মঙ্গল বার ও অমাবস্যার রাত্রে। তারপর শুদ্ধাচারে মন্ত্রপাঠ করে রক্ষাকালীর মাথায় সিঁদুর তুলে নিয়ে সেই সঙ্গে গুয়া বাবলার শেকড়, শ্মশান কিংবা কবরখানার তুলসি গাছের চারা, চিতাবাঘের সামান্য একটু চামড়া, যেখানে শব দাহ করা হয় তার খুব কাছাকাছি জায়গার দুর্বা ঘাস ও এইরকম আরো কিছু উপকরণ শুকিয়ে গুঁড়ো করে

সেই গুঁড়োর খুব সামান্য অংশ তুলে নিয়ে একটি সাদা কাগজে রক্ত, আলতা বা কুমকুম দিয়ে ওঁ ক্রীং দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ লিখে সেই কাগজের মধ্যে এই গুঁড়োটুকু রেখে ভাল করে মুড়ে দিয়ে তামা বা সোনার কবচে (মাদুলি) পুরুষের ডান হাত ও মেয়েদের বাঁ হাতে কনুই -এর উপর কালীর নাম করে শনি মঙ্গলবার কিংবা অমাবস্যার রাত্রে উপবাসী থেকে কিংবা নিরামিষ আহার খেয়ে লাল সুতোয় বেঁধে শুদ্ধাচারে ধারণ করতে হয়। এই কবচ ধারণে ডাইনির বিষ নজর ও অন্যান্য অমঙ্গল দূর হয়ে যায় এবং ঐ মাদুলি যতদিন হাতে থাকে ততদিন কোন অশুভ শক্তি ক্ষতি করতে পারে না।

ডাইনির নজর লাগা বা অন্য কোন রোগ অসুখে 'জলপড়া' খুব ফলদায়ক বলে প্রচলিত ধারণা আছে।

ভোরবেলা ব্রাহ্মমুহূর্তে গুণিন এক ভাঁড় জল নিয়ে আসে কাছাকাছি পুকুর থেকে। তারপর সেই জল দীর্ঘসময় ধরে মন্ত্রপূত করে একটা ধারালো ছুরি নিয়ে জলকে যেন টুকরো টুকরো করে কাটছে এমনি ভাবে ছুরিটা ভাঁড়ের মধ্যে এদিক ওদিক চালায়। সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় করে এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে

আমি যে ছুরি দিয়ে জল কাটছি
সেটা স্বয়ং রামের ছুরি
এদিক ওদিক দুদিকেই কাটছি
এই ছুরি সমস্ত আপদ বালাই কেটে ফেলে।

মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে জলে বার বার ফুঁ দেয় গুণিন। তারপর সেই জল রোগীর গায়ে ছিটিয়ে দেয় শান্তি- জল দেবার মত কায়দায়।

এরপর রোগীকে কিছুটা জল খেতে দেওয়া হয়। জলটুকু গিলতে হয় এক নিশ্বাসে। ডাইনির নজর (বিষ নজর) ও অন্যান্য আধিব্যাধিতে এই জলপড়া নাকি মৃতসঞ্জীবনীর মত মহৌষধ। জল গেলা হয়ে গেলে রোগীর মাথায় ফুঁ দিয়ে গুণিন সুর করে মন্ত্র বলে ঃ

ওরে জল জল জল
তুই গঙ্গার জল
তোর অনেক গুণ
তুই খুব ফলদায়ী
এই জল মহৌষধ
রোগীর গলায় ঢুকলেই
উবে যায় সমস্ত বিষ

কিছু কিছু দুষ্ট মন্ত্র জানা, মানুষের অনিষ্টকারিণী ডাইনি আছে ঠিকই কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বার্থান্বেষী বদমাইশেরা নিজেদের ধান্ধা চরিতার্থ করতে ও কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেমন—ধন সম্পত্তি, টাকা পয়সা, জমি জমা, ইত্যাদি হাতিয়ে নিতে এবং মেয়েদের ভোগ করার ইচ্ছেয় আর সে উদ্দেশ্য সফল না হলে আক্রোশে চক্রান্ত করে ওদের

ডাইনি অপবাদ দিয়ে সর্বনাশ করে। আমি এ ধরনের অনেক ঘটনার কথা জানি। তার মধ্যে একটির উল্লেখ করছি এখানে।

কিশোরী ডবগা মেয়ে ঝুমরি টুডুর দিকে নজর পড়েছিল গ্রামের প্রায় বৃদ্ধ মোড়লের। সে নানা ভাবে ঝুমরির রূপযৌবন ভোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল চেলা চামুণ্ডাদের সহায়তায়। মেয়েটি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও খুব সাহসী। মোড়ল ও তার চেলারা ঝুমরিকে নানা ভাবে বিরক্ত করেও বিশেষ বাগে আনতে পারছিল না।

ঝুমরির লেখাপড়ায় খুব আগ্রহ। পাশের গ্রামের স্কুলে সে পড়ত আর এক শিক্ষকের বাড়িতেও প্রাইভেট ক্লাস করতে যেত। সে জন্য তার ঘরে ফিরতে প্রায়ই রাত হত।

মোড়ল ঝুমরিকে ভোগ করতে না পেরে রেগে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে সুচতুর কৌশলে চেলাদের দিয়ে চারদিকে রটিয়ে দিল ঝুমরি ডাইনি বিদ্যা শিখতে যায় গুপ্ত স্থানে।

এদিকে গ্রামে আন্ত্রিক জাতীয় এক ধরনের পেটের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। মোড়ল এই সুবর্ণ সুযোগটি ছাড়ল না। মোড়লের চেলারা জনে জনে প্রচার করে দিল এটা ঝুমরিরই কারসাজি। তার ডাইনি বিদ্যার কেরামতি।

এটা প্রমাণ করতে মোড়ল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা গ্রামের বিখ্যাত গুণিনকে ভয় দেখিয়ে ও প্রলোভন দিয়ে আগে থেকেই হাত করে রেখেছিল।

পাঁচ গাঁ উজাড় করা ভীড়ের মধ্যে গুণিন তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় ঝুমরিকে ডাইনি চিহ্নিত করে ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে দক্ষ অভিনয় দেখিয়ে সরে পড়ল।

এবার গণ আদালতের বিচারে ঝুমরিকে ন্যাংটো করে, চুলের মুঠি ধরে হাটে বাজারে ও প্রকাশ্য জনবহুল স্থানে ঘোরানো হল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তার সঙ্গে চলল গণধোলাই। যৌনাঙ্গে কঞ্চির খোঁচা ও লাঠি পেটা। মেয়েটা শেষ হয়ে যাবার পরও ওর দেহটাকে বীভৎস ভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল।

তারপর 'ডাইনি নিধন' মহৎ কার্যটি সমাধা করে উৎফুল্ল নরকের কীটদের রাত ভরে পান ভোজন ও উৎসব চলেছিল।

নাম ধরায়া দো

প্রণাম করতে যেতেই ধম্‌কে উঠলেন প্রেমানন্দ মহারাজ "বিধর্মীর প্রণাম আমি নিই না।"

আমি তো হতবাক। মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। "তোমার যদি অত মুসলমান প্রীতি আর হিন্দু বিদ্বেষ তুমি বরং...কেটে নেড়ে হয়ে যাও" বললেন প্রেমানন্দজী, ...অশ্লীল শব্দটি আর লিখলাম না। 'নেড়ে' অর্থে মুসলমান হওয়ার কথা উনি বলছেন বুঝতে অসুবিধে হলো না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আগে যে সমস্ত হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতো বা করতে বাধ্য হতো (কনভার্টেড) তাদের মস্তক মুণ্ডনের রীতি ছিলো। সেই ন্যাড়া হওয়া থেকেই নেড়ে শব্দটি এসেছে বলেই মনে হয়।

"এই নেড়েরা আমাদের সর্বনাশ করেছে, ইতিহাস দেখো...হিন্দুদের ওপর যুগ যুগ ধরে কি জঘন্য অত্যাচার ওরা চালিয়েছে। দেশটাকে ভাগ করেছে ধর্মের দোহাই দিয়ে...পাকিস্থানে হিন্দুরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছে। বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কয়েক লক্ষ হিন্দুর প্রাণ, কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। হিন্দুরা বার বার প্রাণভয়ে নিজেদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দু মেয়েদের ইজ্জৎ সাংঘাতিক ভাবে কেড়ে নিয়েছে ওরা, মান সম্ভ্রম সমস্ত ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে ঐ মুসলিম নরপশুগুলো। এইতো সেদিন বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা নিয়ে কি নক্কারজনক নিরপরাধ হিন্দু নির্যাতন হয়ে গেলো বাংলাদেশে। আর তুমি ঐ বদমায়েসদের পক্ষ নিয়ে কলম ধরেছো! এরা এদেশেও আমাদের বুকের ওপর চেপে বসে আমাদের মানে হিন্দুদেরই দাড়ি ওপড়াচ্ছে তবুও তোমাদের চৈতন্য হয় না, এবার ওরা ভারতকে আর একটা মুসলিম কাণ্ট্রি বানিয়ে তোমাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে।"

ব্যাপারটা এতক্ষণে বোধগম্য হল। আমাদের "দেহ মন আত্মা" পত্রিকায় সম্প্রতি "তসলিমাও বাড়াবাড়ি করছেন" এই শিরোনামে একটা সম্পাদকীয় লিখেছি। সেই লেখাটার জন্যই ওঁর এই ক্ষোভ। অথচ শুনেছিলাম প্রেমানন্দ স্বামী ধর্ম, বর্ণ, জাতপাতের উর্ধ্বে উদারচেতা সন্ন্যাসী। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। মনে হলো উনি কট্টর বা গোঁড়া হিন্দু মৌলবাদী ও মুসলমান বিদ্বেষী।

কিন্তু যে লেখাটার জন্য ওঁর এই দারুণ ক্ষোভ সেখানে কিন্তু আমার কোনরকম মুসলমান প্রীতি বা হিন্দুবিদ্বেষ প্রতিফলিত হয়নি। লেখাটি এখানে হুবহু তুলে দিলাম।

ভারতীয় উপমহাদেশ অঞ্চলে এখন ধর্ম নিয়ে ফাটকা খেলা চলছে। এখানকার দুই প্রধান ধর্মাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পরাধীন ভারতে বিদেশী বণিক ব্রিটিশ নির্বিঘ্নে রাজত্ব করে গেছে। পরিবর্তে রেখে গেছে এই মহান ধর্ম সম্প্রদায়গুলির

মধ্যে বিদ্বেষের বীজ যা আজ ডালপালা ছড়িয়ে মস্তবড় বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। ধর্মের নামে দেশ ভাগ হয়েছে। এখনও ধর্মের নামেই সবচেয়ে বেশি হানাহানি হয় এবং ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

ঈশ্বর বা আল্লা এই দুই অলীক কল্পনাকে হাতিয়ার করে বিবেক বন্ধক রেখে স্বার্থান্বেষীরাও এখন ধর্মবিশ্বাসের জিগির তুলে কার্যসিদ্ধি করে চলেছে। বর্তমানে অবস্থা আরো ঘোরালো হয়েছে। কোন ধর্ম বা ধর্মীয় মহাপুরুষ কখনও অন্য কোন ধর্মকে ছোট করতে বা আঘাত দিতে শেখায়নি। প্রত্যেক ধর্মের মূলমন্ত্র এক এবং তা হলো প্রেম, শ্রদ্ধা ও ঐক্য।

কিন্তু অধুনা কয়েকটি রাজনৈতিক দল, কয়েকটি অন্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং কিছু অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিত্ব ধর্মকে নিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা শুরু করেছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

এই মুহূর্তে এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ও তসলিমা নাসরিনের কথা মনে আসতে বাধ্য। বাংলাদেশে এখন তিন কন্যার 'ত্রহস্পর্শ' যোগ চলছে। দুই রাজনৈতিক বেগমের চুলোচুলিতে ব্যতিব্যস্ত সমস্যাসঙ্কুল দেশটিতে এক 'তেজস্বিনী' মহিলা লেখক তসলিমা নাসরিন মুসলিম সেন্টিমেন্টের দুর্বলতম স্থানটিতে ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে বিষাক্ত ঘা করে তুলছেন।

বিশ্বের তাবৎ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মুসলমানেরাই ধর্মবিষয়ে সর্বাধিক স্পর্শকাতর। তসলিমার তথাকথিত মুসলিম বিদ্বেষ ও 'হিন্দু প্রীতি'তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বাংলাদেশের নিরীহ হিন্দুরাই। আর এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে মৌলবাদী মুসলিম গোষ্ঠীসমূহ।

তসলিমার আদর্শ হচ্ছেন আর এক বিতর্কিত মুসলিম লেখক সলমন রুশদি। গুরুর মত শিষ্যাও এখন ভয়ে আত্মগোপন করেছেন। তফাৎটা এই রুশদি কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রাণভিক্ষা চেয়েছেন কিন্তু তসলিমা এখনও অনড়।

এঁরা কেউই উঁচুদরের সাহিত্যস্রষ্টা বা সাহিত্যিক নন। রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' কিংবা তসলিমার 'লজ্জা' কোনটাই উচ্চমানের সাহিত্যকীর্তির দাবি করতে পারে না। তবে তুলনামূলক বিচারে রুশদির বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ও কলমের ধার বেশি। তসলিমার লেখায় অবশ্যই নারীমুক্তি আন্দোলনের স্বপক্ষে ও পুরুষদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রগতিবাদী বলিষ্ঠ বক্তব্য ও জেহাদ আছে যা নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয় কিন্তু ওঁর লেখায় চাতুর্য, চমক ও চালাকির প্রাধান্যই বেশি।

রুশদি ও তসলিমা দুজনেরই উদ্দেশ্য মুসলিম ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে, গণ্ডগোল পাকিয়ে রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হওয়া। সে অর্থে দুজনেই সফল। একজন লেখকের যদি সম্যক প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও অন্যান্য গুণাবলী না থাকে তখন সে যৌনতা, রাজনীতি ও ধর্মকে হাতিয়ার করে নিজেকে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরতে চায়। এক্ষেত্রে যৌনতা বা রাজনীতিকে উপজীব্য করে সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন আছে, সুতরাং ধর্মের হাত ধরে এবং একজনের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে নাম কেনাটাই সবচেয়ে সহজতম পথ। রুশদি ও তসলিমা সেই সোজা পথটাই বেছে নিয়েছেন।

মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে বিতর্কিত লেখা ছাড়াও মাঝে মধ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও

অনুষ্ঠানে স্বধর্ম সম্পর্কে ওঁদের দায়িত্বহীন আলগা বক্তব্য পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। ওঁরা এটাই চেয়েছিলেন। আবার মজার ব্যাপার, প্যাঁচে পড়ে—এটা বলিনি, সেটা বলিনি, কাগজের লোকেরা আমাদের বক্তব্য বিকৃত করেছে এমনি আগডুম বাগডুম বকে নিজেদের হাত ধুয়ে ফেলতেও এঁরা তৎপর।

কলকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকে তসলিমার সাম্প্রতিক একটি বিবৃতি মুসলমান মৌলবাদীদের উত্তেজিত করে তুলেছে। উনি নাকি মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'কোর-আন-শরিফ'-এর আমূল পরিবর্তন চেয়েছেন।

কোন ধর্মগ্রন্থই চিরকালীন বেদবাক্য নয়। কোরান রচিত হয়েছে কম বেশি দেড় হাজার বছর আগে। তেমনি হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতার রচনাকাল আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঐ জাতীয় পূজা গ্রন্থের যাবতীয় বক্তব্য ও উপদেশাবলী নতমস্তকে মেনে নিতে হবে এমন দিব্যি কেউ দেয় নি। ঐ জাতীয় ধর্মপুস্তকের সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবতে গেলে দেশ, কাল, পাত্র, জাতি, সমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। ঐ সমস্ত ধর্মপুস্তকের উপদেশ, নিয়মাবলী ও বক্তব্য ইত্যাদির তৎকালীন প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিলো, এখন নাও থাকতে পারে সুতরাং ঐ সমস্ত নিযে অত মাথাব্যথারই বা কি আছে কিংবা আমি নতুন করে গীতা-কোরান লিখব এ আবার কি রকম আবদার? এই জাতীয় মন্তব্যে যে কেউ ধর্মবিশ্বাসে আঘাত পাবেন তা তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন। শুধু নির্বিকার থাকবেন ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিরা।

তবে 'তসলিমার মুণ্ডু চাই' বলে বাংলাদেশী মুসলমান মৌলবাদীদের উদ্দাম নৃত্য যেমন নিন্দনীয় তেমনি আবার তসলিমার বিবৃতিও খুব একটা নিরীহ নয়। সেই জন্য দেখা গেল তসলিমার স্বজাতি বেশ কিছু বন্ধুও অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়েছেন।

ধর্ম পুস্তক মাত্রই পবিত্র। তাতে আমার বিশ্বাস থাক বা না থাক আমি কেন তাকে হেয় করতে যাব নিজ স্বার্থসিদ্ধির ধান্ধায়।

আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন প্রেমানন্দ স্বামী। নির্মোহ, উদাসীন দৃষ্টি, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "তুমি বোধহয় ভাবছ, আমি গোঁড়া হিন্দু ও কট্টর মৌলবাদী। কিন্তু তা নয়, কোন ধর্মকেই আমি ছোট বলে ভাবি না। ধর্ম কথাটি এসেছে ধৃ ধাতু থেকে যার অর্থ ধারণ করা...যাই হোক ধর্মের উৎপত্তির ফিরিস্তি দিতে চাই না আর সেটা তুমি জানো মনে হয়। দেশ, কাল, জাতি, সমাজ ইত্যাদি নানা কিছু চিন্তা ভাবনা করে ধর্ম ও ঈশ্বরের সৃষ্টি, প্রত্যেকটি ধর্মই নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, কেউ ছোট বড় নয়, আর ঈশ্বর, আল্লা যাই বল আসলে পরব্রহ্ম নিরাকার। মানুষই নিজের কল্পনার রঙে তাঁর নানারকম রূপ দিয়েছে। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় যার যা ভালো লাগে এইরকম নাম দিয়েছে তাঁর...ঐ যে একটা গান আছে—রাম রহিম এক হ্যায় নাম ধরায়া দো...যাই হোক যে কোন ধর্ম, ধর্মীয় মহাপুরুষ বা প্রফেট প্রত্যেককে ভাল বলতে বলেছেন, কাউকে ঘৃণা করতে নিষেধ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের বাণীর মূলমন্ত্র

সেই ঐক্য ও প্রেমের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত...”

এইবার প্রেমানন্দ স্বামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ধর্মীয় মনীষী বা ঈশ্বরকল্প পুরুষের বাণীর কিছু কিছু অংশ বললেন যেমনঃ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—যত মত তত পথ। ভাব বা অভাব দুইই পথ। সবাই সেই ঈশ্বরকেই ডাকছে তা যে কোন ধর্মই হোক বা পথই হোক। কোন ধর্ম বা মতকে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়।

হজরত মহম্মদ —সমস্ত মানুষ মিলিয়ে একটা জাতিবিশেষ। মানুষ মাত্রেই সোনা রূপোর খনি তবে যে প্রত্যেককে ভালবাসে, সকলের কল্যাণ করে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ।

যীশুখ্রীষ্ট—মানুষকে ভালবাসো। এটাই একমাত্র মুক্তির পথ। শত্রুকেও ভালবাসা দিতে হবে।

প্রকৃত মানুষ হতে গেলে দরকার প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর সত্যের প্রতি নিষ্ঠা।

ভগবান বুদ্ধ—ক্রোধকে জয় করবে ক্রোধমুক্ত হয়ে। অমঙ্গলকে জয় করবে মঙ্গল দিয়ে, কৃপণকে জয় করবে দান করে আর সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করবে।

গুরু নানক—প্রতিটি মানুষকে সমান জ্ঞানই হলো ধর্ম। ঈশ্বরকে ডাকতে গেলে মানুষকে ভালবাসতে হবে। মন্দির মসজিদের কোন প্রয়োজন নেই।

কবীর—ভগবানের বাস মানুষের মধ্যে, মন্দির মসজিদে নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ—জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রেমানন্দ স্বামী বললেন—সমস্ত ধর্মের মূলমন্ত্র প্রেম। সুতরাং আমি কোন ধর্মকে অবজ্ঞা করব কেন? আমার ক্ষোভ ঐ মানুষগুলোর বিরুদ্ধে যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ধান্ধায় ধর্মের দোহাই দিয়ে শয়তানি করে চলেছে। আমাদের দেশের প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ ঢুকিয়েছে ব্রিটিশ বেনে। কেন তারা এটা করেছে তার কারণ তোমার অজানা নয়। আর বর্তমানে রাজনীতির মধ্যে সুচতুর কৌশলে সূক্ষ্ম খল বুদ্ধিতে কারা ধর্মকে ঢুকিয়েছে তাও তুমি জানো। একটা কথা, বিশ্বে যত রক্তপাত ও হানাহানি হয়েছে তার বেশির ভাগই ধর্মকেই কেন্দ্র করে। এই মূর্খতা কমতির কোন লক্ষণ তো নেই বরং দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথাই ভেবে দ্যাখো না, অথচ এই দুই মহান ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখো মূল সুর কিন্তু এক। এ ব্যাপারে আমি পর্বত পরিমাণ উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু দুটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থের কিছু কিছু অংশের উল্লেখ করছি। খুব মন দিয়ে শোনো। এই উপমহাদেশের প্রধান দুটি ধর্ম, হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দুদের কাছে শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও মুসলমানদের কোর-আন-শরীফ অত্যন্ত পবিত্র ও স্বয়ং ঈশ্বর বা আল্লার মুখনিঃসৃত বাণী স্বরূপ। পুস্তক দুটি দুই সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এদের স্থান হয়েছে ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে, ঠাকুরঘর বা উপাসনা গৃহে, ব্যাস ঐটুকুই। মহান গ্রন্থদ্বয়ের কি চরম পরিণতি! ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধানির্বাসন।

কোন কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আবার গীতার শ্লোক ও কোরানের আয়াতগুলি পাখিপড়ার

মত মুখস্থ করেছেন দাঁড়ি, কমা অবধি। এঁরা প্রতিদিন ভক্তিভরে ওগুলো আউড়ে যান অভ্যাসবশতঃ নিছক পুণ্যার্জনের ধান্ধায়। নিয়মিত গীতা পাঠক নিজেকে ভাবেন 'পুণ্যাত্মা' আর কোরান পড়ুয়ার ধারণা তিনি 'হাফিজ'।

শ্রাদ্ধের সময়ও পারলৌকিক ধর্মীয় কাজে উভয় সম্প্রদায় গীতা ও কোরান সম্পূর্ণ পাঠ করেন ভক্তিভরে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুস্তক দুটিকে স্রেফ ধর্মীয় আবরণের মোড়ক দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বেশ দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

কেউ কেউ আবার পুণ্যার্জন ছাড়াও জ্ঞানলাভের জন্যও গীতা কোরান পড়েন কিন্তু বেশির ক্ষেত্রেই এই পাঠ ভাসা ভাসা। অন্তর দিয়ে, এই মহান গ্রন্থদ্বয়ের মর্মবাণী উপলব্ধি ক'জন করেন? হিন্দু মুসলমান উভয়েই কিন্তু বই দুটিকে শ্রদ্ধা ভক্তি করেন খুব। এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে ওঁরা রে রে তেড়ে আসবেন আর উভয়েই ভাবছেন আমাদের গ্রন্থটাই সেরা অন্যটা ফালতু। এই বিচিত্র মানসিকতা ছেড়ে উভয়েই যদি ভাল করে বই দুটির দিকে চোখ দেন, তা হলে কি দেখবেন? দেখবেন কি চমৎকার মহাজ্ঞানের বাণী আর কি আশ্চর্য মিল দুযের মধ্যে। গীতা ও কোরানের মধ্যে যে কত সাদৃশ্য তার অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। এখানে আমি মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করছি।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গহস্তকর্মনি

—গীতা (সাংখ্য যোগ, ৪৭)

কর্মেই তোমার অধিকার। কখনও কর্মফলে অধিকার নেই। কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রকৃতির হেতু না হয় আবার কর্মত্যাগের প্রবৃত্তিও যেন না জন্মায়।

সন্নাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ
তয়োস্তু কর্ম্মসংখ্যাসাৎ কর্ম্মযোগেং বিশিষ্যতে

—গীতা (সন্ন্যাসযোগ, ২)

সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়েই মোক্ষ দিতে সক্ষম কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কর্ম-সন্ন্যাসের চেয়ে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

পার্থ নৈবেহ নাসুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুগতিং তাং গচ্ছতি

—গীতা (অভ্যাসযোগ, ৪০)

লিল্লাজিনা আহ্সানো ফি
হাজেহিদ্ দুনিয়া হসানাতোন

— কোরান (সুরা ৩৯/আয়াত ১০)

এই পৃথিবীতে যারা কল্যাণকর কার্য করেন তাদেরই মঙ্গল হয়।

অমাই ইয়ামানল মিসকালা যাররাতিন খাই রাঁই ইয়ারা
অমাই ইয়াল মিসকালা যাররাতিন সার রাঁই ইয়ারা

—কোরান (সুরা ৯৯/আয়াত ৭-৮)

কেউ যদি সৎ সামান্যও সৎ কাজ করেন তিনি শুভ [illegible] লাভ করবেন তেমনি [illegible]পরিমাণ

অসৎ কাজ করলেও তার ফলে শাস্তি পাবেন।

বালা মান আসলামা অজ হাহু লিল্লাহে অহুয়া মোহছেনুন
ফালাহু আজ রুহু ইন্দা রাব্বিহি অলা খাওফোন আলায় হেম আলাহুম ইহ্জানুন

—কোরান (সুরা ২ / আয়াত ১১২)

যিনি সৎকাজ করে আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ করেন তার ফল দেন স্বয়ং প্রতিপালক। তাঁদের ভয় নেই। তাঁরা কখনও দুঃখ পাবেন না।

এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গীতা ও কোরান উভয়েই মানুষকে কর্মে অনুপ্রাণিত করছে। সৎ কাজ করতে বলছে এবং কর্মের ফলাফল ঈশ্বর বা আল্লায় সমপর্ণের নির্দেশ দিচ্ছে কারণ সেই সর্বশক্তিমানই মানুষের কর্মানুযায়ী তাকে নির্দিষ্ট ফলাফল দান করবেন।

অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি

—গীতা (সাংখ্যযোগ, ১৭)

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎনায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে

—গীতা (সাংখ্যযোগ, ২৩)

প্রথম শ্লোকের অর্থ, বিনি এই দৃশ্যমান জগৎব্যাপী পরিব্যাপ্ত রয়েছেন তাঁকে অবিনাশী জানবে। এই অব্যয় স্বরূপকে কেউ বিনাশ করতে পারে না আর দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে এই আত্মা কখনও জন্মান না বা মারাও যান না। ইনি অন্যান্য জাত বস্তুসমূহের মত জন্মে অস্তিত্ব লাভ করেন না। ইনি নিত্যবস্তু। ইনি জন্মরহিত শাশ্বত ও পুরাতন। শরীরের বিনাশ হলেও ইনি ধ্বংস হন না।

ঠিক একই সুর ধ্বনিত হচ্ছে কোরানের ৮৩ সুরা (৪, ৫, ৬ আযাত), ওরা কি ভাবে না যে ওরা আবার জেগে উঠবে মহাদিনে যে দিন সকল মানুষকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে।

সুতরাং মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে গীতার মত কোরানও বিশ্বাসী। সেই আত্মার বিচার হয় মহাবিচারের দিন (কোরান)।

পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছেন। সর্বভূতে ও সর্বজীবে তাঁর অবস্থান। তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করছেন—গীতা ও কোরান উভয়েই এই একই কথা বলছে। নীচের উদ্ধৃতি দুটি তার প্রমাণ।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ
বেদৈশ্চ [illegible]হমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্

—গীতা (পুরুষোত্তম যোগ, ১৫)

অন্তর্যামিরূপে আমি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করছি। আমার থেকেই জীবসকলের

স্মৃতি ও জ্ঞানের উদয় হয়। এই স্মৃতি ও জ্ঞানের লোপ সেও আমিই সম্পাদন করি। বেদ সকলের একমাত্র জ্ঞাতব্যও আমি। আচার্য হিসেবে বেদান্তের অর্থ প্রকাশ করি ও আমিই বুদ্ধিতে অবস্থান করে বেদের অর্থ বুঝতে পারি।

না হানু আকরাবো
মিন হাবলিল ওয়ারিদ

—কোরান (সুরা ৫০/আয়াত ১৬)

আমি গ্রীবায় অবস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর অর্থাৎ সর্বভূতের অন্তরেই আমার অবস্থান।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্

—গীতা (রাজবিদ্যা—রাজগুহ্য যোগ, ১৮)

আমি গতি, আমি ভর্তা, আমি প্রভু আমি শুভ ও অশুভ দ্রষ্টা। আমি স্থিতিস্থল, আমি রক্ষক, আমি সুহৃদ, আমি সৃষ্টি ও সংহার করি। আমি আধার, আমিই লয়স্থান ও আমিই সেই অবিনাশী বীজ।

সাব্বাহা লিল্লাহে মা ফিস সামাওঅতে অল আরদে
অয়ুয়াল আজীজুল হাকিম
লাহু মুলকুস্ সামাওঅতে অল আরদে
ইয়য়ি অ ইয়ামিতো অহুয়া আলং কুল্লে সাঁইয়েন কাদির
হুয়াল আউযালো অল আখেরো অজ্জাহেরো
অল বাতেনো অহুয়া বে কুল্লে সাইযেন আলীম

—কোরান (সুরা ৫৭/আয়াত ১, ২, ৩)

আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু পরিব্যাপ্ত সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা প্রচার করছে। তিনি অমিত শক্তিশালী ও পরম জ্ঞানী। আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় অধিকর্তা তিনিই। জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তিনি ঘটান। তিনি সর্ববিদ্যাবিদ ও সর্বশক্তিমান। আদি ও অন্ত তিনিই। তিনি ব্যক্ত, তিনিই অব্যক্ত। তিনি সমস্ত বিষয় সম্যকভাবেই জ্ঞাত আছেন।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন

—গীতা (রাজবিদ্যা—রাজগুহ্য যোগ, ১৯)

হে অর্জুন, আমি সূর্যরূপে উত্তাপ দান করি। আমি ভূমি থেকে জল আকর্ষণ করি। আমি পুনরায় জল বর্ষণ করি। আমি জীবের জীবন ও মৃত্যু। আমি অবিনাশী সৎ স্বরূপ অব্যক্ত আত্মা আবার আমিই অসৎ নশ্বর ব্যক্ত জগৎ।

ইয়া আলামো মা ইয়ালেজো ফিল আরদে অমা ইয়াখরোজো মিন্‌হা
অমা ইয়ানজেলো মিনাস সামায়ে অমা ইয়া অমা ইয়া আরজো
ফিয়া অহুয়া মায়াকুম আয়না মা কুনতুম আল্লাহ বিমা তায়ামালুনা বাসির

লাহু মুলকুস সামাওঅতে অলআরদে অ একাল লাহে তোরথাউল উমুর
ইউলে জুল লায়লা ফিনানাহারে অইউলে জুন নাহারা ফিল লায়লে অহুয়া আলিমুখ
বেজাতিস্ সুদূর

—কোরান (সুরা ৫৭/আয়াত ৪, ৫, ৬)

যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও ভূমি থেকে নির্গত হয়, যা কিছু আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও আকাশে উত্থিত হয় এ সমস্তই তিনি জ্ঞাত আছেন। তিনি সর্বত্র তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সমস্তই দেখতে পান। আকাশ ও পৃথিবীর তিনি সর্বময় অধিকর্তা। সমস্ত বিষয় তার কাছেই মীমাংসা হয়। তিনি রাতকে দিন ও দিনকে রাতে রূপান্তরিত করেন। তিনিই অন্তর্যামী হিসেবে অবস্থান করছেন।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে

—গীতা (দশম অধ্যায়, ৩)

যিনি জ্ঞাত আছেন যে আমার আদি নেই, অন্ত নেই, জন্ম নেই আমি সর্বকালের মহেশ্বর, মানুষের মধ্যে তিনিই মোহশূন্য হয়ে সর্বপাপ মুক্ত হন।

কুল হে আল্লাহো আহাদ আল্লাহুস সামাদ
লাম ইয়ালিদ আনাম ইউলাদ অলাম ইয়া কুল্লাহু কুফয়ান আহাদ

—কোরান

তিনি আল্লাহ, অদ্বৈত আল্লাহ সমস্ত কিছুতেই রয়েছেন। তিনি জন্মও দেননি জন্মানওনি অর্থাৎ কেউ তাঁর জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

এমনি আরো প্রচুর উদাহরণ তুলে এই দুই মহা গ্রন্থের মিল দেখানো যেতে পারে। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সেই এক ও অদ্বিতীয় শক্তির উপাসক। এরা যার নাম দিয়েছে ঈশ্বর ওরা তাকেই আল্লা নামে ডাকে

আত্মার অস্তিত্ব

বৈদান্তিক বিচারে আত্মা, ব্রহ্ম, ভগবান ইত্যাদি অভিন্ন অর্থাৎ সমার্থক শব্দ। 'আত্মা' অর্থে নানাভাবে ঈশ্বরকেই বোঝানো হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে অবিনাশী বলেছেন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নাং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে
—সাংখ্য যোগ

এই (আত্মা) কোন কালে জন্মান না বা মারাও যান না। ইনি জন্মে প্রকাশিত হন না। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত ও চির পুরাতন। শরীরের বিনাশ হলেও ইনি নষ্ট হন না। আবার চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি 'পুনর্জন্মবাদ' সমর্থন করেছেন। সেই সঙ্গে অবতার তত্ত্বও।

বহুনি মে ব্যতিতানি জন্মানি তব চার্জুন
তান্যাহং বেদ সব্বানি ত্বং বেত্থ পবন্তপ
অজোহপি সন্নয়ব্যায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহীপি সন্
প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভাব্যম্মমায়য়া

হে অর্জুন, এর আগে আমি ও তুমি অনেক জন্ম পেরিয়ে এসেছি। হে শত্রুজয়ী অর্জুন, আমি সেই সবই জানি। তুমি জান না। আমি জন্মরহিত। অবিনাশী ও সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিকে বশ করে আপন মাযাবলে আবির্ভূত হই।

আত্মা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা অন্যরকম। অনেকেই আত্মাকে মানুষের দেহত্যাগের পর সূক্ষ্ম শরীরে তার অস্তিত্ব বা ঐ জাতীয় কিছু বোঝেন। সে অর্থে প্রয়াত মানুষের আত্মা যাকে প্রেতাত্মা বলাই বাঞ্ছনীয়, তার অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আত্মার সঙ্গে পরলোক তত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আমি দীর্ঘ চিকিৎসা জীবনে কিছু কিছু জাতিস্মর রোগী পেয়েছি যারা পূর্ব জীবনের কথা মনে রেখেছে। অবশ্য সেগুলো কতদূর সত্যি হলফ করে বলতে পারব না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এদের কথা বেশ আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে গেছে।

মাঝে মধ্যে এরকম রোগীও আসে যাদের নাকি 'ভর' হয়। এই ভর মনোবিজ্ঞানোনের দৃষ্টিতে এক ধরনের হিষ্টিরিয়া জাতীয় বায়ুরোগ বা বিচ্ছিন্নতামূলক প্রতিক্রিয়া (ডিসোসিয়েশন রিয়্যাকশন) অর্থাৎ চৈতন্য ও মানসিকতার পরিবর্তিত পরিস্থিতি কিংবা মানসিক ভারসাম্যহীনতার কোন উপসর্গ। যাই হোক এখানেও অনেক ভান, ভণ্ডামি দেখা গেছে।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই রহস্যময় ঘটনারও আভাস পেয়েছি। এই 'ভূতে পাওয়া' (পজেসড্) বা ভর অবস্থায় কেউ কেউ আবার আশ্চর্য সব ঘটনা কিংবা ভূত ভবিষ্যৎ বলে গিয়েছে যেগুলো মিলেও গেছে।

আমি তখন তন্ত্রসাধনা করতাম। সে প্রায় বছর কুড়ি আগের কথা। একদিন এক ক্ষ্যাপাটে গোছের সাধুপ্রকৃতির লোক আমার কাছে এসে বললেন, "আমি স্মরণ করলেই আমার গুরুদেবের আত্মা আমার মধ্যে আসেন।"

অর্থাৎ ওঁর ভর হয়। কথাপ্রসঙ্গে জানলাম ওঁর গুরুদেব বছর কয়েক আগে 'অপ্রকট' হয়েছেন। ভদ্রলোক বৈষ্ণব বলেই অপ্রকট শব্দটি প্রয়োগ করলাম। অর্থাৎ দেহ রেখেছেন। প্রথমটা ওঁকে বিশেষ আমল দিইনি। আমার সেই পাত্তা না দেওয়া ভাবটাই ওঁকে খুব বিচলিত করেছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। দেখুন তা হলে" বলেই স্থির হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। বিড় বিড় করে আপনমনে কিছু মন্ত্র পাঠ করে একেবারে নিঃসাড়। মনে হলো শ্বাসপ্রশ্বাস বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ একটা ঝট্‌কা মেরে কাঁপুনি দিয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে সেটাকে ভান বা অভিনয় মনে হলেও পরে বুঝেছিলাম গুরুদেবের আত্মা ওঁর মধ্যে এসেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে কারো কারো বিশ্বাস পুনর্জন্ম না হওয়া পর্যন্ত আত্মা কর্মফল অনুযায়ী বিভিন্ন লোকে (স্তর) অবস্থান করে। যাই হোক ওঁদের মধ্যে (সাধুপ্রকৃতির ব্যক্তি ও ওঁর গুরুদেবের আত্মা) যে সমস্ত কথাপকথন হচ্ছিল তা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। ওঁর গুরুদেবের কণ্ঠস্বর যেন কোন্ সুদূর থেকে ভেসে আসছিল।

অবশ্য এটা 'ভেনট্রিলোকিউজম' বা স্বরক্ষেপণের একটা পদ্ধতিতেও অর্থাৎ মুখ বুজে কথা বলা (দূরাগত শব্দানুকরণ বিদ্যা) সম্ভব। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই সাধুপ্রকৃতির মানুষটি ভর অবস্থায় (ওঁর গুরুদেবের আত্মা আবেশিত) যে সমস্ত তথ্য আমায় বলেছিলেন তা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। আর আমার সম্পর্কে বেশ কিছু গোপন কথাও জানিয়েছিলেন যা আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়।

তা ছাড়াও প্ল্যানচেট বা মিডিয়াম দিয়ে আত্মা নামানো বা ঐ জাতীয় রহস্যময় এবং মিস্টিক ব্যাপার আমি অনেক দেখেছি। অবশ্য সব কিছুই যে বিশ্বাসযোগ্য তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে গোঁজামিল ও পূর্বপরিকল্পিত সাজানো ব্যাপারও থাকে।

এ ছাড়া আত্মা সম্পর্কে অনেক কিছু, বিশেষতঃ সাধকদের লেখা পড়াশোনা করেছি।

স্বামী নিগমানন্দের জীবনীতে দেখা যায় উনি ওঁর প্রয়াতা স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে (রূপ ধারণ করে) একত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন তারাপীঠে মহাসাধক বামাক্ষ্যাপার কাছে।

'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি' আত্মা নিয়ে চর্চা করে। ওদের কাছেও এ ধরনের অনেক তথ্য আছে।

আমার এক নিকট আত্মীয় করুণাময় চট্টোপাধ্যায়। পেশায় আইনজীবী। ব্যারিস্টার। এ ছাড়াও অধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কে দীর্ঘকাল আগ্রহান্বিত। সংস্কৃত ভাষাতেও ওঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। বর্তমানে উনি প্রায় সাধনমার্গেই বিচরণ করছেন।

কিছুদিন আগে উনি 'আত্মা কে ও কী' এই শিরোনামে আমাদের নিউরো-সাইকো-ফিলসফিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র 'দেহ-মন আত্মা' পত্রিকায়, উভয়ার্থে আত্মা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন।

যিনি এই দেহ ও মনের ভিতরে ও বাইরে একই সঙ্গে রয়েছেন সেই আত্মার সম্পর্কে কিছু বলা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। আদি শঙ্করাচার্যের ভাষায় "বেদৈঃ অবেদ্যঞ্চ স্তোত্রেন কিং বিধীয়তে"। বেদ যাকে নেতি নেতি বলে চলেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ব্রহ্মই একমাত্র উচ্ছিষ্ট হননি। তিনি অবাঙ্মনসগোচর। সেই ব্রহ্ম বা আত্মা বহুবার উপনিষদের মধ্যে ব্যবহৃত দেখা যায়।

মোটামুটি বলা যেতে পারে ব্রহ্ম আত্মা ভগবান একটি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব যেটি জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির মাধ্যমে যথাক্রমে জানা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এক জায়গায় সুন্দরভাবে বলা আছে—

বদন্তি তত্ত্ববিদঃ ততত্ত্বম জ্ঞানদ্বয়ম
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি কথ্যতে
অর্থাৎ
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বৃক্ষের স্বরূপ
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তাঁর রূপ
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে

শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলায় শ্রীমৎ মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের সংলাপে দেখা যায়ঃ

প্রভু কহেন বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার
রায় কহেন আত্মবিদ্যা সর্ববিদ্যা সার

জগৎ, জীব ও ঈশ্বর—বিষয়, বিষয়ী ও পরমাত্মা (ব্রহ্ম) এই ত্রয়ীই ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যার উপজীব্য বিষয়।

এই ত্রয়ীর সম্পর্ক মানব মনের তিনটি স্তরের মাধ্যমে বোধগম্য হয়। এই স্তর ত্রয়কে বলা হয় বিষয় স্তর, বিষয়ী স্তর ও ব্রহ্মস্তর (অ্যাবসোলিউট স্টেজ)। যদিও ধর্মমত ধর্মসাধনা এর যে কোন একটার মাধ্যমেই (সাহায্যে) করা সম্ভব তবুও উচ্চতম স্তরে না উঠলে এই ব্রহ্ম বা আত্মাকে সম্যকভাবে বোঝা, জানা বা উপলব্ধি সম্ভব নয়।

এই আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আছেন জীবাত্মা। মুণ্ডক উপনিষদ একটি উপমার মাধ্যমে সুন্দরভাবে এর চিত্র এঁকেছে।

দ্বা সুপর্ণা সাযুজ্যা শাখায়া বৃক্ষং পরিসজ্জ্বতে
তবোয়ণ্য ঃ পিপনাং স্বাদত্তনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সর্বদা যুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাব। দুটি সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট (পাখি) এই দেহবৃক্ষকে আশ্রয় করে আলিঙ্গনাবদ্ধ আছে। তাদের মধ্যে একজন (জীব) দেহবৃক্ষের বিচিত্র সুখ ও দুঃখ স্বরূপ কর্মফল ভক্ষণ করে অপরটি কিন্তু ভোজন না করে শুধু দর্শন করে। এখানে জীবদেহকে বৃক্ষ কল্পনা করা হয়েছে। এই দেহ-বৃক্ষের একটি সুন্দর বর্ণনা কঠোপনিষদের শ্লোকেও পাওয়া যায়

উর্ধ্বমূলোইবাক্শাখ এষোইশ্বত্থঃ সনাতনঃ
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিনলোঁ কাঃশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি
কশ্চন্। এতদ্বৈ তৎ

এই যে সংসারবৃক্ষ এ অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় অবিনাশশীল। এর উৎপত্তিস্থল ব্রহ্মস্বরূপ মূল থেকে। এর শাখাগুলি জীবাদিরূপে নিম্নদিকে বিস্তৃত। এ সনাতন প্রবহমান নিত্য, শাশ্বত ও অবিনাশী। এই সংসারবৃক্ষের যিনি মূল তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান। তিনি শুদ্ধ, তিনিই অমৃত। তাঁর মধ্যেই এই পৃথিবীর সমস্ত লোক আশ্রিত।

নৈনং কিঞ্চিৎ অনাবৃতম্
নৈনং কিঞ্চিৎ অসংবৃতম্

এমন কিছু জগতে নেই যার দ্বারা ইনি (ব্রহ্ম) আবৃত নন বা এমন কিছুই নেই যাতে উনি অনুপ্রবিষ্ট নন।

ঠিক এই ধরনের বক্তব্য প্রথম উপনিষদের (ঈশোপনিষদ) প্রথম শ্লোকে (মন্ত্র) পাওয়া যায়।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জাগত্যাং জগৎ

অর্থাৎ এই জগৎ ঈশ্বর বাসের নিমিত্ত কিংবা ঈশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদিত। এই ঈশ্বরই আত্মা বা ভগবান বা ব্রহ্ম।

এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে (পুরুষোত্তম যোগ) শ্রীভগবান কর্তৃক সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে,

উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ

উর্ধ্বমূল ও নিম্নে শাখা বিশিষ্ট অশ্বত্থ বৃক্ষকে অবিনাশী বলা হয়। বেদ (ছন্দাংসি) যার পত্র, তাকে (সেই বৃক্ষকে) যিনি জানেন তিনি বেদজ্ঞ।

এই সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শ্রীভগবান সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের স্রষ্টা। সুতরাং এই বৃক্ষের মূল উর্ধ্বে এবং নিম্নধামে (ব্রহ্মলোক) অবস্থিত

ও সংসারের বিস্তারকারী হওয়ার জন্য ব্রহ্মকে শাখা ও এই বৃক্ষকে অধঃশাখা বিশিষ্ট বলা হয়েছে।

যাই হোক আবার আত্মার প্রসঙ্গে আসা যাক।

আত্মা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা এটা বোধ হয় অশরীরী কোন কিছু, যেমন ভূত, স্পিরিট বা প্রেতাত্মা।

ভূত, প্রেত ইত্যাদি শব্দগুলি চমকপ্রদ, রোমাঞ্চকর ও ভীতি উৎপাদক। প্রকৃত অর্থে ভূত মানে অতীত এবং প্রযাত থেকেই প্রেত কথাটি এসেছে। মৃতদেহ যতক্ষণ সৎকার না করা হচ্ছে ততক্ষণ সেটি প্রয়াত আর তার পরই পরিণত হচ্ছে অতীত বা ভূতে। সে তখন 'কথেতি বর্ত্ততে' যা হল শব্দমায়াবৃত। তার (প্রয়াতর) ছবি, তার বাড়ি, তার আত্মীয় স্বজন তার স্মৃতি বর্তমান। কিন্তু তার দেহরূপ আর নেই। আত্মা আছে কিনা সেটি বিতর্কিত বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা 'প্ল্যানচেট' বা বিদেহী আত্মার অবতরণ এবং স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে', রবীন্দ্রনাথের 'পরলোক চর্চা' বিভূতিভূষণের 'দেবযান' ও সম্প্রতি নবপত্র প্রকাশন প্রকাশিত 'মৃত্যুর পরে ও আত্মার কথা' নামের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইটি যা আমেরিকার বিখ্যাত হৃদরোগ চিকিৎসকের (ডাঃ মরিস রলিংস) মৃত (সাময়িক বা প্রায়) রুগীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত ইত্যাদির উল্লেখ করতে পারি।

অবশ্য যাঁরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'আত্মা'র বিচার করে নানা কিছু লিখেছেন তাঁদের মধ্যে মতের গরমিল দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন মৃত ব্যক্তি তার পূর্ব শরীর নিয়েই বর্তমান আছেন। আবার অন্যদের মতে এটা মনজাত একটা কল্পনা বা ভ্রমবিলাস যার মূলে আছে সেই মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা বা সম্পর্ক জনিত চিন্তাধারা।

এই জাতীয় আত্মাঘটিত চিন্তাভাবনা সমূহ বা ক্রিয়াকলাপ অকাল্ট বা মিষ্টিক সায়েন্সের পর্যায়ে পড়ে। অপরপক্ষে বেদান্তের নির্দেশিত আত্মা বা ব্রহ্ম হচ্ছেন এক নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানশক্তি সমন্বিত সত্তা।

যযা ধার্যতে ইদম্ সর্বম জগৎ

এই দ্বন্দ্বের মাঝ থেকেই আমরা পাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ে দুটি শ্লোক (পাঁচ ও ছয়)। পঞ্চম শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেনঃ

অন্তকালে চ মামেব স্মরণমুক্ত্বা কলেবরম্
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্য ন সংশয়ঃ

অর্থাৎ যে প্রয়াণকালে আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করে সে আমাকে নিঃসন্দেহে প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

পরের শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য ঃ

যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্
তং তমেবেতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ

অর্থাৎ মানুষ দেহত্যাগ করার সময় যে ভাবে ভাবিত হয় কিংবা মরণকালে যে ভাবনা ভাবতে ভাবতে দেহ ছাড়ে সে সেভাবেই (সে যোনিতেই) জন্মগ্রহণ করে।

যেমন, কুকুরের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করলে সে কুকুর হয়েই জন্মায়। তবে কি কেউ বাড়ি, গাড়ি, কারখানা বা দোকানের চিন্তা করতে করতে পরলোক প্রাপ্ত হলে সে বাড়ি, গাড়ি, কারখানা বা দোকান রূপে জন্মগ্রহণ করে? এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তার উত্তরে বলতে হয় যে সে রকম হয় না বটে তবে ঐ বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন প্রাণী হয়ে জন্মায়।

"স্বয়ং পদ্মণাভস্য মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা' গীতাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। সুতরাং গীতা মানলে জন্মান্তরবাদ ও মৃত্যুর পর আত্মা বা ঐ জাতীয় একটা সত্তাকে অবশ্যই মানতে হয় কিন্তু সেটা বিতর্কিত বিষয়।

আত্মা প্রসঙ্গে এসে পড়ে পরলোকের কথা। ইহলোক যখন আছে পরলোক বলে একটা কিছু থাকতেই পারে এবং এই পরলোক সৃষ্টির শুরু থেকেই আজ অবধি চলছে জন্ম-মৃত্যুর বিরামবিহীন স্রোতধারা।

আর্যপ্রবর শংকরের কথায় "পুনরপি জনমং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।"

আশাপাশামাতৈঃ বদ্ধমানব চায় অন্তহীন সুখস্বাচ্ছন্দ্য। কিসে সে পাবে সুখ এবং কতটা পেলে খুশি হবে সে তা নিজেও জানে না বা জানতে চায় না। মহাভারতে যযাতি পুরুষ আখ্যানে তা আমরা দেখতে পাই। সহস্র বছর কামসম্ভোগের পরও কামাগ্নির নিবৃত্তি হয় না।

ন জাতু কামাঃ কামনানাম উপশাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এব অভিবর্ধতে

কামনা বাসনার জালে জড়িয়ে মানুষ যখন ইহলোক ছেড়ে পরলোকের পথে পাড়ি দেয় তখন সে তার অতৃপ্ত কামনার বীজ সঙ্গে নিয়ে যায় সেই অজানা পরলোকে।

আমাদের পার্থিব জীবনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, বিবর্তন বা রূপান্তর হচ্ছেই এবং জন্ম-মৃত্যু বা সৃষ্টি-ধ্বংসের খেলা চলছে। ভ্রূণ থেকে শিশুর জন্ম, শৈশব থেকে কৈশোর এমনি করে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য সবই হচ্ছে, তা আমরা চাই বা না চাই।

প্রফেসর হাক্সলির কথায় "না মরা পর্যন্ত জীবন বাঁচতে পারে"—এটা তো আমাদের মানতেই হবে যে আমরা বেঁচে থাকি। আমাদের জীবন-নদীর স্রোত প্রবহমান, যদিও প্রতি মুহূর্তেই আমাদের দেহ-কোষের পরিবর্তন ঘটছে।

শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত আমার আমিত্ব বা স্বরূপত্ব ঠিক একই থাকে; তার কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। যে আমি ছিলাম সেই আমিই আছি। গতকালের আমি, আজকের আমি ও আগামীকালের আমি সেই একই আমি, অন্য আমি নই। শ্রী গীতার অমরবাণী ঃ

দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি

—সাংখ্যযোগ

দেহধারীদের (জীবসকল) বাল্যকাল, যৌবন, বার্ধক্য প্রকৃতির নিয়মেই আসে এবং যথাসময়ে দেহান্তর হয়। জ্ঞানীব্যক্তি সে সম্পর্কে মোহগ্রস্ত হন না।

আমাদের জীবনে শৈশব ও যৌবন বার্ধক্যে রূপান্তরিত হবার পরও আমরা বেঁচে থাকি আমাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট সত্তা বা স্বরূপত্বের মধ্যে। ঠিক সেইভাবে মরণের পরও অনন্তকাল বেঁচে থাকব। এই মরণ শুধু দেহান্তর প্রাপ্তি কিংবা শরীর পরিবর্তন, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক এই প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীভগবান বলছেনঃ

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়ো
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী

—সাংখ্যযোগ

মানুষ যেমন জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করে নূতন পোশাক পরিধান করে সেইরকম এই আত্মাও পুরোনো দেহ ত্যাগ করে নূতন শরীরে প্রবেশ করেন। দেহ বিনাশশীল কিন্তু আত্মা অবিনাশী।

আগেই বলেছি প্রেত কথাটা এসেছে প্রয়াত শব্দ থেকে। এবং ভূত মানে অতীত। অনেকেরই ভূত প্রেত বা আত্মা সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে স্বামী অভেদানন্দজীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল "প্রেতাত্মারা কি আবার জন্মগ্রহণ করে?"

এর উত্তরে স্বামিজী মহারাজ বলেছিলেন "হ্যাঁ, জন্মায় বৈ কি। যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষ তার কামনা বাসনার বাঁধন ছিঁড়তে বা জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে অতিক্রম করতে না পারে ততক্ষণ তাকে বার বার পৃথিবীতে জন্মাতেই হবে। অতৃপ্ত বাসনার বীজ তাদের বাধ্য করে পৃথিবীতে আবার জন্মাবার জন্য। সৃষ্টি ও বিনাশের প্রবাহে পড়ে তারা আংশিক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে এসে ধীরে ধীরে তাদের পূর্বেকার ঘুমের অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে থাকে...প্রেতাত্মা স্বরূপে জন্মরহিত। অমর সৃষ্টি তাদের কোনদিনই হয়নি। জন্ম ও মৃত্যু, যাওয়া ও আসা আসলে আপেক্ষিক পৃথিবীর জিনিস। অজ্ঞান-আবরণের জন্যই লোকে মনে করে সে মরছে বা জন্মাচ্ছে। আত্মজ্ঞান রূপ স্বয়ং জ্যোতিষ্মান আলোর দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার যখন দূর হয়ে যায় তখন মানুষ উপলব্ধি করে তার শাশ্বত আনন্দময় স্বরূপ। প্রেততত্ত্ব কখনও মানুষকে জন্মমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে না। বাঁচাতে পারে একমাত্র পরমাত্মার জ্ঞানই। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই মানুষকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিতে পারে।" স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'পুনর্জন্মবাদ' গ্রন্থের আর এক জায়গায় লিখেছেন "জীবাত্মার পরিণতি হইল অনন্তকাল যে বীজ ইহার মধ্যে নিহিত আছে তাহা সমগ্র পরিপূর্ণ বিকাশের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইবে ও পরিশেষে যে অনন্ত উৎস হইতে তাহা প্রথমে আসিয়াছিল সেখানেই আবার সে ফিরিয়া যাইবে।"

কিছুকাল আগে 'ওভারল্যাণ্ড' কাগজে অতীন সরকার, আমাদের 'দেহ মন আত্মা'

পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন "বিশ্বের বিশাল জনসমষ্টির মধ্যে মাত্র কয়েক কোটি হিন্দু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী।"

অতীনবাবু পণ্ডিত ব্যক্তি সন্দেহ নেই কিন্তু ওঁর এই ধারণাটি সঠিক বলে মনে হয় না। গোলমাল লাগে এই আত্মা কে ও কী এই চিন্তায়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে এককালে আমিও অপরিণত বুদ্ধিতে এই ভ্রমজালে জড়িত ছিলাম। একথা মোটেই স্বীকার্য নয় যে হিন্দুধর্মের বাইরে আত্মার অস্তিত্ব নেই। কেননা সোল, স্পিরিট, সুপ্রিম বিইং, ভাইটাল বা প্রাইম ফোর্স এই শব্দগুলো তা হলে ইংরেজী অভিধানে থাকত না। বার্টান্ড রাসেল থেকে শুরু করে অনেক বিশ্ববিখ্যাত মনীষী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

দীর্ঘকাল আগে 'ধর্ম ও কুসংস্কার' এই নামে এবং সম্প্রতি নবপত্র প্রকাশনের 'আত্মা মৃত্যু স্বর্গ ও নরক' (নিগূঢ়ানন্দ) বই দুটিতে আত্মা ও পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়াও আরো বহু পুস্তক লেখক ও গবেষকেরা প্রচুর তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রায় সবাই আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

মানুষের এই যে আত্মা সম্পর্কে ধারণা ও পরলোক বিশ্বাস---এটা গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করেই আর তা থেকেই স্বর্গ ও নরক কল্পনা। দেহ থেকে বেরিয়ে যাবার পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা নানা স্তরে ও নানা ভাবে তার কর্মফল অনুযায়ী অবস্থান করে বলেই সাধারণ মানুষের ধারণা। মহাপুরুষ ও যোগী ছাড়া অন্যান্যদের আত্মা নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গ বা নরকে সুখ কিংবা কষ্ট ভোগ করে পুনর্বার জন্ম না হওয়া অবধি। মহাপুরুষ ও যোগীদের আত্মা মুক্ত হয়ে পরব্রহ্মে লীন হয়। এই যে বিশাল একটা সংস্কার যাকে ভিত্তি করে সাধারণ জীবনের একটা বিরাট অধ্যায় গড়ে উঠেছে এর মূলে কিন্তু একমাত্র অন্ধবিশ্বাস। একটা অলীক কল্পনা-বিলাস ছাড়া এটাকে অন্য কোন আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রথমত এইরকম একটা বিশ্বাস আমাদের আছে যে আত্মার সাময়িক বসবাস জীব দেহের মধ্যেই। দেহ ছেড়ে আত্মা চলে গেলে জীবের মৃত্যু হয় সুতরাং আত্মাই জীবন। দ্বিতীয়ত আত্মা দেহমুক্ত হলে এই পৃথিবীতে দেহধারী অবস্থায় থাকাকালীন যে রকম শুভাশুভ কর্ম সে করেছে তার উপরই আত্মার শ্রেণীবিভাগ হবে অর্থাৎ সে (আত্মা) স্বর্গ বা নরক বা এ জাতীয় কোন লোকে অবস্থান করবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আত্মার উত্তরণ বা অধঃপতন দেহধারীর কর্মফলের উপরই নির্ভরশীল, অতএব কর্মবাদ অনিবার্যভাবে এখানে এসে যাচ্ছে। এর থেকে এই রকম সিদ্ধান্তে আসা বিচিত্র নয় যে দেহধারণের অর্থাৎ জন্মের আগে এই আত্মা পরলোকে অবস্থান করছিলো। সেটা স্বর্গ কিংবা নরক যাই হোক। তার শুভাশুভ কর্মফল ভোগান্তে আবার সে পৃথিবীতে দেহধারণ করেছে। এইভাবে আত্মাকে জন্মজন্মান্তর আপন কর্মফল অনুযায়ী ঘুরে বেড়াতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে মুক্তি পাচ্ছে।

এবার এটা বুঝতে অসুবিধে নেই যে পরলোক তত্ত্ব ও আত্মার উৎপত্তি আমাদের

কর্মফলকে কেন্দ্র করেই। বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে এই তত্ত্ব ও সংস্কার যুগে যুগে অদ্ভুত বিচিত্র রূপ নিয়েছে এবং এখনও এর রূপান্তর হচ্ছে। বিজ্ঞানের যুক্তিতে আত্মা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আত্মা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যেটা ধারণা তা আমাদের জটিল স্নায়ুতন্ত্র (নার্ভাস সিস্টেম) ও প্রাণবায়ু (ভাইটাল এয়ার) বা এ জাতীয় কিছু ব্যাপার।

পরামনোবিদ্যাবিশারদরা (প্যারাসাইকোলজিস্ট) আত্মা নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন এবং এখনও করেন কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তি ও বিজ্ঞানগ্রাহ্য কোন প্রমাণ তাঁরা দাখিল করতে সমর্থ হননি। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বিচারে আত্মা এ পর্যন্ত দেহাতীত কিছু নয়। বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে আত্মা সম্পর্কে যে ধারণা আছে তাও মূলতঃ দেহ নির্ভর ও স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রিক। কারো কারো আবার বিশ্বাস আত্মা হচ্ছে হৃদপিণ্ড (হার্ট) অথবা হৃদয়েই আত্মার অবস্থান। জীবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলী ও রক্তচলাচল ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ মস্তিষ্ক ও হৃদপিণ্ড দ্বারাই। হৃদস্পন্দনের অভিব্যক্তিটি মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং হৃদয়ের আবেদন ও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার আদিবাসীদের মধ্যে অন্যভাবে প্রতিফলিত।

কোন পূজার সময় যখন প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন প্রতিমার বক্ষে (হৃদয়ে) দূর্বা ও আতপচাল দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র পাঠ করা হয়। ধরা যাক দুর্গা দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেক্ষেত্রে মন্ত্র এইরকম ঃ

শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী (দেব্যৈঃ) প্রাণা ইহঃ প্রাণাঃ
...জীব ইত স্থিতঃ ....সর্বেন্দ্রিয়ানি...তায়া
বাঙ্মনস্তক্‌চক্ষুঃ শ্রোত্রঘাণপ্রাণা
ইহগত্য সুখং তিষ্ঠন্তু স্বাহা

এখানে লক্ষণীয় এই যে দেবতার প্রাণ হৃদয় মারফত তাছাড়া শুধু প্রাণ কেন জীবন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, বাক্, মন, চক্ষু, কর্ণ, এবং ঘ্রাণশক্তি অর্থাৎ সমস্ত কিছুরই প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সুতরাং এটা বিশ্বাসের মস্ত একটা প্রমাণ যে হৃদয়কে আমাদের জীবনের আধার হিসেবে স্থান করা হয়।

খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যেও আছে "অ্যাণ্ড দি লর্ড গড ফর্মড মেন ফ্রম দি ডাস্ট অফ দি গ্রাউণ্ড অ্যাণ্ড ব্রেদড ইনটু হিজ নসট্রিলস দি ব্রেথ অফ লাইফ, অ্যাণ্ড ম্যান বিকেম এ লিভিং সোল"—এখানে নিঃশ্বাসের প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে আত্মা। নিঃশ্বাসের প্রক্রিয়া যদিও নার্ভ বা স্নায়ুমণ্ডলীর ব্যাপার কিন্তু মনে করা হয় সেই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে হৃদয়। সাধারণ মানুষের ধারণা এইরকম। সুতরাং এখানে হার্ট ও আত্মার একীকরণ দেখা যাচ্ছে। এখন 'হার্ট ট্রান্সপ্লেনটেশন' (হৃদপিন্ড বদল)-এর যুগে এ ধারণাটি বড় রকমের ধাক্কা খাচ্ছে সন্দেহ নেই। আদিবাসীরা যখন এ ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবে তখন তাদের বিশ্বাস কোন খাতে বইবে ও কি রকম আকার নেবে সেটা বলা শক্ত।

যুগে যুগে মানুষ এটা বিশ্বাস করে চলেছে যে মৃত্যুই জীবের শেষ পরিণতি নয়।

যাঁরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী—কর্মবাদ ও অদৃষ্টবাদের কল্পনা তাঁরা করেছেন এই বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা প্রশাখাও এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই পল্লবিত হয়েছে, কোন বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির তোয়াক্কা করেনি। অবশ্য এর ব্যতিক্রম একমাত্র চার্বাক দর্শন। এ মতবাদ মেনে নিলে স্বভাবতই এটা ধর্মের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, যা হয়েছে আমাদের ধর্মে। কর্ম জন্মান্তরে আত্মাকে কেন্দ্র করেই ঘুরে ফিরে আসে। সুতরাং শুভ কর্মে স্বর্গ ও অশুভ কর্মে নরক বাস এ ধারণাটা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল। তারপর নিজ নিজ কর্মফল ভোগের পর স্বর্গ বা নরক থেকে সেই আত্মা (নির্দিষ্ট সময়ের পর) আবার পৃথিবীতে এসেই জন্ম নেবে। কর্মান্তে এবং প্রারব্ধ খণ্ডন হবার পর আত্মা মুক্ত হলে তার জীবন ধারণ বন্ধ হবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে কর্মের মহিমা বা কালিমার ছাপ সব সময় আত্মাতে লেগে থাকছে।

ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন না কিন্তু তাঁরাও আত্মার অস্তিত্ব এবং তাতে জাগতিক কর্মের প্রভাবের কথা বিশ্বাস করেন। আবার মুসলমানদের এই ধরনের একটা চিন্তাধারা কাজ করে যে সমস্ত আত্মার বিচার হবে একসঙ্গে ও শেষদিনে। এই শেষ বিচারের জন্য দীর্ঘকাল কবরের মধ্যে নিদ্রিত থাকতে হবে।

স্বর্গ ও নরকের ধারণা সম্পর্কে খুব একটা সুস্পষ্ট ধারণা আদিবাসীদের মধ্যে নেই। আত্মার অস্তিত্বে এরা বিশ্বাসী কিন্তু মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার কি গতি হয় এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু তারা বলতে পারে না।

দাক্ষিণাত্যের কোন কোন আদিবাসীদের বিশ্বাস যে-পাথরকে তারা পূজো করে আত্মা তার মধ্যেই অবস্থান করে।

মহীশূরে কর্গ উপজাতিদের ধারণা অন্যরকম। ওরা মনে করে বিশাল বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, যেখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়ে না, আত্মারা সেখানেই বাস করে।

নাগা সম্প্রদায়ের কারো কারো বিশ্বাস যে এই রকম মরণের পর দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে পাহাড় গিয়ে থাকে। আবার এদের অন্য এক গোষ্ঠীর ধারণা আত্মার নিবাস পাথরের টুকরোর মধ্যে। একদল আবার ভাবে মৃতের আত্মা মাটির নীচে চলে যায়। মাটির নীচেও একটা জগৎ আছে সেখানে আত্মা গিয়ে দেহ ধারণ করে এবং কর্মফল অনুযায়ী বসবাসের পর সেই আত্মার আবার মৃত্যু হয় ; তখন সে কীট, পতঙ্গ (বিশেষতঃ প্রজাপতি) রূপে জন্ম নেয় পৃথিবীতে। এইবার সেই আত্মার মৃত্যু হলে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তার আর জন্ম হয় না।

গণ্ড উপজাতিদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের একটা প্রথা প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর ঠিক পাঁচদিন পর তারা হঠাৎ একটা মাছ বা কোন কীটপতঙ্গকে ধরে ফেলে। তাদের ধারণা মৃতের আত্মা পাঁচদিন পরে এমনি ভাবে ধরা দেয়। তারা সেই আত্মাপূর্ণ কীট বা মাছটিকে সযত্নে বাড়িতে নিয়ে আসে। বছরে দুবার বিশেষ ধর্মীয় উৎসবে তারা ঐ মাছ বা কীটরূপী আত্মার পুজো দেয়। সেই পুজোর প্রসাদ ওরা মোরগ ও টিকটিকিকে খেতে দেয়। এদের বিশ্বাস এই আত্মা আবার সেই বংশেই জন্মগ্রহণ করে। এরা মূলতঃ বনচারী। এদের বিশ্বাস ঐ আত্মা তাদের বনজঙ্গলে হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা

করবে। আদিবাসীদের মধ্যে এরকম অনেক দৃষ্টান্তই দেখা যায়। এর থেকে স্পষ্টই একটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে কর্মফলকে কেন্দ্র করে স্বর্গ-নরকের ধারণাটা এদের মধ্যে নেই। এরা অবশ্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং মনে করে আত্মা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে ঘোরাঘুরি করে। গণ্ডরা পুনর্জন্মেও বিশ্বাসী।

কিন্তু আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু আদিবাসীদের ধারণা মৃত্যু মানেই সব শেষ। আত্মা বা পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা মনে করে মৃত্যুর পর সমস্ত বিদেহী আত্মা স্বর্গে যায়। সে স্বর্গ অতি আনন্দময় জায়গা। পার্থিব কর্মফলের কোন প্রভাব সেখানে পড়ে না।

বৈদিক সাহিত্যে যে পরলোকের উল্লেখ আছে তা হল পিতৃলোক। যম বা ধর্মরাজ বিশ্বে সর্বপ্রথম মৃত্যু বরণ করেছিলেন। সুতরাং মৃত্যুলোক তাঁরই রাজ্য। মরণের পর মানুষ সেখানেই যায়। শ্রাদ্ধের সময় মৃতের আত্মার প্রতি যা কিছু দান করা হয় সেগুলি যমলোকে আত্মার কাছে গিয়ে পৌঁছয়। তাদের পানীয় দান করে সোম। এবং প্রদত্ত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র সেই আত্মারা ভোগ করে। সম্মুখ সমরে যারা প্রাণ বিসর্জন দেয়, যারা ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করে দানধ্যান করে, যারা তপস্যা ও সাধনে ব্রতী, তারাই পিতৃলোকে যাবতীয় সুখভোগ করার অধিকারী। কিন্তু যারা অসৎ, কুকর্মে লিপ্ত, যজ্ঞের বিঘ্নকারী তারা এই সুখ থেকে বঞ্চিত। এ শাস্ত্রবাণী। পিতৃলোক পার হলে তারপর আসে স্বর্গলোক কিন্তু এ সম্পর্কে ঋগ্বেদ যে ছবি এঁকেছে সেটা খুব পরিষ্কার নয়।

মরণের পর পিতৃলোকে অথবা নানারকম কুকর্ম করার ফলে অতল অন্ধকারের গর্ভে বসবাসের পর আত্মা কি করে স্বর্গে যায় সে রহস্য উদ্ধার করা কঠিন।

পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে অবশ্য খানিকটা সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে।

অথর্ববেদের একটি বর্ণনায় আছে যে মৃত্যুর পর আত্মা পরলোকে বা স্বর্গে তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখে বাস করে এবং এমনকি সে সেখানে প্রচুর যৌন সুখও উপভোগ করে।

অথর্ববেদের ১৮শ কাণ্ডের ৩য় অনুবাকের ৯ম ও ১০ম মন্ত্রে (শ্লোক) প্রেতাত্মার স্তুতি করা হয়েছে ঃ

উপসর্গ মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুকোবাম্
উর্ণপ্রদাঃ পৃথিবীর দক্ষিণাবত এষা ধা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ
উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবী মা নি বাধতাঃ সুপায় নাস্মৈ ভব সুপসর্পণা
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম উর্নুহি

"হে প্রেত, জননীতুল্য সুখদায়ী বিস্তীর্ণ পৃথিবীর কাছে যাও। এ পৃথিবী বহু যজ্ঞে দক্ষিণাকারী তোমার প্রতি মৃদু কম্বলের ন্যায় সুখকারী হয়ে পূর্বদিকে পথপ্রান্তে বর্তমান তোমাকে রক্ষা করুন। হে পৃথিবী, তুমি পুলকিতা হও, এ পুরুষের প্রতি কঠোর হয়ো না, সহজে এর কাছে যাও। মা যেমন নিজেব পুত্রকে বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদন করে সেরূপ তুমিও এই আগত পুরুষকে আচ্ছন্ন কর। এর যাতে শীতোষ্ণাদি দুঃখ না হয় সেভাবে একে রক্ষা কর।"

শতপথ ব্রাহ্মণে এইরকম বলা হয়েছে যে একজন এ জগতে যজ্ঞের উদ্দেশে যতটা দান করবে পরলোকে ততটা কম ভোজন করলেও সে সুখে থাকবে। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে নরকেরও একটা ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু তার পাশাপাশি একটা অদ্ভুত পরিকল্পনারও আভাস মেলে। ইহলোকে দীর্ঘজীবন কামনা করা হয় কেননা পরলোকে আত্মার বার বার মৃত্যু হয়।

উপনিষদে স্বর্গ ও নরকের একটা সুস্পষ্ট চিত্র আঁকা হয়েছে। জ্ঞানীরা বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞানীরা পরব্রহ্মে লীন হন। যাঁরা সুকর্ম করেন তাঁরা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। দুষ্কৃতীরা নরকে যায়। চন্দ্রলোক ও নরকবাসীরা কর্মক্ষয়ের পর আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। এদের মুক্তি হয় না। কেবলমাত্র জ্ঞানীদেরই আত্মা মুক্ত হয়। চন্দ্রলোক, পিতৃলোক বা প্রেতলোকবাসীদের আত্মার তৃপ্তির জন্য ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নানা বিধান দেওয়া হয়েছে। এগুলির উদ্দেশ্য একদিকে যেমন মৃত আত্মার শান্তি তেমনি তাদের আশীর্বাদে আমাদের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি। যাইহোক পরবর্তী গ্রন্থসমূহে বেদ এবং উপনিষদের চিন্তাধারার আরও বিশদ এবং বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে এক এক ধরনের ভক্তের জন্য এক এক ধরনের স্বর্গের কল্পনা করা হয়েছে। যেমন বৈষ্ণবদের বৈকুণ্ঠ, শৈব ও শাক্তদের কৈলাস ইত্যাদি।

তেমনি নরকের সংখ্যাও বহুরকম। পুরাণের মধ্যে এ জাতীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। পুরাণ সাধারণ লোকের জন্য লেখা। যা থেকে বোঝা যায় সে যুগের জনগণের মধ্যে এই রকম বহু চিন্তার উদ্ভব হতো এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নিতেন একশ্রেণীর ধান্ধাবাজ ব্রাহ্মণ। যার ফলে শ্রাদ্ধ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণকে দান ইত্যাদির প্রথা সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে আমরা মহাভারতে বর্ণিত স্বর্গ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে পারি। এই বর্ণনাগুলি বিচিত্র প্রকৃতির। ভীষ্মপর্বে বলা হয়েছে যে শঙ্কর থাকেন শাকদ্বীপে ও নারায়ণ কুশদ্বীপে। শাক ও কুশদ্বীপের বিবরণ অর্থাৎ নদ নদী, পাহাড় পর্বত, বনভূমি ইত্যাদির যে রকম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এটা প্রাক্তন সোভিয়েত দেশের (রাশিয়া) অন্তর্গত এশিয়া মহাদেশের অংশ। আনুমানিক একশো চল্লিশ খৃষ্টাব্দে লিখিত টলেমির ভূগোলে 'স্কাইথিয়া বিয়ণ্ড ইণ্ডাস'-এর যে বিবরণ আছে তার সঙ্গে মহাভারতের বর্ণনায় যথেষ্ট মিল আছে। ভীষ্মপর্বেও বলা হয়েছে যে শাকদ্বীপ ও কুশদ্বীপ ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত। দ্বীপ শব্দটির অর্থ এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তী যুগে দ্বীপ বলতে যা বোঝায় এ দ্বীপ কিন্তু ঠিক সে রকম নয়।

মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের বর্ণনায় বোঝা যায় ওঁরা হিমালয় পর্বতের পরপারে যাচ্ছিলেন। সেখানকার ভৌগোলিক পরিবেশের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় মধ্য এশিয়াকে স্বর্গ না বললেও মধ্য এশিয়া যে একটা পুণ্যভূমি এবং সেখান থেকে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব, তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে এই রকম একটা প্রবাদ আছে যে হরিদ্বার হল স্বর্গের প্রথম দ্বার এবং দ্বিতীয় দ্বার কেদার। কোন ভক্ত হয়তো এটা কল্পনা করেছেন কিন্তু তার পিছনে লুকিয়ে আছে ঐতিহাসিক কিছু তথ্য।

আত্মার অস্তিত্ব তিব্বতীরাও বিশ্বাস করেন। তাঁদের ধারণা নরকে সাংঘাতিক হিমপ্রবাহ রয়েছে আর সে নিদারুণ ঠাণ্ডায় দুষ্কৃতকারীদের আত্মা প্রচুর কষ্টভোগ করে। অন্যদিকে স্বর্গে আছে উষ্ণ প্রবাহ ও মনোরম পরিবেশ যেখানে বিদেহী আত্মা পরম সুখে বাস করতে পারে। স্বর্গ ও নরকে যথাক্রমে সুখ এবং দুঃখ, এটাই পরলোকতত্ত্বের মূল কথা।

সুখ দুঃখের কল্পলোক ছাড়াও নানাধরনের সংস্কার ও কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বর্গ ও নরকের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেঁথে আছে। উত্তর ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের আগে পরলোক সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ধারণার প্রচলন ছিলো। সেখানকার মানুষ বিশ্বাস করতো মানুষের মৃত্যুর পর তাদের বিদেহী আত্মা ছোট ঢিবি বা টিলার মধ্যে বসবাস করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ওরা কবরের পাশে ছোট ছোট ঢিবি বা টিলা তৈরি করতো। এ বিশ্বাস কি ভাবে রূপ পেয়েছিল সেটা নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন উপজাতির বিশ্বাস মৃতের আত্মা প্রথমে জলের নীচে নেমে যায়; তারপর সেই আত্মাকে হাঙ্গর, কুমীর, বড় বড় মাছ ইত্যাদি জলজ প্রাণীরা খেয়ে ফেলে এবং সেই সমস্ত প্রাণীর পেটের মধ্য দিয়ে আত্মারা কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গ বা নরকে যায়। এই স্বর্গ পৃথিবীর অনেক উপরে। আবার কারো কারো মতে সায়াহ্নে সূর্য যেখানে অস্ত যায়, স্বর্গ ঠিক সেইখানে। সে স্বর্গ কেমন? দুঃখ সেখানে পৌঁছতে পারে না, বন্ধুরা সেখানে প্রতারণা করে না, মানুষ সেখানে শিকারে সফল হয়। সেখানকার মেয়েরা সবাই খুব সুন্দরী ও সতীসাধ্বী।

কুমির, হাঙ্গর ইত্যাদির উদরেব মারফত যে কল্পলোকের সৃষ্টি হয়েছে সেখানেও রয়েছে ইহলোকের সমস্ত কামনার চরিতার্থতা। উত্তর আমেরিকার এক ধরনের আদিবাসীদের মধ্যে এক স্বর্গ বিরাজ করছে, সেখানে দিনরাত আনন্দের উৎসবের জোয়ার চলছে, সুন্দরী মেয়েরা নাচছে, প্রচুর খাদ্যবস্তু পানীয় কোন কিছুর অভাব সেখানে নেই। পূর্বদিকে যেখানে সূর্য ওঠে এ স্বর্গ সেখানেই। দেহ ছেড়ে আত্মারা ঐ স্বর্গে চলে যায়।

সেই দেশেরই আর এক উপজাতির বিশ্বাস স্বর্গ মাটির নীচে। অস্তগামী সূর্য যখন ধীরে ধীরে মাটির নীচে চলে যায় সেইসঙ্গে আত্মাও কল্পলোকে যায় সুখের সন্ধানে। এই জাতীয় বিশ্বাসের মূল সূত্র হয়তো চেষ্টা করলে খুঁজে পাওয়া সম্ভব কিন্তু হাঙ্গর কুমীরের পেটে যাওয়া কিংবা আত্মার বন্য প্রাণী কিংবা পাখির (বিশেষতঃ প্যাঁচা) রূপ ধারণের পেছনে কি সূত্র রয়েছে এটা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের রিভিলেশন অধ্যায়ে যে স্বর্গের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত তার মধ্যে একদিকে রয়েছে ভক্তি এবং জ্ঞানের সংমিশ্রণ অন্যদিকে আদর্শ। জনজীবনের ছায়াও তাতে প্রবেশ করেছে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখি ঈশ্বরের রাজ্যের ছবি যেখানে ভক্তরা নিরবচ্ছিন্ন সুখে বাস করে; অন্যদিকে দেখতে পাই কর্মফলে বিশ্বাস। মানবজাতি তাদের গৌরব এবং সম্মান সেই জগতে বয়ে নিয়ে যায়।

আমাদের পুরাণ ইত্যাদির মধ্যেও এই দুই ধরনের বিশ্বাসই রয়েছে। যদিও সে সব স্থলে বর্ণনাগুলি এসেছে অনেক রূপকথার মাধ্যমে। নিউ টেস্টামেন্টের অনেক জায়গায়

অবশ্য স্বর্গকে কেন্দ্র করে এরকম ঘটনার অবতারণা দেখা যায়। ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে আমরা কিন্তু এরকম একটা উজ্জ্বল ছবি দেখতে পাই না। সেখানে ভক্তরা ভগবানের সঙ্গে সুখে বাস করছে অথবা কৃতী এবং কর্মীরা তাদের কাজের সুফল লাভ করছে।

জেনেসিস-এর মধ্যে আবার কবর ও স্বর্গ-নরকের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখানো হয়নি। এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে জেনেসিস-এর লেখক কবরকেই শেষ বলে গণ্য করেছেন। অন্যত্র দেখা যায় স্বর্গ বলতে আকাশের উপর ও নরক অর্থে মাটির নীচে কোন স্থান এই রকম বোঝানো হয়েছে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে পরলোক সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচলিত ছিলো বা এই মতবাদকে কেন্দ্র করে যে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের উদ্ভব হয়েছিল, কথায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পাপীরা কি ধরনের ভয়ানক নরকে স্থান পাবে তার একটা চিত্র হোমারের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। অন্যদিকে এম্পিডক্লিস বলেছেন যে ঈশ্বরের সঙ্গ ছেড়ে আত্মা জগতে এসে মুসাফিরের মতো ঘুরে বেড়ায়। প্রাচীন গ্রীসে একাদল বিশ্বাস করতেন যে প্রথমে সব আত্মাই পবিত্র ও পাপমুক্ত অবস্থায় জগতে আসে তারপর নিজ নিজ কর্মবিপাকে তারা সুখ-দুঃখ পায়।

এইরকম কথা আমাদের উপনিষদেও বলা হয়েছে। পুণ্যাত্মারা সুন্দর জীবন লাভ করেন আর যারা পাপী তারা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি হয়ে জন্মায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন ঃ

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যাঁর হয়েছে তাঁর মৃত্যু হলে তিনি উত্তম তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রাপ্য প্রকাশময় দিব্যলোক সকল প্রাপ্ত হন। রজোগুণ বৃদ্ধিকালে দেহত্যাগ করলে কর্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় মরণ হলে পশ্বাদি মূঢ় অথবা তীর্যক যোনিতে জন্ম হয়।

ইতালিতে গ্রীক সভ্যতা প্রবেশ করবার পূর্বে সাধারণ ধারণা ছিলো যে মৃত আত্মা কবরেই অবস্থান করে। পরবর্তী যুগে গ্রীক-প্রভাবে এ মতের অনেকটা পরিবর্তন হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অনেক কবরের মধ্যে মাটির ছোট ছোট বাড়ি এবং বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকদের অনুমান প্রাচীন মিশরীয়দের মত সে যুগের লোকেরাও সম্ভবত বিশ্বাস করতো যে ঐ সব জিনিস মৃতের উদ্দেশে দান করা হয়েছিলো এই ভেবে যে পরলোকে আত্মা ঐগুলি লাভ করবে।

প্রাচীন মিশরের কথা এ প্রসঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে পড়ে। মিশরে যখন আমরা ইতিহাসের দ্বারে এসে পৌঁছই তখন পিরামিডের যুগ। সে কালে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে মৃত্যুর পর মৃতের দেহ যতদিন অবিকৃত থাকবে ততদিন তারা বা তাদের আত্মা স্বর্গ বা পরলোকে বাস করবে। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই 'মমি' তৈরির প্রথা

এসেছে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রসায়ন ইত্যাদি প্রয়োগে মৃতদেহ যুগ যুগ ধরে অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ক্রমে এমন একটা অদ্ভুত ধারণা বদ্ধমূল হয় যে প্রত্যেক ফারাও বা রাজা দেহান্তে স্বর্গে আবার নতুন জীবন লাভ করে এবং সেখানে তাদের মানুষের মতই চির অবস্থান। এই ধারণাকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে পরলোকের চারটি স্তর কল্পিত হয়। প্রথম স্বর্গ বা পরলোক কবরের মধ্যেই এবং এই বিশ্বাসের বশেই পিরামিড নির্মাণ শুরু ও যার মধ্যে মৃত ব্যক্তির দেহ মমি করে রাখা হতো। কবর যেন সুন্দর ও স্বর্গসদৃশ হয়। এই কবরের মধ্যে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, হীরে জহরৎ সোনাদানা ও মূল্যবান রত্নসম্ভার, তৈজসপত্র ইত্যাদি রক্ষিত থাকতো।

এই সময়ের বেশ কিছুদিন পর মিশরীয়রা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে পরলোক নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের উপর। সেখানে সব কিছুই সুন্দর মনোরম। পরে এর গায়ে আরো খানিকটা রঙ চড়ে এবং ধরে নেওয়া হয় যে স্বর্গে যে সব সুন্দর কৃষিক্ষেত্র আছে মৃতের আত্মা সেখানে চাষআবাদ করে পরম সুখে বাস করে।

পরবর্তীকালে একদল প্রচার শুরু করেন যে পরলোক মাটির নীচে। জগতে সূর্যাস্ত মানে সূর্যের মাটির নীচে চলে যাওয়া। আমাদের যখন রাত পরলোকে তখন দিন আর ঠিক সেইভাবে আমাদের পৃথিবী যখন সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, পরলোকে তখন ঘোর অন্ধকার।

অন্য সমস্ত জাতি উপজাতির কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র মিশরের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন যুগে পরলোক ও আত্মা সম্পর্কে কত উদ্ভট ধারণা স্থান পেয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মুসলমানেরাও আত্মার অস্তিত্ব ও পরলোকে বিশ্বাসী। ঐ ধর্মে 'শবে বরাত' নামে এক ধর্মীয় উৎসব আছে। বছরের ঐ একদিন সারারাত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও অনুষ্ঠানেব মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়া প্রার্থনা করা হয়।

বৌদ্ধরা যে আত্মার অস্তিত্ব, পরলোকতত্ত্ব এবং পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী তা মহাযান বা হীনযান কোন সম্প্রদায়ই অস্বীকার করতে পারেন না। স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ 'জাতক' রূপে বারবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা তো বৌদ্ধধর্মের বেদবাক্য।

প্রাচীন কাল থেকেই আত্মাকে দেহ হতে পৃথক কোন সত্তা বা শক্তি কল্পনা করা হয়েছে এবং এরকমও ভাবা হয়েছে যে আত্মা দেহের মধ্যে থাকলেই জীব প্রাণবন্ত হয়। এই আলাদা সত্তার স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টায় গুপ্তবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত হয়েছে। এ সম্পর্কে এই বইয়ের 'গুপ্তবিদ্যা' অধ্যায়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি, যার মধ্যে অনেকটাই আমার নিজস্ব গবেষণালব্ধ।

ইন্দ্রিয়বহির্ভূত সত্তাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল তার মধ্যে প্রাণ, মন ও আত্মা প্রধান। পরে এই জাতীয় চিন্তাধারা আত্মায় কেন্দ্রীভূত হয়। প্রথমে এইরকম বিশ্বাস ছিলো দেহের মধ্যে যে প্রাণশক্তি রয়েছে সেই আত্মা। প্রাচীন মানুষের পরিবারের কারো

দেহান্তর হলে তারা সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করতো এই ভেবে যে প্রাণশক্তি বাইরে কোথাও চলে না গিয়ে তাদের মধ্যেই থাকবে।

প্রাণ থেকে মনের অস্তিত্ব কল্পনাও বিচিত্র। আগে ধারণা ছিলো আত্মা এক জাতীয় নয় বহুরকম। যেমন, প্রাণশক্তিদায়ক আত্মা, বুদ্ধিজ্ঞানদায়ক আত্মা, কামনাবাসনাদায়ক আত্মা ইত্যাদি। বহু গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও পঞ্চাত্মাকে আহূতি দেবার প্রথাও রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমণ্ড ফ্রয়েড এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে। লোকায়ত দর্শনেও (লোকের পুত্র বৃহস্পতি) এই ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক চার্বাক এবং বুদ্ধের সমকালীন অজিত কেশকম্বলী প্রমুখ এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন। চার্বাকের মতে মানুষের দেহ মাটি, জল, বায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন মৌলিক উপাদানে তৈরি। মৃত্যুর পর দেহ পুনরায় ঐ মৌলিক উপাদানেই ফিরে যায় এবং জীব শেষ হয়ে যায়। আত্মা বা অন্য কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। প্রাচীন কালে এমনও একটি ধারণা ছিলো যে আত্মা মানুষের অন্য একটি সত্তা এবং তা সূক্ষ্মরূপে দেহের মধ্যে থাকলেও দেহের সঙ্গে এর বড় একটা সম্পর্ক নেই। সে আত্মা ইচ্ছামত পরিভ্রমণ ও রূপ ধারণ করতে সক্ষম। যোগীদের অতিচেতন অনুভূতি বা সাইকোকাইনেসিস (সুপার কনসাস মাইণ্ড) এর প্রমাণ। মধ্যএশীয় বৌদ্ধ শ্রমণেরা (শ্রমণ) আত্মাকে নাকি দেহ ছেড়ে অন্যত্র পাঠাতেও সক্ষম হতেন। একে অকাল্ট ফ্যাকালটির প্রয়োগ—এই রকম আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের ধারণা মানুষের দুটি আত্মা থাকে। একটি আত্মা কবরখানার চারদিকে ঘোরাফেরা করে ও অন্য আত্মাটি স্বর্গে যায়।

ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস মৃতদেহের চারদিকে আত্মা ঘিরে থাকে। সময় সময় আত্মা বিচিত্র দেহও ধারণ করে। এই জাতীয় 'বায়োপ্লাজমিক বডি' বা 'একটোপ্লাজম' কর্তৃক রূপ ধরা দেহের বর্ণনা বহু জায়গায় পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের মানুষের এই রকম আর একটি ধারণা ছিলো জীব এবং জড় উভয়েরই সূক্ষ্ম সত্তা অথবা আত্মা বর্তমান। এর থেকেই 'সর্বপ্রাণবাদ'-এর সৃষ্টি হয়েছিল।

সেমেটিকদের মধ্যে এইরকম বিশ্বাস ছিলো যে মানুষের দুটো অংশ। একটি তার শরীর অন্যটি তার অন্তর্সত্তা যা দৃশ্যমান নয়। প্রথমে তারা এই অন্তর্সত্তাকে শ্বাসপ্রশ্বাস ভেবেছিলো; এটা ভারতীয় যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত। শ্বাসপ্রশ্বাসকে প্রাণ কল্পনা করে এর থেকেই প্রাণায়ামের সৃষ্টি।

বাবিলনীয় সেমেটিকদের ও প্রাচীন সুমেরীয়দের আত্মা সম্পর্কে ধারণা সমার্থক। প্রাণশক্তি বা আত্মাকে তারা দেহ থেকে স্বতন্ত্র কোন কিছু হিসেবেই কল্পনা করতো।

হিব্রুরা ভাবতো মানুষ দেহ, আত্মা ও বায়ু এই ত্রি উপাদানে তৈরি। হিব্রুদের আত্মা বিষয়ে চিন্তাধারা বাবিলনীয়দের থেকেও উন্নততর হলেও সেখানে গ্রীক চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছিলো। এবং দেহের পূর্বে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনার (প্লেটোনিক চিন্তা) প্রভাবই বেশি ছিলো। প্লেটো ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ধারণা আত্মা যেন বীণার তারের ঝঙ্কার। বীণাযন্ত্র নষ্ট হলেই এই সুরও শেষ হয়ে যাবে। প্লেটোর মতে আত্মার তিনটি ভাগ-জ্ঞান, প্রাণবায়ু

ও ইচ্ছাশক্তি। আবার ফিলোর মতবাদ অনুযায়ী আত্মার দুটি রূপঃ দৈবী সত্তা (র‍্যাশানাল পার্ট) ও জৈবী সত্তা (ইর‍্যাশনাল পার্ট)।

হিব্রুদের 'মইমনি' দর্শনে গ্রীক দার্শনিকদের মতই আত্মাকে পঞ্চগুণান্বিত বলা হয়েছে, যেমন প্রাণদায়িনী, ইন্দ্রিয়াতীতা, কল্পনাপ্রবণিকা, আকাংখিকা ও বিবেকপ্রদায়িনী। এঁদের মতে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গী এবং দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয়।

হিব্রুদের 'কাবালাবাদ' আত্মা বিষয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আদম ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা না মেনে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে পাপ করে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি দশটি স্তর ভেদ করে স্বর্গ থেকে মর্তলোকে অধঃপতিত হন। কাবালাতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল, দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ, সেইজন্য এ সম্পর্কে আর কিছু লিখছি না।

আত্মা সম্পর্কে মিশরীয়দের ধারণা ও বিশ্বাসের কথা আগেই বলেছি। এ ক্ষেত্রে এইটুকু সংযোজন করছি যে মিশরীয়দের ধারণা ছিলো মানুষের মত ঈশ্বরেরও আত্মা আছে। মানুষের আত্মা দিনের বেলা কবরখানা, মরুভূমি ও রসাতলে ঘোরাফেরা করে এবং রাত্রে যদি কোন বিপদে পড়ে, বিশেষতঃ অন্য দুষ্ট বিদেহী আত্মার তাড়া, খায় তবে ভয়ে ভয়ে আবার নিজের কবরেই ফিরে আসে। মিশরীয়রা খাদ্য, পানীয়, তৈজসপত্র ইত্যাদির সঙ্গে দাসদাসীদেরও মৃতের কবরে জ্যান্ত সমাধিস্থ করতো এই বিশ্বাসে যে দাসদাসীদেরও আত্মা মৃত ব্যক্তির সেবাযত্ন করবে। তবে কালক্রমে রাজরাজড়াদের আত্মা স্বর্গে চলে যেতো এবং সাধারণ মানুষের আত্মার স্থান হতো রসাতলে।

ভারতবর্ষে আত্মার পৃথক অস্তিত্বের বিশ্বাসের ভিত্তিটি দৃঢ় হয়েছে আর্যযুগে। দেহের বিনাশের পর আত্মার অবস্থান কল্পনা থেকেই পূর্বপুরুষ পূজার প্রচলন হয়েছে।

ভারতের বেদান্ত দর্শনের সৃষ্টি জীবাত্মা ও পরমাত্মা কল্পনা থেকেই মূর্ত হয়েছে। উপনিষদের মতে এই আত্মা ক্রিয়াশীল নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। উপনিষদে অবশ্য আত্মাকে মায়া কল্পনা করা হয়েছে।

মেসোপটেমীয় (ইরাক) ধারণায় আত্মা সম্পর্কে নিশ্চিত কোন চিত্র না পাওয়া গেলেও ইরানীয় চিন্তাধারায় সেই জরথুস্ত্রের কাল থেকেই আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাকে বহু নামে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন ফ্রবশি, খ্রভ, অহু, বীর, হোস ও উরবান ইত্যাদি। এখানে আত্মাকে বাস্তব ও অধ্যাত্ম এই দুই রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

গ্রীকদের মধ্যে হোমারের যুগ পর্যন্ত আত্মা বিষয়ে সে রকম কোন নির্দিষ্ট ধারণা ছিলো না। তবে এরাও মৃতদেহ কবরস্থ করতো খুব নিষ্ঠার সঙ্গে এবং দেহকে অবিকৃত রাখার একটা প্রয়াসও এদের মধ্যে ছিলো। হোমারের যুগের গ্রীকেরা মৃতদেহ অগ্নিতে আহুতি দিতো এবং পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে এটাও প্রচার করতো। গ্রীক কবি হোমার আত্মার পুনরায় দেহগ্রহণকে অমরত্ব আখ্যা দিয়েছিলেন।

গ্রীসে মৃতদেহ কবরস্থ করার প্রথাও যে ছিলো তা আগেই জানিয়েছি। এরা শ্রাদ্ধজাতীয়

ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপও (অ্যাথেসটেরিয়া) করতো এবং আত্মা বিশাল একটা নদী পেরিয়ে (বৈতরণী ?) পরলোকের পথে পাড়ি দেয়—এ বিশ্বাসও ওদের ছিলো।

তবে গ্রীসে সক্রেটিসের সময়কালেই এবং তারপর থেকে আত্মা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও চিন্তাধারার প্রচলন হয়েছে। আবার আরিস্টটল 'আইওনিয়ান' হবার ফলে আত্মার প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাকে অস্বীকার না করলেও প্লেটোর প্রভাবকে মেনে নিয়েছিলেন।

যাই হোক নজির আর না বাড়িয়ে আমরা বলতে পারি ভারতীয় দর্শন মতে ভগবান যেমন মানুষের কল্পনার সৃষ্টি, আত্মা ও পরলোক ঠিক সে রকমই কাল্পনিক।

যাদের কাছে ঈশ্বর বিরাট বিশাল মহাজাগতিক শক্তি (কসমিক ফোর্স), ভগবান তাদের কাছে পরলোকে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণ মানুষ কিন্তু খোঁজে 'কোথায় পাব তাঁরে' সেই ঈশ্বর, স্বর্গ, ভগবান। যখন সে কিছুই পায় না তখন সে এপিকিউরিয়ান, চার্বাকপন্থী বা নাস্তিক। কিন্তু মানুষের আদিম মনে (প্রিমিটিভ মাইণ্ড) দীর্ঘস্থায়ী যে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস তা কি সহজে বিলীন হবে!

গুপ্তবিদ্যা

জীবনে কি বিচিত্র অভিজ্ঞতাটাই না হয়েছে!

কত দেশ বিদেশ বেড়িয়ে অজস্র অদ্ভুত লোকের সান্নিধ্যে এসেছি চিকিৎসক হিসেবে, লেখক হিসেবে, জ্যোতিষী হিসেবে ও সাধক হিসেবে—বিশেষতঃ তন্ত্রসাধনার সময়।

সাধকেরা ভেতরে যে কে কী ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই। বাইরেটা বিচার করে কাউকে মনে হবে আস্ত পাগল, কাউকে মনে হবে স্রেফ হামবড়া, কাউকে মনে হবে নিরেট ভণ্ড। কিন্তু একটু তলিয়ে যদি তাদের গভীরে ঢুকতে পারা যায় তাহলে ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে।

দীর্ঘকাল সাধুসঙ্গ করে দেখেছি বেশ কিছু উচ্চমার্গের সাধক (স্তরভেদে), খুব সযত্নে নিজেদের পাঁচজনের কাছে আড়াল করে রাখেন কোন কিছুর আবরণে। এইরকম একজন তন্ত্রসাধক ক্ষ্যাপাবাবা। বাইরে থেকে মনে হবে একজন ভণ্ড, অশ্লীল খেউড়বাজ লোক। মুখ খুললেই নোংরা ভাষার ফুলঝুরি। যৌন বিষয় ছাড়া অন্য কোন আলোচনা যেন ওঁর মনে ধরে না। ঘুরে ফিরে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন আর সেই সঙ্গে আছে অভিধান ছাড়া খিস্তিখেউড়, শুনলেই গা রি রি করে ওঠে।

এক সাধক বন্ধুর কাছে খবর পেয়ে গিয়েছিলাম ক্ষ্যাপা বাবাব ডেরায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে ২৫ নম্বর বাসে চাপাডাঙ্গা, তারপর সেখান থেকে বেশ কয়েক মাইল পায়ে চলা মেঠো পথ। গভীর জঙ্গলের মধ্যে নির্জনে বাবার নিবাস।

ছোট্ট একটা মাটির ঘর। সঙ্গে বাবার গৃহিণী! নাকি ভৈরবী! নাকি সাধন প্রেয়সী! তা যাই হোন সেইরকম এক মহিলা আর গোটা তিনেক কুকুর—এই নিয়েই সংসার।

বাড়ির সামনে জঙ্গলাকীর্ণ দাওয়ার মুক্ত পদ্মাসনে বাবা বসে আছেন। চারদিকে বেশ কিছু ভক্ত ও দর্শনার্থী। বাবা অনর্গল বকে চলেছেন। বেশির ভাগই অশ্লীল শব্দ। সামনে বড় মাটির ভাঁড় ভর্তি দেশী মদ। সে আর ফুরোচ্ছে না। বাবা চুমুক মারতেই চেলা চামুণ্ডারা বোতল থেকে ঢেলে ভাঁড় ভর্তি করে দিচ্ছে। প্রায় বৃদ্ধ ক্ষ্যাপা বাবা নির্বিকারে কারণ সুধা পান করছেন। একজন বৃদ্ধ গোছের মানুষ প্রশ্ন করলেন "বাবা ভগবান কি?"

বাবা মুখে রহস্যময় হাসি টেনে বললেন "ভগে বাণ ইক্লিগালটু ভগবান।"

প্রশ্নকর্তা ছানাবড়া চোখে হাঁ করে তাকাতেই বাবা বিকট হেসে উঠলেন "বুঝলি না তো বেজম্মার বাচ্চা! তোর জন্ম দিয়েছে কে? ভগবান। এই দ্যাখ ভগবান" বলেই বাঁ হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্রিত করে গোলাকার রূপ দিলেন ও সেই গর্তের মাঝখানে ডান হাতের তর্জনিটা সজোরে গলিয়ে দিয়ে বললেন "দ্যাখ্, এই হল গিয়ে ভগবান"।

এ ছাড়াও দেখেছি যে যাই প্রশ্ন করছেন ক্ষ্যাপাবাবা অযথা অন্য প্রসঙ্গ ও অশ্লীলতা টেনে আনছেন। খেউড় ছোটাচ্ছেন। অথচ শুনেছিলাম তন্ত্র সম্পর্কে এঁর অসাধারণ জ্ঞান।

একরকম বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে যাব যাব ভাবছি হঠাৎ একজন সৌম্যদর্শন যুবক ঠিক আমার অন্তরের প্রশ্নটাই ছুঁড়ে দিল, "বাবা, আমি তন্ত্র সাধনা সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছিলাম। বলবেন কি?"

বাবা যুবকটির দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে এক চুমুক কারণ সেবন করে বললেন, "তন্ত্র হচ্ছে বেনে বাড়ির যুবতী মেয়ে। সে পাছায় আলতা মাখে। পাতলা ফিনফিনে হালকা রঙের দামী সিল্কের শাড়ি পরে, ভেতরে সায়া থাকে না...।"

আমি আর থাকতে না পেরে ওঁর কথার মধ্যেই ব্যাজার হয়ে বললাম, "আপনি এত অপ্রাসঙ্গিক অশ্লীলতা আনছেন কেন?"

আমার কথা শেষ হবার আগেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন ক্ষ্যাপা বাবা "তুই কোথাকার কোন হরিদাস পাল? এর চেয়ে মার্জিত ভাষা আমার মুখ থেকে বেরোয় না। শুনতে হয় শোন না হলে দূর হ। যত সব চ্যাংড়ার দল!"

তারপর আপন মনে কিছুক্ষণ বিড় বিড় করে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে বললেন "তন্ত্র হচ্ছে চটক সুন্দরী। তার মনভোলানো রূপ, লোক দেখানো ছলাকলা আর নিজেকে লোভনীয়া করতে কত রকম সাজের বাহার। সেটা বোঝাতেই বেনে বাড়ির মেয়ের কথা বলেছিলাম। শোন বাবা, কোন কিছুই অপ্রাসঙ্গিক আর অশ্লীল নয়। অত চটজলদি ওপর ওপর কিছু শেখা বা জানা যায় না। ধৈর্য চাই। সাধনা চাই। নিষ্ঠা চাই। তন্ত্র সম্পর্কে জানতে গেলে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম এবং অধ্যাত্মবাদের উৎপত্তি এই সমস্ত জানতে হবে।"

এক দিনের জন্য ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। মুগ্ধ হয়ে থেকে গেলাম তিন দিন। উনি ঝাড়া তিন দিন ধরে নৃতত্ত্ব বুঝিয়ে গেলেন। আমার এই বিষয়ে কিছু পড়াশোনা ও কাজ আছে। বুঝলাম ওঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আর এ বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা যা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। কথায় কথায় দেশ বিদেশের বহু বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক খ্যাতনামা নৃতত্ত্বের (অ্যানথ্রোপোলজি) অধ্যাপকের একটি পুস্তকের পাতার পর পাতা যেন মুখস্থ বলে গেলেন। উনি যা যা বলেছিলেন লিখে রেখেছিলাম। তারই প্রতিলিপি এখানে তুলে দিচ্ছি।

সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকেই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধিআত্মিক (আধ্যাত্মিক) ভীতিসমূহ মানব জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং ভয়ের ঔরসে, কল্পনার গর্ভে ও কুসংস্কারের অনুপ্রেরণায় মানুষের অচেতন মনের কোন গভীর স্তর থেকে ঈশ্বর প্রকট হয়েছেন।

এই ঈশ্বর বা ভগবান তা তিনি অরূপ, স্বরূপ, অপরূপ যাই হোন না কেন, 'ধর্ম' তাঁকে জড়িয়ে রয়েছে।

ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরুপণ করা কঠিন। ধর্ম শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল—যা ব্যক্তি বিশেষকে ধারণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট যা কর্মধারা রয়েছে তা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করাই হ'ল ধর্ম। বিস্তৃত অর্থে বলা যায় ব্যক্তিবিশেষের যাবতীয় আচার, আচরণ ইত্যাদি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক ও নৈতিক আচার, আচরণ ছাড়াও যেহেতু অধ্যাত্মচেতনাও ব্যক্তি বিশেষকে ধারণ করতে সক্ষম সুতরাং সেও ধর্মের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। সুতরাং লৌকিক, অলৌকিক, পারলৌকিক সমস্ত রকম সামাজিক কর্মাচরণও ধর্ম। হিন্দু মতে ধর্ম অর্থে চারটি আশ্রমের উপযুক্ত চতুর্বর্ণের নির্দিষ্ট যাবতীয় কর্মধারাকেই বোঝায়।

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানী যেমন কান্ট, টাইলর, জেমস্, ম্যারেট, ফ্রেজার, স্পেনসার প্রমুখ এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কারো মতে ধর্ম মানে অদৃশ্য যে সমস্ত নিযম আছে তার প্রতি অটুট বিশ্বাস। এই অদৃষ্ট বা ঈশ্বর প্রদত্ত নিয়ম কানুন ঠিকমত পালন করতে পারলে মানুষেব কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী অন্যথায় সমূহ বিপদ।

এই বিশ্বসংসার ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন "তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন গাছের একটা পাতাও নড়তে পারে না।" মানুষ যদি সেই সর্বশক্তিমান ইচ্ছাময়কে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে তবে তা শুভ ফলপ্রদ। ঈশ্বব সচ্চিদানন্দ। তিনি নিত্য অর্থাৎ চিরস্থাযী। কেউ কেউ মনে করেন ধর্ম অতিপ্রাকৃত কোন কিছুর প্রতি এক চেতনা- আচ্ছন্নকর অনুভূতি যেটা কৌতূহল, ভয় ও ভক্তির উপর নির্ভরশীল।

অনেকে ভেবেছেন অতীত পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন ধরনের পূজাপদ্ধতি থেকে ধর্মের উদ্ভব হযেছে। ধর্ম একটা আদিম যুগীয মনোভাব যা অতীন্দ্রিয় রহস্যময় আশ্চর্য শক্তিকে বিশ্বাস করে। আবার অনেকে ভেবেছেন, দৈনন্দিন কর্তব্য কর্ম পালনকে স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক আদেশ হিসেবে মেনে চলার প্রবণতা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। কারো কারো মতে ধর্ম নিছকই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নির্ভর। এটা জ্ঞানের প্রকারান্তরও হতে পারে। জীবাত্মার পরমাত্মা সম্পর্কে কুয়াশাচ্ছন্ন, ভযমিশ্রিত বিচিত্র জ্ঞান। এ জ্ঞান পূর্ণ সত্যের রূপান্তরিত বিচ্ছুরণ।

মানুষ যখন গুহাবাসী ছিল, তাকে প্রাকৃতিক ও অন্যান্য প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে বাঁচতে হযেছে। তাকে অহরহ হিংস্র জন্তু জানোয়ারেব সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। এমনি করে একদিন সে 'শক্তি'কে অনুভব করেছে। সে দিন থেকেই শুরু হয়েছে প্রতীক পূজা বা 'টোটেমিজম'।

এইরকম কল্পনা করা যেতে পারে যে প্রাগৈতিহাসিক আদিম এক অরণ্যচারী মানুষের সামনে এল এক হিংস্র জানোয়ার। শুরু হল দুজনের তুমুল লড়াই 'স্ট্রাগল ফর এগজিসটেন্স'। বহু চেষ্টা করেও মানুষ জন্তুটির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। হেরে যায় যায়, এমন সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা ভাঙ্গা গাছের ডাল। মানুষ সেই

গাছের ডালটি তুলে সজোরে আক্রমণ করল জন্তুটিকে। হিংস্র শ্বাপদ পরাভূত হল সহজেই। মানুষ অবাক হয়ে ভাবল এতদিন খালি হাতে যুদ্ধ করে নাস্তানাবুদ হয়েছি কিন্তু গাছের ডালটি সহজেই জন্তুটিকে ধরাশায়ী করল! তবে নিশ্চয়ই আশ্চর্য কিছু একটা রহস্যময় ব্যাপার আছে এই গাছের ডালটার মধ্যে যার জোরেই আজ আমি জিতলাম। এক্ষেত্রে 'সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট' মনে আসছে কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ থাক। যাই হোক মানুষ কিন্তু সেদিন তার নিজের শক্তি বুঝতে পারেনি, ভেবেছে ঐ গাছের ডালটার মধ্যেই রয়েছে কোন আশ্চর্য অদৃশ্য রহস্যময় শক্তি। সুতরাং সে ঐ গাছের ডালটিকেই অতিপ্রাকৃত শক্তি হিসেবে পূজা শুরু করল ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নত হয়ে। সেই প্রথম 'শক্তি' পূজার সূত্রপাত। ঐ গাছের ডালটিই প্রথম প্রতীক-ঈশ্বর বা টোটেম। এর পর প্রস্তর যুগ এসেছে। মানুষ দৈনন্দিন কাজে পাথরের ব্যবহার শিখেছে। কাজ পেয়েছে খুব। তখন তার অন্তরের শিল্পীসত্তা একটা পাথরকে ঐশ্বরিক রূপ কল্পনায় মূর্ত প্রতীক করে পূজার বেদীতে প্রতিষ্ঠা করল। এমনি ভাবে যুগে যুগে ক্রম বিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায় পেরিয়ে মানুষ সভ্য হয়েছে কিন্তু তার নির্জ্ঞান মনস্তত্বে সেই যে আদিম ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল—বুদ্ধি দিয়ে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়েও সেই ঈশ্বরকে মুছে ফেলা এখনও সম্ভব হয়নি বরং মানুষ-সৃষ্ট ঈশ্বরও ক্রমবিবর্তনের ধারা পেরিয়ে নব নব রূপে রূপায়িত হচ্ছেন।

উপনিষদ বলেছেন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" কিন্তু সেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে রূপহীন নিরাকার জ্ঞানে উপাসনা করা খুবই দুরূহ কাজ, এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি মনে আসছে—মানুষ যেহেতু ঈশ্বর কল্পনা করেছে সেহেতু ঈশ্বরকে মানবীয় রূপই দিয়েছে। মাছ যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করত তবে সে ঈশ্বরকে মাছের মতই একটা অবয়ব দিতো।

যাই হোক মোটামুটি ধর্ম সম্পর্কে এইটুকু বলা যায়। ধর্ম মানুষের চেয়েও বলশালী কোনো অতিপ্রাকৃত বিশাল মহান শক্তি বা শক্তি সমষ্টিকে বিশ্বাস বা ধারণা এবং সে থেকেই ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম ইত্যাদি প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির জাগ্রত রূপ, যার ফলে নানা ধরনের রিচুয়ালিস্টিক কর্মপ্রণালী অর্থাৎ নিয়ম নিষ্ঠা, পূজা অর্চনা, আচার আচরণ, হোম যজ্ঞ ইত্যাদির সৃষ্টি এবং সেগুলো পালনে কিছু প্রাপ্তিযোগের আশা।

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বলা প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন দার্শনিক, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুগে যুগে যেটুকু জ্ঞান চয়ন সম্ভব হয়েছে তার থেকে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের যেমন—সর্বপ্রাণবাদ (অ্যানিমিজম), টোটেম পূজা (টোটেমিজম), মানাবাদ (ডকট্রিন অফ মানা), প্রেত আরাধনা (ঘোস্ট ওয়ারশিপ), ইন্দ্রজাল ও ধর্ম (ম্যাজিক অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন) সৃষ্টি হয়েছে।

ম্যাক্সমুলার বলেছেন, "মানুষের ইতিহাস হল ধর্মের ইতিহাস।" ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ছাড়াও আরও একটি রহস্যময় জগৎ আছে যা অপার্থিব শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার তাকে জানতে ও পেতে চেয়েই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। ধর্ম এক বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সুতরাং তাকে কেবলমাত্র দর্শনতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ারও প্রয়োজন। কিন্তু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে গেলে

ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সমূহের দার্শনিক বিশ্লেষণেরও দরকার আছে। বিজ্ঞান বুদ্ধি ও যুক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক ভূমিকা মূলতঃ গৌণ। এখানে অনুভূতি ও বিশ্বাসই প্রাধান্য পায়। যেখানে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও অপার্থিব প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা সেখানে বুদ্ধিনিরপেক্ষ কোন সত্তা ঐশ্বরিক কোন রহস্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনেই উন্মুখ হয়েছে। সৃষ্টিকল্পে ধর্ম ছিল স্থূল প্রকৃতির অঙ্গ। অস্পষ্ট কোন অবস্থা থেকে ধর্মের উদ্ভব। এখন ধর্মের উৎপত্তির সর্বপ্রথম যে বিজ্ঞানভিত্তিক মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে সেটি হচ্ছে সর্বপ্রাণবাদ। এখানে আত্মার ধারণা থেকেই ধর্মের উদ্ভব চিন্তা করা হয়েছে। আদিম মানুষ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটা স্তরে ভেবেছিল জীবজন্তু, গাছপালা, এমন কি জড় পদার্থসমূহ যেমন মাটি, পাথর, মেঘ ইত্যাদির মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। মানুষ তখন দৃশ্যমান যাবতীয় কিছুকেই তার নিজের মত প্রাণবন্ত বলে মনে করত অর্থাৎ সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা প্রাণময় আত্মা ক্রিয়াশীল বলে ভাবত। এটিই ধর্ম সৃষ্টির আদিতম রহস্য। প্রাণময় আত্মাপূর্ণ বিশ্বজাতির কল্পনা থেকেই (সর্বপ্রাণবাদ) ধর্মের প্রকৃত উৎপত্তি।

মানবের আদিম মনের ঐ ধারণা থেকেই তারা শক্তিমান আত্মাকে তুষ্ট, শুভ আত্মার স্তুতি, অশুভ আত্মার বিতাডন ও বিনাশের চেষ্টা করেছে এবং তা থেকেই ইন্দ্রিয়াতীত কোন সূক্ষ্ম সত্তার উদ্ভব হয়েছে। এই সর্বপ্রাণবাদ ক্রমশঃ নানা ক্রমবিবর্তনের স্তর পেরিয়ে সর্বাত্মবাদে (স্পিরিচুয়ালিজম) উন্নীত হয়েছে এবং একসময় বুদ্ধি দিয়ে অধ্যাত্মবাদের একটা দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

পূর্বপুরুষদের উপাসনা ও প্রেতপূজা থেকেও ধর্মের উৎপত্তি সম্ভব, এ রকম ধারণাও কারো কারো মনে এসেছে। প্রেতপূজা সর্বপ্রাণবাদেরই একটা পরিবর্তিত বা বিশিষ্ট রূপ বলা যায়। দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে গেলেই জীবের মৃত্যু হয়, এ ধারণা সুপ্রাচীন। প্রাচীন মানব মনে এরকম একটা ভাবের উদয় হয়েছিল যা এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্তমান—মৃত মানুষের আত্মা অসীম শক্তির অধিকারী এবং সে মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম। অবশ্য সেই আত্মা ভালো যে করতে পারে না এমন নয় তবে ক্ষতির ভয়টাই মানুষকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই মৃত আত্মাকে তুষ্ট রাখতে নানা উপচারে ও অনুষ্ঠানে তার পূজা অর্চনার রীতির উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই থেকেই (প্রেত পূজা) ধর্মের সৃষ্টি বলে অনেকের ধারণা।

কেউ কেউ আবার টোটেমবাদকেই ধর্মের প্রাচীন ও আদিতম রূপ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। এই টোটেমবাদের বিশ্বাস বিশ্বব্যাপী এবং টোটেমবাদ থেকেই ঈশ্বরের বহু রূপ কল্পিত হয়েছে। টোটেম বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা এবং তা সংহতির প্রতীক। টোটেম ঐশী শক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। কিন্তু টোটেমকে ক্রিয়াশীল রাখে যে সত্তা তা বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতর।

টোটেমকে ঠিক ঈশ্বর বলা সম্ভব নয়। ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন বা ঈশ্বরকল্প বা বিকল্প কিছু কিংবা অতি ক্ষমতাবান অপ্রাকৃত কোন জিনিস যা প্রাকৃতিক রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপিত। টোটেম শ্রদ্ধার পাত্র। টোটেম একটি প্রজাতি। যেমন বিশেষ শ্রেণীর কোন

প্রাণী। গাছপালা, লতাগুল্ম যার সঙ্গে বিশেষ কোন সামাজিক গোষ্ঠী বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টোটেমকে সেই গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে। টোটেম কখনই মানুষ নয়। মনুষ্যতর জীব বা বস্তুবিশেষ। কিন্তু একে দেবতাজ্ঞানে পূজা ও বংশচিহ্ন হিসেবেও গ্রহণ করা হয়। এই টোটেমবাদকেই কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় মতবাদ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষতঃ আদিবাসী জীবনে টোটেমের প্রভাব প্রচণ্ড।

নৃবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের আদিবাসী, তাদের বিশ্বাস, ধর্ম, এবং অন্যান্য বিষয়ে যুগ যুগ ধরে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আদিবাসী সমাজে টোটেমিজম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত এইটুকু জানা সম্ভব হয়েছে যে সাধারণভাবে টোটেম আদিবাসী পরিবার, বংশ ও কুলের বিশেষ প্রতীক চিহ্ন হিসেবে উপস্থাপিত। আদিবাসী পরিবার, বংশ বা কুলকে নৃবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'ক্ল্যান' বলা হয় যা হিন্দু গোত্রের মত এক ধরনের সামাজিক আইডেনটিটি। বিশেষ প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে বিশেষ ক্ল্যানের কোন নিবিড় সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। এ সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে টোটেমকে চিন্তা করা হয়। টোটেম কোন প্রাণী, বৃক্ষ, লতা, পোকা মাকড়, এবং তা ছাড়াও কোন অতিপ্রাকৃত অপার্থিব বস্তুও হতে পারে। আদিবাসীদের বিশ্বাস ঐ সমস্ত প্রাণী বা বস্তু থেকেই তাদের উৎপত্তি হয়েছে। এবং তারা নিজ নিজ ক্ল্যান অনুযায়ী সৃষ্ট টোটেমের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম প্রদর্শন ও পূজা করে থাকে। সুতরাং টোটেমের প্রতি সংশ্লিষ্ট ক্ল্যানের সম্পর্ক এবং তার প্রতি ভয়ভক্তি মিশ্রিত বিশেষ আচরণকেই টোটেমিজম বলা হয়। বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ লুই-এর মতবাদ অনুযায়ী টোটেমিজম- এর মূলতত্ত্ব দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রয়েছে। একটি হচ্ছে নির্দিষ্ট ক্ল্যান ও অন্যটি সেই ক্ল্যানের নির্দিষ্ট প্রাণী বা বস্তু যাদের ভাবমূর্তি প্রকাশিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট ক্ল্যান তাদের নির্দিষ্ট টোটেমকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে। এই টোটেম যদি কোন খাদ্যসামগ্রী হয় তবে তাকে হত্যা করা ও ভক্ষণ নিষিদ্ধ। টোটেম বিশ্বাসী আদিবাসীরা বিশ্বাস করেন টোটেম সংক্রান্ত বিধিনিষেধ (ট্যাবু) ভঙ্গ করলে ক্ল্যান-ভুক্তরা অদৃশ্য শক্তির কোপদৃষ্টিতে পড়বেন।

আমাদের দেশের বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে গণ্ডদের টোটেম হল সজারু, ছাগল, টিকটিকি, কুমড়ো, আম ইত্যাদি। সাঁওতালদের মধ্যে প্রায় ১২টি ক্ল্যান রয়েছে। তাদের টোটেমগুলি বিচিত্র ধরনের। সরেন গোষ্ঠীর টোটেম হল তারা, হাঁসদার বুনো হাঁস, পাউরিয়ার পায়রা, বিরহোড়দের অনেকগুলি অদ্ভুত টোটেম তার মধ্যে উল্লেখ্য নীলগাই, শকুন, বনবিড়াল, কচ্ছপ, গোখরো সাপ, চাল, বুনো ঘাস। খাসীদের টোটেম কুমড়ো, কাঁকড়া। মুণ্ডাদের টোটেম জুন মাস, আষাঢ় মাস, পূর্ণচন্দ্র। ওরাওঁদের টোটেম লোহা ও লবণ।

ক্ল্যান ও টোটেমদের মধ্যে পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক অর্থাৎ একই ক্ল্যানগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ কিংবা অন্য ক্ল্যান গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহ অর্থাৎ এণ্ডোগেমাস ও এক্সোগেমাস বিবাহ প্রথা চালু আছে। আর ভীল আদিবাসীদের মধ্যে একই ক্ল্যান কিংবা ভিন্ন ক্ল্যানের একই টোটেম হলে ওদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না।

ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে অপর একটি মতবাদ হচ্ছে মানাবাদ। এটি প্রাচীনতম ধর্মীয় মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে অতিপ্রাকৃত, আশ্চর্যজনক, বিচিত্র যাবতীয় কিছুর পিছনেই রয়েছে অদৃশ্য কোন রহস্যময় শক্তি। এই মনোভাব থেকেই আদি ধর্মের সৃষ্টি। মানাবাদ প্রাক-প্রাণবাদী ধর্মীয় মতবাদ।

আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মতে সর্বপ্রাণবাদের আগে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল ইন্দ্রজাল থেকে। সর্বব্যাপী, নৈর্ব্যক্তিক, রহস্যাবৃত সমস্ত শক্তির প্রতি ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধা ভক্তি থেকে ধর্মের উদ্ভব। এই অদৃশ্য শক্তির নামই মানা। এটি ঐন্দ্রজালিক গুণ ও ক্ষমতা সম্পন্ন। আদিম ধারণা ছিল মানা 'ভর' করলে অসাধ্য সাধনও সম্ভব। মানা যার মধ্যে থাকে তাই পবিত্র।

অন্য একটি মতবাদ অনুযায়ী ধর্ম ও ইন্দ্রজাল একই উৎস থেকে এসেছে। অনেকের ধারণা ধর্মের উদ্ভব ইন্দ্রজালের আগে। ধর্মের অবক্ষয়ই ইন্দ্রজাল সৃষ্টির মূলে। যদিও ইন্দ্রজাল ও ধর্ম দুজনের চরিত্র পরস্পর বিরোধী। তেলে জলে যেমন মিশ খায় না তেমনি ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মিলনও সম্ভব নয় তবুও ধর্ম সৃষ্টির মূলে ঐ জাদুবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজাল বিদ্যা যখন মানুষকে হতাশ করল তখনই উৎপত্তি হল ধর্মের।

একসময় মানুষ বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করেছে তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী অতিমানব কোন সত্তা আছে এবং সেই সত্তার তুষ্টি বিধানই তার কর্তব্য। ধর্মে জাদুবিদ্যার প্রভাব সেই থেকেই শুরু। এই ভাবেই অতিমানব সত্তাকে তুষ্ট করতে পূজাপদ্ধতি, আচার আচরণ ও সর্বোপরি গুপ্তবিদ্যা (অকাল্টিজম) ও গুপ্ত সংস্কার প্রচলন হয়েছে। বহু পুরাতন এই গুপ্তবিদ্যা বিশেষ কোন গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও এর মহিমা কোন অংশে ম্লান হয়নি।

এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপের উদ্ভব কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নয়। এর প্রভাব প্রায় সর্বজনীন। প্রখ্যাত এক নৃবিজ্ঞানীর কিছু উদ্ধৃতিতেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে, "দি বিলিফ অ্যাণ্ড অকাল্ট প্রাকটিস আর নট টেকেন ফ্রম এয়াব। বাট আর ডিউ টু এ নাম্বার অফ এক্সপেরিয়েনসেস অ্যাকচুয়ালি লিভড থ্রু ইন হুইচ ম্যান রিসিভস রিভিয়েলেশান অফ হিজ পাওয়ার টু অ্যাটেন দি ডিসায়ারড এণ্ড।"

আবার অনেক নৃতত্ত্ববিদ ঠিক এর উল্টো ধারণাই পোষণ করেন। তাঁদের মতে ধর্ম যখন সফল হল না তখনই চমকসৃষ্টিকারী ইন্দ্রজালের উদ্ভব হল। ধর্মের নির্মল রূপের উপর যখন আবিলতার ছাপ পড়ল অর্থাৎ ধর্মের অধোগতিই সৃষ্টি করল ইন্দ্রজাল (হোয়েন ম্যাজিক ফেল্ড রিলিজিয়ন বিগান)। যাই হোক ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে যত বিরোধই থাকুক না কেন, উভয়েই অতিপ্রাকৃত কোন মহান শক্তির রহস্য সন্ধানের চেষ্টা থেকে সৃষ্ট।

সেই আদিকাল থেকেই দেখা গেছে যখনই মানুষের জীবনে ঘন ঘোরঘটার তাণ্ডব এসেছে, সে তখন দারুণ সমস্যায় পড়েছে। সেই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যখন কঠিন হয়েছে তখনই সে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক শক্তির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে

এবং সেই হেঁয়ালি রহস্যের ঘূর্ণিপাকে নিজেকে সঁপে দিয়ে বৌদ্ধিক দ্বন্দ্বের সংঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছে।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় এবং আধিব্যাধি ইত্যাদির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত মানুষ সেই আদিকাল থেকেই প্রায় নিরুপায় হয়ে কোন অদৃশ্য মহাশক্তির পদতলে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। ক্রমাবিবর্তনের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে একসময় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ বা ঈশ্বরকল্প মানুষ এবং সেই সঙ্গে ওঝা, গুনিন, রোজা এবং 'দেশীয় গুপ্ত কর্মধারার' (ইনডিজেনাস অকাল্ট প্রসিডিওর) সূত্রপাত হয়েছে ও সেই সঙ্গে গোপনে গুপ্তবিদ্যা চর্চা ও প্রয়োগ শুরু হয়েছে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। মানুষের দুর্বল মন সেই সমস্ত গুপ্তবিদ্যাকে বিশ্বাস করতে শিখেছে। এইভাবেই ডাকিনীবিদ্যা (উইচ ক্রাফ্ট্), সম্মোহনবিদ্যা (হিপনোটিজম), মায়াবিদ্যা (সরসারি), শাকুনবিদ্যা, মোহিনীবিদ্যা, এবং ক্রমশঃ তন্ত্র মন্ত্র ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে। এই জাতীয় গুপ্তবিদ্যাসমূহ বিভিন্ন অনুন্নত এমন কি কিছু কিছু উন্নত মানবগোষ্ঠীর কাছে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে এবং এই ব্যাপারটি বিশ্বজনীন।

গুপ্তবিদ্যাসমূহের চর্চা ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সর্বদেশে সর্বকালে বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুর্নিবার রহস্যময় আকর্ষণ ও কুহকের জন্ম দিয়েছিল। মানুষের কামনা, বাসনা, চাহিদা, লোভ, মদমোহের মাত্রা যখন সীমা ছাড়ায়, অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির মানুষেরা তো বটেই, এমন কি বিজ্ঞানমনস্কতার আবরণ খসে গিয়ে প্রকাশ পায় মানুষের আদিম রূপ। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুপ্তবিদ্যার ঐন্দ্রজালিক রহস্যের কোলে পরম নিশ্চিন্তে। ঠিক সেইভাবেই চলছে মানব সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস যা এখনও কোন ব্যাতিক্রমী দৃষ্টান্ত খাড়া করতে পারেনি। কোন দিন পারবে বলেও মনে হয় না।

এই গুপ্তবিদ্যা, পূজাঅর্চনা, আচার আচরণই কালে ধর্মীয় প্রথায় পরিণত হয়েছে। এটা হঠাৎ-সৃষ্ট ভুঁইফোড় কোন ব্যাপার নয়। এ সম্পর্কে বিখ্যাত এক নৃ-বিজ্ঞানীর বক্তব্য তো আগেই জানিয়েছি।

মানুষের নানা ধরনের অভিজ্ঞতা বা বৌদ্ধিক সিদ্ধান্তে আসতে অক্ষম, তার বহুবিধ সঙ্কট যার থেকে প্রচলিত নিয়মে পরিত্রাণ পেতে যথেষ্ট অসুবিধে হয়েছে, যখন অনেক আপদের কারণ তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে তখনই সে নিরুপায় হয়ে অসহায়ের মত রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সে সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেছে এই শক্তিই তাকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে, তার চাহিদা পূরণ করতে পারে। এক শ্রেণীর জনগণ আবার এই জাতীয় গুপ্ত কর্মধারাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে এবং এই প্রথাকে ক্রিয়াশীল রেখেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে ওদের ওঝা, রোজা, গুণিন, উইচ ফাউণ্ডার, সুথসেয়ার, ডিভাইনার, ডাইনি, এক্সজরসিস্ট, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তান্ত্রিক (যদিও শাস্ত্র মতে তান্ত্রিক শব্দের অর্থ ভিন্ন) ইত্যাদি নানা নামে ভূষিত করা হয়েছে। এখানে গুনিন শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হয়তো গুণ বা গোনা শব্দের অপভ্রংশ হবে গুনিন। গুনিনরা তুকতাক ঝাড়ফুঁক ছাড়াও দৈবী উপায়ে মানুষের ভাল মন্দ, হারানো বা চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করা, জ্যোতিষীদের মত ভবিষ্যৎবাণী ইত্যাদি

বিদ্যায়ও পারদর্শী। প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে যেখানে পাশ করা তো দূরের কথা হাতুড়ে ডাক্তার মেলাও দুষ্কর, সেখানে নানা আধিব্যাধিতে রাম ভরসা ঐ গুনিনরাই। তাবিচ, কবচ, ওষুধবিষুধ, গাছগাছড়া, শিকড়বাকড় এসব দিয়ে রোগমুক্তির চেষ্টা করে ওরা। তা ছাড়াও মন্ত্রপূত জল ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীও আছে। এ ছাড়াও ভূতের ভর, কুগ্রহের দৃষ্টি, সাপে কাটা ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু জানোয়ারে দংশন, ডাইনির বিষ নজর এমনি আরো হাজারো আপদ বিপদের মুস্কিল আসান গুণিনরা গ্রাম গঞ্জের মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল। গুণিনরা সাধারণতঃ নীচু জাত কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষেরাও ভয়ভক্তিতে ওদের সম্ভ্রম করতে বাধ্য।

অদৃশ্য, অতিপ্রাকৃত কত রকম অশুভ শক্তি অহরহ চারদিকে ওঁৎ পেতে রয়েছে মানষের বিপদ ঘটানোর চেষ্টায়, কিংবা এই রহস্যময় শক্তি মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক (এর মধ্যে শুভ শক্তিও আছে), এ বিশ্বাস মানুষের মনে ক্রমশঃ দানা বেঁধেছে সৃষ্টির সেই উষালগ্ন থেকেই। এইভাবে ওঝা, রোজা, গুণিনদের প্রতি আসক্তিও বেড়েছে। হয়েছে একের পর এক গুপ্ত সংস্কার। এই বিশ্বাসে উৎপন্ন অলৌকিক শক্তির প্রতি সম্ভ্রমের পরিমণ্ডল ক্রমশঃ সমাজ জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

শুধু আমাদের দেশেই নয় উন্নত দেশসমূহেও গুপ্তবিদ্যা চর্চা মোটেও স্তব্ধ হয়নি বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষের তাবৎ উপজাতি দুষ্ট যাদু (ব্ল্যাক ম্যাজিক ও ইষ্ট যাদু (হোয়াইট ম্যাজিক) —এই উভয় প্রকার যাদুতেই পরম বিশ্বাসী। এর মধ্যে দুষ্ট যাদুকরেরা খল প্রকৃতির ও ক্ষতিকর হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। সমাজের বিশ্বাস এরা সহজাত অনিষ্টকারী ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছে এবং ঐ ক্ষমতা এদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। এরা আবার ঐ শক্তি সঞ্চয় করেছে নানা ধরনের লৌকিক ও অলৌকিক দেবদেবীদের তুষ্ট করে। এই দেবদেবীদের মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের বিভিন্ন রূপ ছাড়াও চণ্ডী, শীতলা, মনসা, কালী এবং লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে বরাম, সিং বোঙা, পিশাচিনী, চণ্ড, মারাংবুরু, আল্লা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ওঝা, রোজা, গুণিনরা বিভিন্ন দেবদেবী প্রদত্ত অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে ডান ডাইনি, প্রেত প্রেতিনী, মায়াবী মায়াবিনীদের অশুভ কোপ দৃষ্টির প্রভাব ও প্রকোপ কাটিয়ে দিতেও সক্ষম। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে তুচ্ছ করে, তার প্রতিরোধ ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গুপ্তবিদ্যা বিশারদেরা এমন কিছু ঘটনা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল যে মানুষ মুগ্ধ হয়ে নিজ প্রয়োজনেই যাদুবিদ্যাকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নিয়েছিল।

(এখানে ডাইনি ও ডাকিনীবিদ্যা ও ভূতপ্রেতের বড় একটি ভূমিকা আছে কিন্তু এ সম্পর্কে অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত লিখব বলে আর ঐ প্রসঙ্গে যাচ্ছি না)

বৈদিক যুগে এই রহস্যময় গুপ্তবিদ্যার সঙ্গে ধর্মদর্শনে একটা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়। আর্য ও অনার্য (দ্রাবিড়) সংস্কৃতির সংমিশ্রণে বৈদান্তিক হোম, যজ্ঞ, পূজার্চনার সঙ্গে মূর্তি পূজারও প্রচলন হয়। পূজা পদ্ধতির (মূর্তি পূজা) উদ্ভব হয়েছে দ্রাবিড় (অনার্য) সংস্কৃতি থেকে। আর্যরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিল না ; ওদের উপাস্য ছিল অগ্নি ও প্রজ্বলিত

অগ্নির অন্য এক রূপ যা আমাদের জীবন, দৃষ্টি ও রক্ষায় সহায়ক—সেই সূর্য।

এইভাবে ক্রমশঃ ঐশ্বরিক বা ঐশী শক্তির কৃপা লাভের আশায় মন্ত্রতন্ত্র, স্তব, শ্লোক, ভোগ, নৈবেদ্য ইত্যাদির উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ছাড়াও বাস্তবকে মেনে নিয়ে রচিত 'অথর্ববেদ' সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

বেদ মূলতঃ চারটি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। পরে অথর্ববেদ থেকেই পঞ্চম বেদের (আয়ুর্বেদ) সৃষ্টি। ঋক্, সাম, যজুঃ এই ত্রিবেদে মুখ্যতঃ আত্মা, ঈশ্বর বা ভগবানের স্বরূপ ও মহিমা এবং মোক্ষলাভের পথ দেখানো হয়েছে কিন্তু অথর্বই একমাত্র বেদ যেখানে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রুতির যুগের মুনি ঋষিদের অধ্যাত্ম চেতনার অভিজ্ঞতার আলোয় উদ্ভাসিত প্রক্রিয়ায় আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধিআত্মিক (আধ্যাত্মিক) এই ত্রিবিধ বিঘ্ন দূর করে দেহ মন রোগমুক্ত রেখে আত্মিক উন্নতি তথা মোক্ষ (মুক্তি) সাধনার চমকপ্রদ প্রচেষ্টা অর্থাৎ মানুষের ত্রি অবয়ব 'দেহ মন আত্মা'-কে সমান ভাবে প্রাধান্য দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যোগ সাধনার সূত্রপাত একমাত্র অথর্ববেদেই হয়েছে।

স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাং সস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

সংস্কৃত শ্লোকটির বাংলা করলে এই রকম হয়—স্থির, দৃঢ় দেহ (শরীর) এবং মনের দ্বারা তোমাদের সন্তুষ্ট রেখে দেবগণের বিহিত আয়ু যেন প্রাপ্ত হই। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

দৈহিক সচেতনতা স্বাস্থ্যরক্ষা থেকে শুরু করে আত্মিক সাধনা মোক্ষ লাভ অবধি কোন কিছুকেই বাদ দেওয়া হয়নি অথর্ববেদে। মানুষের ছয় রিপু, অষ্ট পাশ, সংঘাত, শান্তি প্রকরণ কি নেই অথর্ববেদে! প্রায়শ্চিত্ত, শত্রুনাশ, আরোগ্য, যাবতীয় গৃহদোষ ও বিবাদ দূর, রাজ্যজয়, শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি, পশুচিকিৎসা, তান্ত্রিক ষট কর্ম, ভূত তাড়ানো, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধশান্তি, পারলৌকিক কর্ম, তাবৎ দেবদেবীদের কৃপালাভের আশায় হোম যজ্ঞ, পূজা অর্চনা, গ্রহশান্তি, জ্যোতিষচর্চা, সামাজিক বিধিনিষেধ ও আইন কানুন ও সেই সঙ্গে যোগসাধনা ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ এবং ওষধি, মন্ত্র, দ্রব্য ইত্যাদি সহ বহু নিয়ম ও উপায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

অথর্ববেদের মন্ত্র অক্ষয় ও অব্যর্থ ফলপ্রদ। অথর্ববেদেই গাছ গাছড়া, জড়ি বুটি, শেকড় বাকড়, ওষুধ বিষুধ ও কবচ তাবিচ বানানোর প্রক্রিয়ার প্রথম সূত্রপাত।

অথর্ববেদে মানবজীবনের কোন সমস্যাকেও বাদ দেওয়া হয় নি। সমস্ত কিছুই দেখা হয়েছে সমদৃষ্টিতে। এই রকম একটা সচল গ্রন্থকে কেন যে 'অথর্ব' বলা হয়েছে সেটাই আশ্চর্য। অবশ্য অথর্ব শব্দের একটি অর্থ পরব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর।

মানুষের ঐহিক সুখ শান্তি এবং পারলৌকিক ক্রিয়া সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পরম মোক্ষ

অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সুষ্ঠু পথ প্রদর্শন করেছে অথর্ববেদ। তা ছাড়াও আছে দীর্ঘায়ু হওয়ার জন্য প্রার্থনা।

পশ্যেম শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতম্
বুধ্যেম শরদঃ শতম্ রোহেম শরদঃ শতম্
পুষেম শবদঃ শতম্ ভবেম শরদঃ শতম্
ভূযেম শরদঃ শতম্ ভূয়সী শরদঃ শতাৎ

হে সূর্ব তোমায় শতবছর দেখব। শতবছর বাঁচব। শতবছর সকল কাজ জানব। শতবছর ধরে উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ হব। শতবছর পুষ্টিলাভ করব। শত বছব এবং আরো বহু শত বছর ব্যাপী পুত্রাদিপ্রবাহে উৎপন্ন হব।

তা ছাডাও সাম্যবাদের মূল ভিত্তিপ্রস্তরটি গাঁথা হয়েছিল অথর্ববেদেই। এখানে কাউকে ছোট করা হয়নি। সকলকেই দেখা হয়েছে সমদৃষ্টিতে।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং ব্রতং সহ চিত্তমেযাম্
সমানেন বো হবিষা জুহোমি সমানং চেতো অভিসংর্বিশধ্বম্
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো বঃ সুসহাসতি

তোমাদের কার্যাবলী, মন্ত্রণা একবকম হোক। কর্মপ্রকৃতি এক রকম হোক। অন্তঃকরণ একরকম হোক। এজন্যই তোমাদের সাধারণ হবি দিয়ে যজ্ঞ করছি। তোমাদের চিত্ত একরকম হোক। তোমাদের সঙ্কল্প একরকম হোক। তোমাদের হৃদয় এক হোক, মন সমান হোক। তোমাদের সমস্ত কাজ যাতে একসঙ্গে হয় সেই কামনায় তোমাদের সংযুক্ত করছি।

এ যেন বিশ্ব সম্প্রীতিব মূলমন্ত্র! এই হচ্ছে অথববেদ।

যাই হোক আবার গুপ্তবিদ্যার আলোচনাতেই ফিরে আসছি। এক এক ধরনের উপজাতি সম্প্রদাযের মধ্যে এক এক ধরনের গুপ্তবিদ্যা পদ্ধতি প্রচলিত। একজাতীয় উপজাতি আছে—যারা কখনও কোন বিপদে পড়লেই গণৎকারের কাছে ছোটে। তা আর্থিক, সামাজিক, মানসিক বা শারীরিক যাই হোক না কেন। ধরা যাক কারো কোনো অসুখ বিসুখ করেছে। গণৎকার (গুণিন, ওঝা, মায়াবী) গুণে বলে দিল রোগের কারণ কি। তারপর সে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি কবে দুর্বোধ্য মন্ত্র পাঠ করে রোগ সারিয়ে দিল। আবার যদি সে কারো ক্ষতি করতে চায় তবে সেই ব্যক্তির মাথার চুল কিংবা পরিধেয়ের কিছু অংশ 'দুষ্টমন্ত্র' প্রয়োগে, লোকটিকে বুঝতে না দিয়েই, হস্তগত করে নেয। তারপর ঐ গুনিন হাতিয়ে নেওয়া বস্তুর ওপর 'দুষ্ট জাদু' প্রয়োগের পর ঐ ব্যক্তির বাসস্থানের কাছাকাছি কোন খড়ের গাদায় বা জঞ্জালের স্তূপে মন্ত্র সিক্ত করে লুকিয়ে রাখে। আশ্চর্যভাবে দেখা যায় কিছু সময়ের মধ্যেই সে ব্যক্তি নানান ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষের বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদেরা দীর্ঘকাল গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার কিছু কিছু অঞ্চলেই এই গুপ্তবিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল এবং পরে তা ব্যাপক হারে সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করেছে। তন্ত্র ও অন্যান্য গুপ্তবিদ্যা জাতীয় যাবতীয় অকাল্ট সায়েন্সের যথেষ্ট চর্চা যে পশ্চিমবঙ্গে হয়েছিল এবং এখনও সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে এর যথেষ্ট প্রমাণও আছে। কারো কারো মতে বঙ্গ (বাংলা) এই শব্দের ব্যুৎপত্তি খুঁজতে গেলে হয়তো 'বোঙ্গা'য় পৌঁছে যাওয়া যাবে। বোঙ্গা শব্দের অর্থ 'আত্মা'।

গ্রাম বাংলার ঘর বাড়িগুলোর উপর দৃষ্টি দিলে এ ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরেই দেখা যায় তুলসীমঞ্চ। যেখানে স্বয়ং নারায়ণের অস্তিত্ব বিরাজ করছে বলে ধারণা। তুলসী পাতা অবশ্য খুব উপকারী ও নানা রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। তুলসী গাছ ছাড়াও এ জাতীয় মঞ্চে মনসা গাছও দেখতে পাওয়া যায়। যে হেতু গ্রাম গঞ্জে সাপের উপদ্রব সে জন্য সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নিত্য পূজা ও বিশেষ তিথিতে নানা উপচারে দুধ কলা দিয়ে পূজা করার রীতি প্রচলিত আছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। গাছপালা ও মূর্তি পূজা দ্রাবিড় (অনার্য) সংস্কৃতি জাত। আর্যরা মূর্তি বা কোন 'মিনস'-এর উপাসনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। মূল সংস্কৃতে 'পূজা' শব্দটি নেই। এটি পরে সংস্কৃত শব্দসম্ভারে ঢুকেছে। দ্রাবিড়রা প্রথমে মূর্তি বা ঐ জাতীয় কিছু ঈশ্বরের প্রতীককে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করত। তামিল ভাষায় 'পু' শব্দের অর্থ পুষ্প ও 'চে' মানে চয়ন। সুতরাং 'পুচে' (পুষ্পচয়ন) থেকে কালে অপভ্রংশ হয়ে পূজা শব্দের সৃষ্টি।

গ্রামে গঞ্জের ঘরবাড়িতে গাছপালা পূজা ছাড়াও কোন বেদীতে বা গাছের তলায় (বিশেষতঃ বড় বড় বট, অশ্বত্থ, বেল, নিম ইত্যাদি) কালো গোলাকার বা বিভিন্ন ধরনের পাথর রাখা থাকে, সচরাচর সে গুলোতে সিঁদুর মাখানো দেখা যায়। গ্রামবাসীরা এই পাথরগুলোকে শিব জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করে ও নিয়মিত পূজো দেয়। এই মানসিকতার পিছনে যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে।

আমাদের পশ্চিম বাংলায় অনেক ভাষাভাষী, বহু জাতি বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের দীর্ঘকাল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এঁরা এবং আদি বঙ্গবাসীরাও বংশ পরম্পরায় তাঁদের মৌলিক প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কার দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। সমাজ অচলায়তন নয়। সদা পরিবর্তন ও উন্নয়নশীল সমাজের পুষ্টির মূল কারণ দুটি, দ্বন্দ্ব বা সংঘাত ও একত্রীকরণ (অ্যাসিমিলেশন)। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রগতিশীল সমাজ গঠনের মূল উপাদান।

এপার বাংলায় পশ্চিমের আদিম আদিবাসী কৃষ্টি, দক্ষিণী উৎকল ধ্যান ধারণা ও উত্তর বঙ্গীয় সংস্কৃতি এই ত্রিমুখী ধারার অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে। এখানে নানা পেশায় নিযুক্ত বহু বর্ণের মানুষের মধ্যে রয়েছেন ব্রাহ্মণ (পুরোহিত, যজ্ঞকার, যাজক), কায়স্থ (কেরানি, লিপিকার), মাহিষ্য বা চাষী বা পোদ বা নমোশূদ্র (কৃষিকার্য, জমি জমা সংক্রান্ত কার্যাবলী), গোপ বা গোয়ালা (দুগ্ধ ব্যবসায়ী), করণ বা ময়রা (দুগ্ধজাত দ্রব্যের বেশাতি), মালাকার (ফুল ও পুষ্প সংক্রান্ত নানাবিধ উপাচার, শোলার কাজ), বারুই (পান পাতা উৎপাদন ও বিক্রী), কামার (লৌহজাত দ্রব্য নির্মাণ), স্বর্ণকার বা স্যাকরা (স্বর্ণশিল্পী ও মণিকার), নাপিত (ক্ষৌরকর্ম), তাঁতি (বস্ত্র উৎপাদন), তিলি (তৈল প্রস্তুত কারক), ছুতোর (কাঠের

কাজ), জেলে বা ধীবর বা রাজবংশী বা বাগদী (মাছের ব্যবসা), ধোপা বা রজক (পরিধেয় বস্ত্র ধৌতকরণ), দুলে (পালকি বাহক), হাড়ি (ঢোলবাদক ও নাড়ি কাটার কাজ), মুচি বা চর্মকার (চর্মশিল্প), ডোম বা ধাঙ্গড় (বাঁশের কাজ), লোধা বা শবর (বন্যসামগ্রী এবং কৃষিকাজ), শুঁড়ি (মদ্যপ্রস্তুত ও বিক্রয়), সাঁওতাল (উপজাতি), মুণ্ডা (উপজাতি), বৈষ্ণব (ধর্মীয় সম্প্রদায়), শৈব (ধর্মীয় সম্প্রদায়), শাক্ত (ধর্মীয় সম্প্রদায়)। এই শাক্তদের একাংশ তন্ত্রসাধক।

এই গুপ্তবিদ্যা সম্পর্কে মোটামুটি বলা যায় সেগুলো একসময় ওঝা (গুনিন, মায়াবি, রোজা) জাতীয় নিম্নবর্ণের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। ক্রমশঃ দেখা গেল কালক্রমে তা সমাজের উচ্চবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের (পুরোহিত) অধিকারে চলে এল।

এটা এসেছে মানুষের আদিম মনে তুকতাক ও অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস ও ভয় মিশ্রিত ভক্তি এবং কালে কালে যা সমাজজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে। মানুষ দেখেছে যুক্তি দিয়ে বা বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা করতে না পারলেও ঐ জাতীয় গুপ্তবিদ্যা তার দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত আবশ্যিক। সুতরাং তাকে ত্যাগ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। আর মানুষের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে গুপ্তবিদ্যা তলে তলে মাথায় চড়ে বসেছে।

গুপ্তবিদ্যায় অশরীরী আত্মার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এই রকম ধারণা করা হয় আত্মা দু ধরনের ঃ ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী অবশ্য অনিষ্টকারী আত্মার (দুরাত্মা) সংখ্যাই বেশি। সুতরাং যাবতীয় অমঙ্গলকর ব্যাপার দুষ্ট আত্মারই কারসাজি আর যা কিছু কল্যাণকর সেগুলো শুভ আত্মার কীর্তি। যেগুলো দীর্ঘমেয়াদি দুর্ভোগ তা রোগব্যাধি কিংবা সাংসারিক কোন গোলযোগ যাই হোক না কেন এটা দুষ্ট আত্মার বদমায়েসি বলেই আদিবাসীদের ধারণা। সুতরাং চিকিৎসা বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক না কেন ঐ জাতীয় রোগের নিরাময় দৈবরোগমুক্তি (মিরাকুলাস কিওর) ছাড়া কোনমতেই সম্ভব নয় বলেই একশ্রেণীর জনগণের বিশ্বাস।

সেই অন্ধ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বহু মন্দির, মসজিদ, পীঠস্থান, মাজার এবং সেইসঙ্গে সাধু, তান্ত্রিক, রোজা, ওঝা, গুনিন, ফকির ইত্যাদির রমরমা ব্যবসা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে বিজ্ঞানের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে।

আমি বহু জায়গায় ঘুরে অনেক বিচিত্র কাণ্ডকারখানা দেখেছি। এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। বিজ্ঞানের যত প্রসারই হোক না কেন হাওয়া লাগা, কুদৃষ্টি, নজর লাগা, গুণ তুক করা, ইত্যাদি শব্দগুলো আমাদের মন থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। সেইসঙ্গে কবচ, তাবিচ, মাদুলি, জলপড়া ইত্যাদির উৎপাদনে ঘাটতিও হবে না।

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ প্রাকৃতিক তথা অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে ভয় ভক্তিতে আত্মসমর্পণ করেছে। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে, চলছে এবং চলবেও। মানুষের এই

দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের গুপ্ত প্রতিষ্ঠান ও তাদের গোপনীয় রহস্যময় ক্রিয়াকলাপ। এই গুপ্তবিদ্যাকে অকালটিজম্ ও এসোটোরিক কালট্ বলা হয়। গুপ্তবিদ্যাবিশারদেরা এই কালট বা প্রথাকে আঁকড়ে ধরে পুষ্টি দেয় ও সযত্নে বাঁচিয়ে রাখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ধান্ধায়।

এইভাবে এক সময় গুপ্তবিদ্যাকে ধর্মীয় রূপ দিয়ে তন্ত্র জন্ম নিয়েছে যার মূলে রয়েছে ঐ জাতীয় বিশ্বাস।

ক্ষ্যাপাবাবা থামলেন।

থমথমে নিস্তব্ধ রহস্যময় পরিবেশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আনমনে ঝিঁ ঝিঁর ডাক শুনতে শুনতে বললেন, "বুঝলে তো বাবা কোনকিছুই অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রথমে যখন বেনে বাড়ির মেয়ের উদাহরণ দিয়েছিলাম সেটা অশ্লীল ভেবে খুব চটে গিয়েছিলে। শোন বাবা, শ্লীল ও অশ্লীলের মধ্যে সূক্ষ্ম কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। এ গুলো স্থান, কাল, পাত্র, জাতি, সমাজ ইত্যাদি ভেদে আপেক্ষিক ব্যাপার। আর আমাদের তান্ত্রিকদের ডিকশনারিতে শ্লীল বা অশ্লীল এই শব্দ দুটোর কোনটারই অস্তিত্ব নেই, বুঝলে।"

আমিই তারা

'মহাপীঠ তারাপীঠ' ছবিটি করেছিলেন সুভাষ দে। এখানে তারার ভূমিকায় রূপ দিয়েছিলেন একালের অভিনেত্রীশ্রেষ্ঠা শতাব্দী রায়।

আমাদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিতা আছেন দ্বিভুজা সিংহবাহিনী। অপরূপ মূর্তি। আমি বিভিন্ন সময়ে গৃহত্যাগ করে নানা জায়গায় থেকেছি। এক সময় বেহালার কাছে সরশুনায় একটি মেয়েদের আশ্রমে ছিলাম কয়েক বছর। সেই 'কন্যাপীঠ'-এ পাঁচশো কন্যাকুমারীর সঙ্গে রোমাঞ্চকর সহাবস্থান। সেখানে এক শিবরাত্রির সন্ধ্যায় দেবী দুর্গা ঐ রূপে আমায় দর্শন দিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে। আমারা মূলতঃ বৈষ্ণব এবং গোস্বামী, কিন্তু দুর্গা দেবীর নির্দেশে শক্তি মূর্তি স্থাপন করেছিলাম বাড়ি ফিরে।

কাজটি অবশ্য খুব সহজে হয়নি। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসায় সেটি বেদখল হয়ে গিয়েছিল। যারা দখল করেছিল তারা বেশ ধনী ও প্রভাবশালী মানুষ। অবশ্য যত কঠিন কাজই হোক না কেন, ভগবতী দুর্গা স্বয়ং প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন ওঁকে আটকাবে কোন অসুর শক্তি।

'মহাপীঠ তারাপীঠ' চলচ্চিত্রের নির্মাতা সুভাষ দের দেবদ্বিজে ভক্তি আছে খুব। উনি প্রায়ই আসেন আমার বাড়িতে। সিংহবাহিনীর পূজা দেন। বিশেষতঃ অমাবস্যার রাতে। ওঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অধ্যাত্ম তত্ত্বও আলোচনা হয় আমার মাঝে মধ্যে। উনি 'মহাপীঠ তারাপীঠ' ছবিটি কেন করেছিলেন তার কাহিনী লেখা আছে 'বামদেব' অধ্যায়ে।

যাইহোক উনি প্রায়ই একটা কথা বলেন 'মহাপীঠ তারাপীঠ' ছবিটির তারাপীঠে আউটডোর সুটিং-এর সময় তারার ভূমিকাভিনেত্রী শতাব্দী রায়কে যখনই আমি তারা মাকে প্রণাম করতে বলতাম, সে বলতো "কেন আমি তারাকে প্রণাম করব, আমিই তারা।"

"এটা কি নেহাতই ক্যাজুয়ালি বলেছিলে, নাকি একটা 'ভর', 'ঘোর', 'পজেজড্' বা ঐ জাতীয় কিছু, আমরা যাকে 'ট্রান্স' বলি, নাকি কোন চেতনাতীত আবেশে অথবা অভিনয় করতে গিয়ে সে সময় চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে, নাকি তোমার মধ্যে হঠাৎ 'সোহম্' ভাব জেগে উঠেছিল?"

এতগুলো বিচিত্র প্রশ্ন একসঙ্গে শুনে শতাব্দী কিছুটা বিব্রত হল বটে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "দেখুন, একেবারে গতানুগতিক গ্লামার হিরোইনের রোল ছাড়া অন্য বিশেষ কোন চরিত্রে যখন আমি অভিনয় করি তখন ঐ চরিত্রটির মধ্যেই ডুবে যাই। আপনি যাকে 'একাত্ম' হওয়া বললেন। 'মহাপীঠ তারাপীঠে' অভিনয় করতে গিয়ে বার বার ভেবেছি আমি ও তারা অভিন্না। উনি দেবী, অরূপা

ভগবতী মহামায়া আর আমি তাঁরই অংশসম্ভূতা এক মানবী রূপ। সেই সময় এই রূপ অরূপ মিলে মিশে একাকার হয়ে এক অপরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এটাও ঠিক তারাপীঠে আউটডে'র সুটিং-এর সময় খুব শুদ্ধাচারে থাকতাম। নিরামিষ খেতাম। নিয়মিত তারা মন্ত্র জপ করতাম। তা ছাড়া তারাপীঠের চমৎকার সাধন-পরিবেশ, সে সময়ের পরিস্থিতি মানে সমস্ত কিছু মিলিয়ে খানিকটা অতিচেতন অনুভূতি জেগে উঠেছিল।"

কিছুক্ষণের জন্য উদাস হয়ে গেল শতাব্দী। ওর অবচেতন মনটা বোধহয় তখন তারাপীঠে বিচরণ করছে।

এটা দ্বারকা নদীর ধারে মহাপীঠ তারাপীঠ নয়, গড়িয়াহাট রোডের শতাব্দীর বিলাস বহুল ফ্ল্যাট কিন্তু হঠাৎ মনে হল অর্থ খ্যাতি প্রাচুর্যের চূড়ায় বসে সবকিছু পেয়েও রিক্তা, বহুজন সান্নিধ্যে ব্যতিব্যস্তা কিন্তু নিঃসঙ্গ মেয়েটির অনেকদিনের চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনছি যেন। মনে এল জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি ঃ

অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত ক্লান্ত করে

অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াস ব্যাপারটা এমনই যে কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং মনের রাশ টেনে আবার প্রসঙ্গে এলাম। কোন চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে সেই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 'আমিই সেই' এই ভাবটা আসা অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে খুব একটা দুর্লভ নয়।

অনেক কাল আগে একবার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে নিজেকে কি রামকৃষ্ণ মনে হয়?"

"ঠিক বলেছ বাবা, ঐ রকমই মনে হয়। ঠাকুর আর আমি যে আলাদা কিছু সে বোধটা চলে যায়, আবার মাঝে মাঝে মনে হয় উনি যেন আমার মধ্যে ভর করেছেন আর আমাকে দিয়ে ওঁর ভূমিকায় সঠিক অভিনয় করিয়ে নিচ্ছেন। অভিনয়ের সময় ছাড়াও অন্য সময়েও কখনও কখনও মনে হয় আমিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ" বলেছিলেন গুরুদাস।

আমার এক বন্ধু ছিল উমাশঙ্কর। অ্যামেচার থিয়েটারে শিব সাজতো। প্রায়ই ও যেন নেশাচ্ছন্ন ঘোর উন্মাদ অবস্থায় "আমি শিব" "আমি শিব" বলে চিৎকার করে উঠতো। 'নাচতো শিব সুন্দর' গানটির সঙ্গে নাচের সময় ও মূর্ছিত হয়ে পড়তো। পরে যখন আমরা জিজ্ঞেস করতাম "তোর কি হয়েছিল রে?" তখন ও ভয়-ভক্তি ভাব মেশানো অদ্ভুত গলায় বলতো, "কি জানি ঠিক বলতে পারব না তবে মনে হয় স্বয়ং শিবঠাকুর যেন আমার মধ্যে ঢুকে গিয়ে তান্ডব নৃত্য শুরু করেছেন, না হলে তোরাই বল, ঐ রকম দারুন নাচ আমি কি নাচতে পারি?"

আবার শতাব্দীর প্রসঙ্গ।

'মহাপীঠ তারাপীঠ' ছবিতে শতাব্দীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্পর্কে ঐ ছবির কাহিনী চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজক সুভাষ দে বলেছিলেন যে আমি একদিন শুটিং-এর অবসরে শতাব্দীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তারা মায়ের চরিত্রে তুমি এতো সুন্দর অভিনয় করো কি করে? তুমি তো এ ধরনের চরিত্রে আগে কখনও অভিনয় করোনি। ও তখন আমায় উত্তর দিয়েছিল— বিশ্বাস করুন সুভাষদা তারা মা সেজে যখন আমি ফ্লোরে ঢুকি তখন কি যেন এক অদ্ভুত শক্তি আমার শরীরে ভর করে। আমি ভুলে যাই যে আমি শতাব্দী রায়, তবে এই শক্তি যে কী তা আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না"।

এটা যে কী শক্তি তা ব্যাখ্যা করতে পারেনি মিঠুন চক্রবর্তীও। বিশিষ্ট দক্ষিণী পরিচালক জি. ভি আয়ারের বহুভাষার ছবি 'বিবেকানন্দ'-তে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন মিঠুন। পাক্কা বোম্বাই মার্কা রোমান্টিক— ঢিসুম ঢিসুম হিরো। রামকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে সেও ঐ অবস্থায় চলে এসেছিল।

"নিখুঁত ভাবে ঠাকুরের চরিত্র ফুটিয়ে তুললে কি করে?" এ প্রশ্নের জবাবে মিঠুন বলেছিল ঃ

"সত্যি বলছি আমি জানি না, তবে শুনেছি পরিচালক আমায় বিরক্ত করেননি। দেহ রাখার পর কতক্ষণ ঠায় বসেছিলাম জানি না। তারপর কোন শট হয়নি। ফ্লোরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে আমাকে একা থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর কখন আমি আমার মধ্যে ফিরলাম জানি না। তবে এটা মনে আছে আমার দু চোখ জলে ভিজে গিয়েছিল। কেন কাঁদছিলাম তাও জানি না। পরের দিন সারাক্ষণ শুটিং করেছি তখনও আমি নিজের কাছে ফিরে আসতে পারিনি। শুটিং-এর ঐ একুশ দিন, সত্যি বলছি, আমি আমার মধ্যে ছিলাম না। সারাটা দিন, কখনও কখনও সারাটা রাত আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। মেকাপ নেওয়ার পর, কী বলবো, কী যে হতো আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিছু একটা নিশ্চয়ই হত ।"

হিন্দী ছবির মার্কা মারা 'দেবী' ছিলেন জয়শ্রী গদকর। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী সমস্ত রূপেই ওঁকে দেখেছি রূপোলী পর্দায়। ছেলেবেলায় আমাদের খুব প্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন উনি।

একদিন একটা অনুষ্ঠানে রক্তমাংসের শরীরে সামনা- সামনি দেখে আর স্থির থাকতে পারিনি, "দেবী" "দেবী" বলে চিৎকার করে উঠেছিলাম। উনি যেন ঠিক দেবী-ভাবাচ্ছন্ন অবস্থায় উত্তর দিয়েছিলেন "সাচ্ ম্যায় দেবী হুঁ"।

এই যে হঠাৎ জেগে ওঠা "আমিই সেই" ভাব একে মনস্তত্ত্ব হয়তো বাঁকা চোখে তাকিয়ে সন্দেহের খোঁচা দিয়ে অনেক কিছু বলবে—পরিবর্তিত-মানসিক পরিস্থিতি, ঘোর মত্ততা, মনোবিকার, বৈভব বিভ্রান্তি (ডিলিউশন অফ গ্রান্ডিওসিটি), হিষ্টিরিকাল

ডিসোসিয়েশন রিঅ্যাকশন, ফাংশানাল ওভার লে, মতিচ্ছন্ন মানসিক পরিস্থিতি আরো কত কী। যে হেতু আমি এখানে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করছি না, তাই এই প্রসঙ্গ উহ্য রাখলাম। তবে এটুকু বলব এই জাতীয় যাবতীয় কিছুই আমাদের নির্জ্ঞান (আনকনসাস) মনোস্তরের কারসাজি।

. .

একসময় চুটিয়ে সাধুসঙ্গ করেছি। নানাস্থানে বহু সাধক বা ঈশ্বরকল্প পুরুষকে 'আমিই সেই' বা সোহম্ ভাবে বিভোর থাকতে দেখেছি। এই রকম দুজনের কথা এখন মনে আসছে।

এক পান্ডব-বর্জিত নির্জন জায়গায় ঘন বনজঙ্গলের মধ্যে মন্দির বানিয়ে থাকতেন জ্ঞানবাবা। নিজের মূর্তি গড়িয়ে শিব জ্ঞানে নিত্য পূজা করতেন। ত্রিসন্ধ্যা নিখুঁত শিব পূজো। ফুল, বেলপাতা, কাঁচা দুধ, ইত্যাদি পূজা উপাচার এবং ধূপধুনো, আরতি কিছুই বাদ পড়ত না। মাঝে মধ্যে শোনা যেত ওঁর গুরুগম্ভীর হুংকার "চিদানন্দ রূপ শিবহম্ শিবহম্"। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম "বাবা, নিজের মূর্তি গড়িয়ে শিবপূজা করছেন কেন?"

উনি গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছিলেন, "নিজেকে যদি শিব ভাবতে পারি তবে নিজের মূর্তি বানিয়ে শিব পূজো করতে পাবব না কেন?" তারপর খানিকটা ব্যাজার হয়ে বলেছিলেন, "চ্যালাদের যে রকম মতিগতি আমি দেহ রাখলে কেউ আর আমাকে মনে রাখবে না, তাই আগে থেকেই মূর্তি বানিয়ে রাখলাম।"

এক যুবতী ভৈরবীর সান্নিধ্যে ছিলাম বেশ কিছুকাল, উনি আমায় চৌষট্টিকলা কাম ও চৌষট্টি কলা তন্ত্র উভয়ই শিখিয়েছিলেন। উনি কে জানতে চাইলেই বলতেন "আমি দুর্গা"।

শতাব্দীর প্রসঙ্গে আসি আবার।

নিছক হঠাৎই কি ওর মনে এই 'আমিই সেই' ভাব জেগে উঠেছিল! নাকি দীর্ঘকাল পর ঐ চাপা ভাবটি, পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে— মহামায়া তারার ভূমিকায় নিজেকে একাত্মকরণের তাগিদে অর্থাৎ এই অনুকূল অবস্থায, ওর নির্জ্ঞান মনোস্তর থেকে চেতন স্তরে চলে এসেছিল অবদমনের বাধা ভেঙ্গে! পরিবেশ পরিস্থিতি সহযোগিতা করেছে ঠিকই কিন্তু বহুদিনের প্রস্তুতি ও সঞ্চিত কিছু না থাকলে এ ভাব হঠাৎ আসার নয়। এ সম্পর্কে শতাব্দী কি বলে শোনা যাক!

"জানেন আমি কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন জন্মেছিলাম" বলতে গিয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল যেন শতাব্দী। দেবী দুর্গার সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়ী ঐ মহালক্ষ্মীই যেন ওঁর মধ্যে আবির্ভূতা বলে মনে হল আমার।

ঢের ঢের সুন্দরী মেয়ে দেখেছি। কিন্তু শতাব্দীর রূপের মধ্যে যে স্নিগ্ধ ধর্মীয় পবিত্রতা আছে সেটা কজনের মধ্যে দেখা যায়? প্রকৃত ঐশ্বরীয় প্রত্যক্ষতা ও তাঁর কৃপা ছাড়া

এই মনোমোহিনী রূপ ও ভাবের সমন্বয় কিছুতেই সম্ভব নয়।

এই রকম 'ডিভাইন বিউটি' দেখেছিলাম আর এক অভিনেত্রীর মধ্যে তার নাম হেমা মালিনী। আমি তখন আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। সেই সময় আনন্দবাজার সহ অনেক খ্যাতনামা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখতাম। হেমা মালিনী এসেছিল সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের পক্ষে নাচের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসদনে। আমি গিয়েছিলাম বিখ্যাত একটি কাগজের হয়ে অনুষ্ঠানটি কভার করতে। ঠিক সেই সময় থেকেই আমার তন্ত্র সাধনার সূত্রপাত। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাধকের চোখে হেমাকে দেখে মনে হয়েছিল স্বর্গচ্যুতা দেবী যেন নেমে এসেছে আমার চোখের সামনে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে।

হেমা মালিনীও জন্মেছিল কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন। ওর জীবন জুড়েও ঐশ্বরিক শক্তির অধ্যাত্ম অনুভূতি। সেও ঐ প্রকৃতির প্রকৃতিরূপিণী। এ তথ্য হেমার কাছেই শোনা, 'দেবীদর্শন'-এ মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলাম নর্তকী কবিতা, পরে এটি একটি খ্যাতনামা পত্রিকায় প্রকাশিত হয। নর্তকীর প্রথম কয়েকটি পংক্তি ঃ

নর্তকী তোমার রূপ সাবলীল স্বপ্নের মত
কোমন পেলব তনু দুধে আর্দ্র যুগ্মশংখ স্তন
গ্রহ হতে গ্রহান্তর অন্য কোন সৌরজগতের
কঠিন বন্ধন ছিঁড়ে জন্মজন্মান্তর ফিরে আসি
আলোক বর্ষের পারে তোমার দেহের ঘ্রাণ নিতে
আমি কক্ষচ্যুত গ্রহ দিকভ্রষ্ট উদভ্রান্ত নাবিক
সহস্র বছর ধরে সুন্দরের অন্বেষণে ঘুরি
অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যালগ্নে নর্তকীর রূপে
তোমায় দেখেছি আমি নৃত্যরতা পৃথিবীর বুকে
স্তব্ধ হল মহাকাল নেমে এল নক্ষত্রের দল
কি আনন্দে মুখরিত নর্তকীর শুভ্র পদ চুমে

যাক, হাজার বছরের ঘোরাঘুরি ছেড়ে আবার এই শতাব্দীতেই ফিরে আসি।

শতাব্দী বললো, "ছেলেবেলা থেকেই ঠাকুর দেবতায় আমার খুব ভক্তি বিশ্বাস। পুজো করতে ভাল লাগে তবে রিচুয়ালিষ্টিক নিয়ম শৃংখলের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে চাই না। আমার পুজো খেয়াল খুশিতে অবাধ। ঈশ্বর একান্ত আপন জন। প্রিয়পাত্র। তাকে নিজের মত করেই ভালবাসব, ভক্তি শ্রদ্ধা জানাব, সেখানে আবার বিধিনিষেধ আর নিয়ম কানুন কি!"

মন ভরে গেল শতাব্দীর কথা শুনে। একালের গ্লামার কুইনের শ্রীমুখ থেকে পরম সাধিকার মত কথা বেরিয়ে আসবে এ আমার কল্পনার অতীত।

"আমাদের বাড়ি সোদপুরে। খুব ছোটবেলায়, তখন বছর পাঁচেক বয়স, দুর্গাপূজার মহাষ্টমীতে তেঁতুল তলার আনন্দময়ী মার আশ্রমে আমার কুমারী পূজা হয়েছিল, জানেন

স্পষ্ট মনে আছে ঘটনাটা। ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠছে।"

শতাব্দীর কথার মাঝখানে ওর মা বল্লেন, "জানেন, ওর স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। ছোটবেলার সমস্ত ঘটনা গড় গড় করে বলে যেতে পারে। ঠাকুর দেবতা সংক্রান্ত কিছু হলে তো কথাই নেই। নিখুঁত বলে দেবে।" শতাব্দী উচ্ছ্বসিত হয়ে অধ্যাত্মস্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে, "আমায় লাল শাড়ি আর চেলী পরিয়ে চন্দন, সিঁদুর মাখিয়ে ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে পুজো করেছিলেন স্বয়ং আনন্দময়ী মা। ঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ আমার হাতে একটা পদ্মফুল দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন... স্পষ্ট মনে আছে আমার... কত লোক বেশির ভাগই মেয়ে বৌ আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল।"

আনন্দময়ীর স্মৃতির আবেশে আনন্দিতা শতাব্দীর উচ্ছ্বাসে মোহিত হয়ে বললাম, "তুমি পরম সৌভাগ্যবতী।"

অত্যন্ত শুদ্ধাচারে থাকে শতাব্দী। প্রতিদিন তারাপীঠ থেকে প্রসাদ আসে ওর জন্য। ও নিয়মিত পূজা করে। আদ্যোপান্ত পাঠ করে আদ্যাস্তোত্র। কখনও ভুল হয় না।

"কোন্ দেবী তোমার সবচেয়ে প্রিয় ?" আমার প্রশ্নের উত্তরে শতাব্দী বলল, "কালীকে সবচেয়ে ভাল লাগে।" "আশ্চর্য! ঐ ভয়ঙ্করী মহিলাকে ভাল লাগে?" আমার কথা শুনে শতাব্দী বিস্ময়ে নির্বাক। এইরকম অদ্ভুত কিছু শুনবে এ যেন ওর স্বপ্নের অতীত।

কেন যে কালীকে ভয়ঙ্করী মহিলা বলেছিলাম সেটা শতাব্দীর বোধগম্য হবার কথা নয়, আর কালী সম্পর্কে এই বিশেষণ আমার অজান্তেই মনের গভীর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কেন? সে প্রশ্নের জবাব এই বইতেই আছে, 'চিকন কালোরূপা সুন্দরী' অধ্যায়ে।

"দ্যাখো আমি দুর্গার উপাসক। উনি স্বয়ং আমাকে ওঁর নামমন্ত্র দিয়েছেন। দেবী দুর্গা সম্পর্কে তোমার কনসেপশন কি রকম?" বললাম আমি।

"দুর্গা চমৎকার, আশ্চর্য সুন্দরী। ঐশ্বর্যময়ী। ওঁর ভুবনমোহিনী রূপের সঙ্গে রুদ্রাণী ভাবটির মিশ্রণ আরো চমৎকার। তা ছাড়া দুর্গা পূজা আমাদের জীবনে দারুণ খুশির পুলক নিয়ে আসে। পুজোর কটা দিন আমরা সমস্ত কিছু ভুলে অনির্বচনীয় আনন্দলোকে ডুবে যাই... জানেন কি খারাপ লাগে আমার, বন্ধুরা ঠাকুর দেখতে যায়, আমি লোকজনের মধ্যে যেতে পারি না। ওরা কেমন অবাধে ঘুরে বেড়ায়, এটা সেটা কিনে খায়। আমি গাড়ি থেকে নামতে পারি না। আমি যে অন্য জগতের বাসিন্দা। বন্ধুরা খাবার নিয়ে এলে গাড়িতে বসে খাই।" এক ঝাঁক অতৃপ্তির কালো মেঘ শতাব্দীর উজ্জ্বল মুখ আড়াল করে দিল। ওর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

সত্যি কি অবর্ণনীয় নিঃসঙ্গ অবস্থা!

"বেশির ভাগ সময় ঘরে মধ্যেই আটকা থাকে। মা বাবা ভাই-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ জগৎ। কোথাও বিশেষ যেতে পারে না। বড় একাকী ও"—বেদনার্ত গলায় বললেন শতাব্দীর মা।

গুমোট ভাবটা কাটিয়ে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া আনতে প্রসঙ্গান্তরে গেলাম।

"তুমি আর দেবী রূপে আবির্ভূতা হতে চাও না?"

"সে রকম ছবি কই?"

"দুর্গার ভূমিকায় অভিনয় করবে?"

"হ্যাঁ করবে, ছবিটি যদি আপনি করেন" বল্লেন শতাব্দীর মা।

দুর্গাকে নিয়ে 'সিংহবাহিনী' ছবি করার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। দেখি সেটা এই শতাব্দীতেই চিত্রায়িত হয় কিনা! শতাব্দী আপন মনে কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ বলল ঃ

"আপনি যে 'সোহম্' ভাবের কথা বলছিলেন সেটা কি রকম?"

"সোহম্ হচ্ছে আমিই সেই অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম ভাব। এটা অনুভূতির প্রশ্ন, তবে এ কথা বলা যায়— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন দু রকম 'আমি' আছে। কাঁচা আমি আর পাকা আমি, এই পাকা আমিতেই সোহম্ ভাব জাগ্রত হয়।"

এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে কিছু উপক্রমণিকার প্রয়োজন আছে।

'অদৈক্ষত অহম্ বহুস্যাম্'

সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম লীলার মানসে পুরুষ ও প্রকৃতি (নারী) এই দুই ভাগে দ্বিধাবিভক্ত হলেন। এক থেকে দুই... তারপর ক্রমশঃ বহুরূপে তাঁর রূপান্তর। প্রকৃত অর্থে কিন্তু তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই, প্রাকৃত কোন মূর্তিও নেই, বিশ্বের যাবতীয় রূপেই ওঁর মহিমামণ্ডিত আত্মপ্রকাশ।

তিনি ব্রহ্ম। নির্বিকল্প, নির্গুণ, নিরঞ্জন। সেই নিরাকার ব্রহ্মকে রূপময় করেছেন ভগবতী মহামায়া। এই মায়া দুস্তরা, দুর্বোধ্য, দুরতিক্রম্য, এই মায়াকে মহামায়া, বিষ্ণুমায়া, ভগবতী মায়া যাই আখ্যা দেওয়া হোক না কেন সমস্তই সমার্থক শব্দ। এই মায়া সম্পর্কে শাস্ত্র বলছে ঃ

অথ ভগবতী মায়া দুর্বোধ্য বিজিতাত্মনাম
বিমোহয়ন্তি সংসারে নানাত্বাৎ ইন্দ্রজালবৎ

এই ভগবতী মায়া দেবতাগণের দুর্বোধ্য, এবং সংসারে নানাভাবে ইন্দ্রজালের মত সকলকে মোহগ্রস্ত করে।

এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুব দুষ্কর। এ সম্পর্কে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ঃ

দৈব হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতা তরন্তি তে

আমার এই ত্রিগুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) দৈবী (অলৌকিক) মায়া খুবই দুস্তরা, যাঁরা আমাকে উপাসনা করেন, কেবলমাত্র তাঁরাই এই মায়া হতে উত্তীর্ণ হতে পারেন।

দেবীভাগবতম্ মতে স্বয়ং মহামায়াই আপন মায়াজালে আচ্ছন্না। প্রয়োজনে ওঁর মায়ার আবরণ উন্মোচন না করলে উনি নিজের স্বরূপ দেখতে পান না।

এই মায়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় তিনটি—এত বিশাল হতে হবে যাকে আয়ত্তে আনা মায়াজালের সাধ্যাতীত কিংবা এত ক্ষুদ্র হওয়া দরকার যাতে মায়াজালের ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়া যায় অথবা একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে সাক্ষী স্বরূপ অবস্থান করতে হবে।

কিছু কিছু সাধক আছেন যাঁরা মহামায়ার কবল থেকে মুক্তি পেতে সোহম্ অর্থাৎ আমিই সেই ভাব আনতে চান। এ ক্ষেত্রে মস্তবড় বিশাল হয়ে মায়া উত্তরণের প্রচেষ্টা খুবই কঠিন। দুরূহ সাধনা।

প্রাণায়ামের সাহায্যে সোহম্ ভাবে আসার আর এক ধরনের সাধন পদ্ধতি আছে। এটা জেনেছিলাম হংসানন্দ অবধূতের কাছে একবার গঙ্গাসাগর মেলায়। এটি খুব জটিল প্রক্রিয়া, দীর্ঘ সাধনা সাপেক্ষ। ব্যাপারটি সংক্ষেপে জানাচ্ছি তবে তার আগে 'হংস' শব্দটি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

সাধন মার্গে না থাকলেও সাধারণ মানুষ 'পরমহংস' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। এই রকম একটি ধারণা প্রচলিত আছে জলচর ও স্থলচর (উভচর) প্রাণী হংস বা হাঁস জল মেশানো দুধ থেকে শুধু দুধটুকু (সারাংশ) ছেঁকে গ্রহণ করে ও বাকী জল (অসার পদার্থ) ত্যাগ করে।

তা ছাড়াও হংস শব্দের অনেক অর্থ যেমন— জীবাত্মা, পরমাত্মা, শিব, সূর্য, গুরু, সন্ন্যাসী, বিষ্ণু, ইত্যাদি। তন্ত্রমতে বলা হয়েছে কুন্ডলিনী শক্তি ((স্ত্রীশক্তি) 'হংস'কে আশ্রয় করে জীবাত্মাকে ধারণ করেছেন। হংস রয়েছেন প্রাণকে আশ্রয় করে।

প্রাণায়ামের সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে হংস শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্বাস গ্রহণ হয় 'হং' মন্ত্রে ও বহির্গমন হয় 'সঃ' মন্ত্রে। তাই হংস নাম জপ।

হংসো বিহঙ্গভেদে স্বাদর্কে বিষ্ণৌ হয়ান্তরে
যোগিমন্ত্রাদি ভেদেষু পরমাত্মন্যসৎসরে
নির্লোভনৃপতৌ হংস শারীর মরুদন্তরে

—বিশ্বতন্ত্র

বিভিন্ন উপনিষদে 'হংস' সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যেমন ঃ

হংস শুচিষদ্বদুরন্তরিক্ষস
দ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ
নৃষদ্বর সদৃতসদ্ব্যোম সদব্জা
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম বৃহৎ

— কঠোপনিষদ

হংস স্বর্গরূপ শুচিদেশে অবস্থান করে (শুচিষৎ), সর্বলোকের স্থিতিস্থাপক (বসু), অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করে (অন্তরিক্ষসৎ), অগ্নিরূপ (হোতা), পৃথিবীর বেদীতে বাস করে (বেদিষৎ), সোমরসরূপ 'দুরোণ' বা কলসে অবস্থান করে (অতিথি দুরোণসৎ), মানুষের দেহেও থাকে (নৃষৎ), সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থেও অবস্থিত (বরসৎ), জলচর (অব্জ), গোরূপী পৃথিবীতে জাত (গোজা), সত্যমূর্তি (ঋতজা), জল (নদী) রূপে পর্বতে প্রকাশমান (অদ্রিজা)।

'হংস' সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান। যোগ সাধনার ফলে অজ্ঞানের অন্ধকার ক্রমশঃ দূর হয়ে হংস লক্ষণ বা পরম জ্ঞান (আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, বিশুদ্ধজ্ঞান) প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রমতে 'হং' বর্ণটিকে পুরুষ ও সঃ বর্ণটিকে প্রকৃতি (স্ত্রী) চিন্তা করা হয়েছে। সুতরাং পুরুষ

ও প্রকৃতির (নারী) মিলনেই 'হংস'র সৃষ্টি। এই নাম বা মন্ত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ছন্দময় ভাবে আপনা থেকেই জপ হয় বলে একে 'অজপা' জপ বলে। জীব অবিরত হংস জপ করে ঘণ্টায় বহুবার।

যখন সাধন বলে পুরুষ ও প্রকৃতি এক হয়ে যায় তখনই হংস 'সোহম্' রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

সকারাণং হকারাণং লোপয়িত্বা ততঃ পরম্

সন্ধিং কুর্যাৎ পূর্ণরূপং তদাসৌ প্রণতো ভবেৎ

অতঃপর যদি মূর্তিস্বরূপ 'স' করাকে বিলুপ্ত করা যায় তা হলে সন্ধি করে 'সোহম্' পরিণত হয় প্রণব বা ওঁকারে।

সঃ কারণ বহির্যাতি 'হং' কারেণ বিশেৎ পুনঃ

হংসেতি পরমম্ মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা

—নিরুত্তর তন্ত্র

যোগ সাধনার সময় প্রাণায়াম কালে পূরক অর্থাৎ প্রশ্বাস গ্রহণের সময় 'হং' কার জপ করতে হয় আবার রেচক অর্থাৎ নিশ্বাস ত্যাগের সময় 'স' কার হংস পরম মন্ত্র জপ করতে হয়।

তন্ত্রমতে 'হংস' মহামন্ত্র। কুলার্ণব তন্ত্রে একে শ্রীপ্রসাদপরা বলা হয়েছে। প্রসাদ শব্দের অর্থ— প্রসাদ অর্থাৎ এই মন্ত্র জপে ব্রহ্মের প্রসাদ (আশীর্বাদ) পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে 'পরা' (সর্বশ্রেষ্ঠ) বিশেষণ যোগ হওয়ায় এই মন্ত্রর তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সমস্ত মন্ত্রবলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করা সম্ভব তার মধ্যে হংস মন্ত্র শ্রীপ্রসাদপরা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অক্ষর অর্থাৎ তাঁর ক্ষয় বা বিকার কিছুই নেই।

ষটচক্র সাধন অনুসারে 'হংস শব্দের উৎপত্তি অনাহত চক্রে (হৃদয়), বিশুদ্ধি চক্রে (কণ্ঠ) এর শুদ্ধি এবং 'সোহম্'-এ রূপান্তর অতঃপর আজ্ঞাচক্রে (ভ্রূ যুগলের মাঝখানে) সোহম্-এর ওঁকারে পরিণতি ও সর্বশেষে সহস্রারে বা সহস্রদল চক্রে (মস্তিষ্কে) এর বিলুপ্তি পুরুষ ও প্রকৃতির (শিবশক্তি) মিলনে।

কোন রকম সাধনা ছাড়াও সোহম্ ভাবে আসা যায়, তবে সেখানে থাকে পূর্বজন্মের ও এই জন্মের সুকৃতি, অধ্যাত্মচেতনা, মুমুক্ষুত্ব। শতাব্দীর মধ্যে এই তিনটিই আছে বলেই মনে হয়। দীর্ঘকাল সাধন মার্গে বিচরণ করেছি, এটুকু চিনতে বোধ হয় ভুল হবে না। শতাব্দী যদি বিচ্যুত না হয়ে এই ভাব ধরে রাখতে পারে ও উপযুক্ত সঙ্গ পায় তবে মহর্ষি অম্ভৃণের বাক নাম্নী বিদুষী কন্যার মতই হঠাৎ ব্রহ্মশক্তি মহামায়ার সঙ্গে নিজের একাত্মতা ও অভিন্নতা অনুভব করে নিজেকে সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা দেবে।

বাক এই দুর্লভ অবস্থা লাভ করে স্তোত্র-মন্ত্রে ঘোষণা করেছিলেন আত্মপরিচয় যা দেবীসূক্ত নামে খ্যাত।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে স্প্রাবে যজমানায় সুন্বতে
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্
তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোতুক্তম্
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়তি শ্রুধি শ্রুত শ্রবিদ্ধং তে বদামি
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ
য কাময়ে তাং তমুগ্রং কৃণোমি তাং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ
অহং জলয় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধণ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে
ততো বিতিষ্টে ভুবণানু বিশ্বতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিমা সং বভূব

—ঋগ্বেদ

আমি রুদ্রগণরূপে, বসুগণরূপে, আদিত্যগণরূপে এবং সকল দেবতা রূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে ধারণ করি। আমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

আমি দেবশত্রুহন্তা সোম দেবকে, ত্বষ্টা নামক দেবতাকে এবং পূষা ও ভগ নামক সূর্যদ্বয়কে ধারণ করি। হবিঃ ধারণকারী, দেবগণের তৃপ্তিসাধনকারী এবং সোমরস প্রস্তুতকারী যজমানের জন্য যজ্ঞফলরূপ ধনাদি আমিই ধারণ করি।

আমি সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, ধনসমূহের প্রদাত্রী দেবী, পরব্রহ্ম শক্তি ও যজ্ঞার্হগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা এবং সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। সর্বদেশে দেবতা ও মনুষ্যাদি যজমানগণ আমাকেই নানাভাবে আরাধনা করেন।

যে অন্ন ভক্ষণ করে, সে আমারই শক্তিতে করে। যে দর্শন করে, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি নির্বাহ করে, কথিত বিষয়ে শ্রবণ করে, সেও আমারই শক্তিতে করে। যাঁরা আমাকে অন্তর্যামীরূপে জানেন না, তাঁরা সংসারে হীন হয়ে থাকেন। হে কীর্তিমান সখে! আমি শ্রদ্ধাদ্বারা লভ্য বস্তু ব্রহ্মতত্ত্ব তোমায় উপদেশ করছি, তুমি শ্রবণ কর।

আমি দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রার্থিত ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে স্বয়ং উপদেশ করছি। আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমি যাঁদেরকে ইচ্ছা করি, তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ করি। আমি কাউকে ব্রহ্মা করি, কাউকে ঋষি করি, কাউকে বা মহামনীষী করি।

ব্রাহ্মণবিদ্বেষী অসুরদের বিনাশ করবার জন্য রুদ্রের ধনুতে আমিই গুণ সংযুক্ত করি। সজ্জনদের কল্যাণের জন্য আমিই যুদ্ধ করি এবং আমিই স্বর্গ ও পৃথিবীতে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিতা আছি।

সর্বাধার পরমাত্মার উপর আমিই দ্যুলোককে প্রসব করেছি। বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত ব্রহ্মচৈতন্যেই আমার অধিষ্ঠান। আমিই সর্বভূতে ব্রহ্মরূপে বিবিধভাবে রয়েছি। নিজ কারণভূত মায়াময় দেহদ্বারা আমিই সমগ্র দ্যুলোকে ব্যাপ্ত আছি।

আমিই সমস্ত ভুবন সৃষ্টি করে তাদের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্রই বায়ুর ন্যায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করি। যদিও স্বরূপতঃ আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, আকাশের অতীত ও পৃথিবীর উপরে, তবুও নিজ মহিমায় আমিই এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ ধারণ করেছি।

—

তন্ত্রচিকিৎসা

সমুদ্র মন্থনের সময় অনেক কিছুর সঙ্গে চিকিৎসার দেবতা ধন্বন্তরীও উঠেছিলেন। ইনি দিব্যকান্তি সুপুরুষ। চারটি হাতে যথাক্রমে ত্রিশূল, গদা, দণ্ড ও ওষধি পাত্র।

যাইহোক ধন্বন্তরী আমাদের আলোচ্য নন। এখানে যাঁর কথা বলছি তিনি ধন্বন্তরী বাবা নামে পরিচিত। এরকম একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে ধন্বন্তরী সর্বরোগ আরোগ্য করতে সক্ষম। ধন্বন্তরী বাবার আসল নাম যাই হোক উনি যাবতীয় ব্যাধি মুক্তিতে সিদ্ধহস্ত। সেই জন্যই জনগণ ওঁকে ধন্বন্তরী আখ্যা দিয়েছেন।

ওঁর কাছে কত যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি এসে উপকৃত হচ্ছেন তার কোন হিসেব নেই। ওঁর চিকিৎসা পদ্ধতি আলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী বা এই জাতীয় কিছু নয়। উনি তান্ত্রিক সাধক। তন্ত্রমতেই চিকিৎসা করেন।

ধন্বন্তরী বাবা দক্ষিণা কালীর উপাসক। কালীমূর্তির পাশেই একটি ধন্বন্তরীর মূর্তি রয়েছে। ধন্বন্তরীর মূর্তি আমি অন্য কোথাও দেখিনি। একটি বিখ্যাত ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আমাকে ধন্বন্তরীর সুন্দর একটি ছবি দিয়েছিলো। ছবিটি আমার বাড়ির চেম্বারে রাখা আছে। ঐ ছবিটির সঙ্গে ধন্বন্তরীর মূর্তির হুবহু মিল রয়েছে।

এক তান্ত্রিকেব কাছে সংবাদ পেয়ে ধন্বন্তরী বাবার কাছে গিয়ে কিছুদিন থেকে তন্ত্র চিকিৎসা শিখেছিলাম। তন্ত্র চিকিৎসায় ক্ষেত্র বিশেষে মন্ত্র ও নানারকম নিয়মাবলী পালন করতে হয় তা। ছাড়া গাছগাছড়া, শেকড়বাকড়, জড়িবুটি ও অন্যান্য বহু প্রকার উপাদাণ প্রয়োগেরও বিধান দেওয়া আছে। তন্ত্র চিকিৎসার কয়েকটি পদ্ধতি এখানে উল্লেখ করছি।

সর্বজ্বর নাশন মন্ত্র

হ্রীং হ্রীং হ্রুং ক্রৌং ক্রঃ

এই মন্ত্রটি পাঠ করে জ্বরাক্রান্ত রোগীকে তিনবার আঘাত করলে যে কোন রকমের জ্বর ছেড়ে যায়। এটি উড্ডীশ তন্ত্রের মন্ত্র।

সর্বজ্বর হরণ মন্ত্র

ওঁ ক্রীং ক্ষীং হুঁ হন্ হন্ ফট্ ফট্

অয়ং সর্বজ্বর হরো মন্ত্র

এই মন্ত্রে সাতবার রোগীর গা ঝাড়লে তার জ্বরমুক্তি হয়। এটি উড্ডীন মন্ত্র।

জ্বর ঝাড়ন মন্ত্র

ওঁ আদেশ গুরুকো ছারু ছারু সমুদ্র উপরি লঙ্কা, লঙ্কা উপরি ত্রিজটা, ত্রিজটাকী তিন পুত্রী। ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক ও ত্র্যাহিক।

রাজা অজয় পালকী অমুকঞ্চ আনেতহনি
মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি কুরো মন্ত্র ঈশ্বর বাচা

অমুকঞ্চের জায়গায় রোগীর নাম গ্রহণ করে উপরের মন্ত্রে তিনবার ঝাড়লে জ্বর উপশম হয়। এই মন্ত্র শাবর তন্ত্র থেকে নেওয়া।

জ্বর ইত্যাদি সর্বরোগ শান্তি মন্ত্র ও পদ্ধতি

প্রথমে জ্বর শান্তির জন্য সঙ্কল্প করে "অগস্ত্য ঋষিরনুষ্টুপ ছন্দঃ কালিকা দেবতা জ্বরস্য সদা শান্ত্যার্থে বিনিয়োগঃ" এই মন্ত্রে ঋষি ইত্যাদি ণ্যাস করার পর

ওঁ কুবেরস্তে মুখং রৌদ্রং নন্দিমানন্দি মাবহন্
জ্বরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জ্বরং নাশয়তে ধ্রুবম্

এই মন্ত্র এক হাজার বার একাগ্রচিত্তে জপ করে আমপাতায় হোম এবং কালিকার পূজা দিলে সর্বপ্রকার দূষিত জ্বর উপশম হয়। এছাড়া তুম্বুর ভৈরবের ধ্যান ও মন্ত্র জপ করলে (সাধ্যমত) যে কোন্ রকম জ্বর শান্তি হয়। মন্ত্র,

ওঁ তুম্বুরভৈরব হৌঁ সর্বশান্তিং কুরুকুরু রং রং হ্রীঁ হ্রীঁ

কিংবা একমনে ভক্তিভরে "ওঁ শান্তে শান্তে সর্বারিষ্টনাশিণি স্বাহা" মন্ত্রটি একলক্ষ বার জপ করলে যাবতীয় রোগ সেরে যায়, অথবা "এতদ্দিনত্রয়ং কুর্থাৎ জ্বররোগপশান্তয়ে" এই মন্ত্রে কঠিন জ্বর বা ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যাক্তির নামে সঙ্কল্প করে কালীপূজা ও তিনদিন কালো ছাগ বলি দিলে যে কোন দূরারোগ্য জ্বর ও ব্যাধির উপশম হয়। এই মন্ত্রগুলি কামরত্ন তন্ত্র থেকে সংকলিত।

কোন কোন জ্বরে নাগদোনা গাছের পাতা একদিন অন্তর পুঁটলিতে বেঁধে তিনদিন তার ঘ্রাণ নিযে তার পরের দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে তেমাথা রাস্তায় ফেলে দিলে জ্বর উপশম হয়।

বিভিন্ন রকম জ্বরে তুলসী, গুলঞ্চ, বেলপাতা, চিরেতা, শেফালিকা, ক্ষেৎপাপড়া, কাল কাসুন্দা, করবী গাছের ছাল, শিউলি পাতা ইত্যাদির প্রয়োগ করা হয়।

শ্বেতজয়ন্তীর মূল মাথার চুলে বেশ শক্ত করে বেঁধে রাখলে জ্বর ছেড়ে যায়।

বিষহর চিকিৎসা

তন্ডুলাম্ভিঃ শিরীষস্য পীতং বিষাপহং

শিরীষের মূল বেটে চালধোয়া জলের সঙ্গে পান করালে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

তন্ডুলাম্ভিশ্চ বর্ষাভোঃ শুক্রায়া সর্পদংশনুভ

তন্ডুল সহযোগে শ্বেত পুনর্ণবার মূল জলের সঙ্গে পান করালে সর্পবিষ মুক্ত হয়।

পিপ্পলী নবনীতঞ্চ শৃঙ্গতঞ্চ শৃঙ্গবেরঞ্চ সৈন্ধকং

মরিচং দধিকুষ্ঠশ্চ নস্যে পানে বিষং হরেৎ

পিপুল, নবনীত, সৈন্ধক, শুণ্ঠি, মরিচ, দধি ও কুড় ইত্যাদি একত্রে নস্য হিসেবে প্রয়োগ করলে কিংবা পান করলে বিষ নষ্ট হয়।

ত্রিফলার্দ্রক কুষ্ঠাঞ্চ চন্দনং ঘৃতসং যুতং

এতৎ পানাঞ্চ লেপাচ্চ বিষনাশো ভবেৎ ধ্রুবম্

ত্রিফলা, আদা, কুড় ও চন্দন একত্রে পেষণ করে পান ও সর্প যেখানে দংশন করেছে সেইখানে প্রলেপ দিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

কেউ যদি বিষপান বা ভক্ষণ করে তাহলে একপোয়া গোমূত্র বা তুতেঁর জল কিংবা অপরাজিতার মূল বেটে গাওয়া ঘিয়ের সঙ্গে খাওয়ালে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়।

শ্বেতজবা ও শ্বেতকরবীর দক্ষিণ দিকের মূল আদার রসে বেটে আস্তে আস্তে পেটের ওপর প্রলেপ দিলে বিষ বিনষ্ট হয়।

শ্রীফলস্য জটাং সূক্ষং চূর্ণাকৃত্য নিধাপয়েৎ

শানদ্বয়মিতং চূর্ণং কাজিকেন তু পায়য়েৎ

স্থাবরং জঙ্গমং ক্ষেড়ং তথা দূষীবিষয়ঞ্চয়ৎ

তৎ সর্ব নাশযেৎ দেব নাত্র কার্যা বিচারণা

বেলগাছের মূল সংগ্রহ ও চূর্ণ করার পর এক তোলা পরিমাণ গ্রহণ করতে হবে তারপর বেলগাছের সূক্ষ্ম মূল কাঁজির সঙ্গে সেবন করলে স্থাবর জঙ্গম ও অন্যান্য দূষিত বিষ বিনষ্ট হয়।

পটোলমূলনস্যেন কালদষ্টোহ'পি জীবতি

পটলগাছের মূলের নস্যি তৈরি করে ঘ্রাণ নিলে কালসর্প দংশন করেছে এমন ব্যক্তিও জীবন ফিরে পায়।

এ ছাড়াও বিষ ঝাড়ার নানারকম মন্ত্র আছে, তারমধ্যে কয়েকটি যেমন, 'ওঁ ডহুঁ ডাঃ' অনেন স্থাবর জঙ্গবিষং নাশয়তি। 'ওঁ ডহং এমতঃ' আনেন চ স্থাবরং জঙ্গমং বিষম-নাশয়তি।

প্রথম মন্ত্রে একুশবার ও দ্বিতীয় মন্ত্রে সাতবার ঝাড়লে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্তপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়।

"ওঁ খং খং বং বং টং টং যং যং সঃ" এই মন্ত্রে একুশবার ঝাড়লে বিষ নেমে আসে।

বিষ বিনাশের আরো বহু পদ্ধতি আছে তার মধ্যে কয়েকটি

বরাহ গোধা নকুল শশ কুক্কুটপিণ্ডকং

শ্বেতায়া গিরিকর্ণাশ্চ মূলঞ্চ পেষয়েৎ

পানে সর্ববিষং হন্তি মৃতোহপুত্তিষ্ঠতে নরঃ

শূকর, গোসাপ, বেজি, খরগোস ও মুরগির পিত্ত এবং সেই সঙ্গে শ্বেত অপরাজিতার

ফল ও মূল একসঙ্গে জলে গুলে পান করলে যাবতীয় বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। এই ওষুধে সাপে কামড়ানো মানুষকেও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

আফুলো কলাগাছ ঝুর ঝুর ঝুরে দেবীর কৃপায় বিষ ঘা মুখে পড়ে
গরুড়ের আজ্ঞা তোকে জানাই ঘা মুখে আয় সত্বর তাই কাঁপিসনে ওরে
বিষ শীঘ্র নেমে আয় মা মনসা ডাকিছে আয়
শিবঠাকুর ডাকে বিষহরির দোহাই
না নামিলে নাই রেহাই
কার আজ্ঞে—মা মনসার আজ্ঞে
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সাতবার ফুঁ দিলে বিষ নেমে আসে।

চক্ষুরোগ প্রতিরোধ ও বিনাশ

শর্য্যাতিঞ্চ সুকন্যাঞ্চ চ্যবনং সত্ত্বরস্মশ্বিদং
ভোজনান্তে স্মরেদ্যস্তু তস্য চক্ষুঃ প্রসীদতি

আনেন মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং জলং ক্ষিপেৎ চক্ষুষাং সপ্ত বারং, ভোজনান্তে এষ ভাবিনে নেত্রব্যাধি প্রতিষেধকোশ্চোত্তমঃ

প্রত্যহ আহারান্তে উপরোক্ত মন্ত্র সাতবার উচ্চারণ করে সাত গন্ডূষ জল নিয়মিত ঝাপটা দিলে চোখের রোগ হয় না। এটি যোগসার তন্ত্রে বর্ণিত আছে।

হুঁকোর জল চোখে ঝাপটা দিলে চক্ষু রোগ উপশম হয়। বটের আঠা, স্তনদুগ্ধ, চা খড়ি, গেরুমাটি, শুঁঠ, বচ ভালভাবে বেটে চোখে প্রলেপ দিলে চোখের রোগ সেরে যায়।

তেঁতুলের ক্বাথ, পাকা ডালিমের দানার রস, কাগজী লেবুর রস চোখে দিলে চোখের নানারকম রোগ উপশম হয়।

শিশুরোগে মন্ত্র ও ওষুধ

নাগরাতিবিষামুস্তং বালকেন্দ্রযবৈঃ কৃতং
কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্বাতিসারনাশনং

শুন্ঠি, মুথা, আতইচ, বালা ও ইন্দ্রযবের একত্র মিশ্রণ পান করলে অতিসার রোগ নিরাময় হয়।

অঙ্কোটকমূলমথবা তণ্ডুল সলিলেন বটজম্বুদলং বা
পীতং হন্ত্যতীসারং গ্রহণীরোগঞ্চ সুর্বারং

বটগাছের ও জামের পাতা আতপ চাল ধোওয়া জলে মিশিয়ে পিষে পান ও সেবন

করালে গুরুতর অতিসার ও গ্রহণী রোগ নিরাময় হয়।

সুসূক্ষ্মং পিপ্পলীনাম্ভূচূর্ণং সমধুশর্করাং
রসেন মাতুলুঙ্গস্য হিক্কাছর্দিনিবারণং

এটি কুমার তন্ত্রের বিধান। পিপুলচূর্ণ, মধু, আখের রস ও চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে শিশুদের সেবন করালে বমি ও হিক্কা সেরে যায়।

বিল্বঃ শিরিষো গোলোমী সুরাদিশ্চ যোগনঃ
পরিষেকঃ প্রয়োক্তব্য স্কন্দাপস্মারপান্তয়ে

বেলগাছের মূলের ছাল, শিরিষের ছাল, শেতদূর্বা ও সুরসাদি (কৃষ্ণতুলসী, শ্বেততুলসী, আকন্দ, বামন হাটি, মহুয়া ফুল. কলহার, সুগন্ধি চাল, রাই সরষে, শ্বেত বাবুই তুলসী, বটফল, কালকাসুন্দ, সল্লকী বৃক্ষ, বিড়ঙ্গা, নিসিন্দা, কর্ণিকার, যজ্ঞডুমুর, বেড়েলা মূল, কাকমাচী ও বিষমুষ্টি ইত্যাদি) একত্রে মিশিয়ে ক্কাথ পানে কন্দাপস্মার গ্রহদোষ দূর হবে।

তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঝাড়তে হবে শিশুকে। ঝাড়ার আগে চতুষ্পথে শিশুটিকে স্নান করানো দরকার। মন্ত্র যথা

স্কন্দাপস্মার সংজ্ঞোযঃ স্কন্দস্য দযিতঃ সখা
বিশাখাঃ স শিশোরস্য শিবয়াস্ত শুভানন

—ভাবপ্রকাশ তন্ত্র

যিনি স্কন্দগ্রহের প্রিয় সখা বিশাখা নামে পরিচিত সেই শুভ আনন স্কন্দাপস্মার দেবতা এই শিশুর মঙ্গল করুন। এই মন্ত্রে ঝাড়লে স্কন্দাপস্মার রোগ (মূর্চ্ছা ও মৃগীজাতীয় রোগ) নিরাময় হয়।

স্ত্রী রোগ

জ্যোতিস্মতী পত্ররাজীবচসেনভবোহর্কো হি
শীতলঃ পয়সা পীতো নারীনাং পুস্পকারক

লতা কাটকী গাছের পাতা, রাই সরষে, বচ ও আমলকী গাছের ছাল একত্রে মিশিয়ে ঠাণ্ডা ক্কাথ দুধের সঙ্গে সেবন করালে মেয়েদের ঋতুবন্ধ নিরাময় হয় অর্থাৎ পুনরায় নিয়মিত ঋতুশ্রাব শুরু হয়।

অশ্বগন্ধাভবার্কেন সিদ্ধং দুগ্ধং ঘৃতান্বিতং
ঋতু স্নাতাঙ্গনা প্রাতঃ পীত্বা গর্ভং দধাতিহি

—অর্কপ্রকাশ তন্ত্র

অশ্বগন্ধা মূলের নির্যাসের সঙ্গে খাঁটি দুধ পাক করে ঋতুমতী নারীকে প্রাতঃকালে পান করালে বন্ধ্যা নারীও গর্ভবতী হবে।

পলাশ গাছের একটি পাতা, কোন গর্ভবতী নারীর স্তনদুগ্ধে পেষণ করে ঋতুকালে এক সপ্তাহ পান করালে কিংবা নাগকেশর চূর্ণ সদ্যোজাত গরুর দুধের সঙ্গে এক সপ্তাহ সেবন ও সেই সঙ্গে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করলে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা গর্ভবতী হবে। প্রথম

ক্ষেত্রে দুধ, শালিধানের ভাত, মুগের ডাল ও লঘুপাক আহার ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘি দুধ নিয়মিত আহার করা দরকার। তারপর নীচের মন্ত্রে উপরোক্ত যে কোন ওষুধ একশো আটবার অভিমন্ত্রিত করে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মন্ত্র,

ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায় অমুকীং পুত্রবতীং কুরুকুরু স্বাহা

এখানে অমুকীং এর-জায়গায় স্ত্রীলোকটির নাম উচ্চারণ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। মন্ত্রে 'পুত্রবতী' উল্লেখ থাকলেও এক্ষেত্রে 'সন্তানবতী' বললেও একই ফল পাওয়া যাবে।

পূর্বং পুত্রবতী যা সা ক্কচিদ্বন্ধ্যা ভবেত যদি
কাকবন্ধ্যা তু সা জ্ঞেয়া চিকিৎসা তত্র কথ্যতে

—শ্রীদত্তাত্রেয় তন্ত্র

যে নারী একবার মাত্র পুত্র (সন্তান) প্রসব করে আর গর্ভধারণে সমর্থ হয় না তাকে কাকবন্ধ্যা বলে।

অপরাজিতা লতা মূলের সঙ্গে উত্তোলন করে মোষের দুধের সঙ্গে পিষে ঋতুকালে ভক্ষণ অথবা রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার মূল উত্তোলন করে মোষের দুধের সঙ্গে বেটে প্রতিদিন চার তোলা পরিমাণ "সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা চিরায়ুষম্" সেবনের পর স্বামীর সঙ্গে যৌন মিলন করলে কাকবন্ধ্যা দোষ মুক্ত ও দীর্ঘজীবী পুত্র (সন্তান) হয়। তবে উল্লিখিত ওষুধ "ওঁ নমো শক্তিরূপায় অস্যা গৃহে পুত্রং কুরু কুরু স্বাহা" এই মন্ত্রে একশো আটবার পুরশ্চরণ করে সেবন করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব। এই মন্ত্র ও পদ্ধতি তন্ত্রকোষ বর্ণিত।

গর্ভসঞ্জাতমাত্রেণ পক্ষে মাসে চ বৎসরে
পুত্রো ম্রিয়তে বর্ষাদৌ যদ্যাঃ সা মৃতবৎসিকা

—শ্রীদত্তাত্রেয় তন্ত্র

যে স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর একপক্ষ, একমাস বা একবছরে সন্তান বিনষ্ট হয় সেই নারীকে মৃতবৎসা বলে। "ওঁ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মনে অমুকীং গর্ভে দীর্ঘজীবীসুত কুরু কুরু স্বাহা" ভক্তিভরে পূজার পর একাগ্রমনে সঙ্কল্পঅনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যায় এই মন্ত্র জপ করবে। 'অমুকী'র জায়গায় স্ত্রীলোকের নাম উচ্চারণ করতে হবে।

প্রতিবর্ষমিদং কুর্যাদ্দদীর্ঘজীবিসুতং লভেৎ
সিদ্ধিযোগমিদং খ্যাতং নান্যথা শঙ্করোদিতম্

—শ্রীদত্তাত্রেয় তন্ত্র

প্রতিবছর এইরকম পূজা অর্চনা করলে মৃতবৎসা রমণীর দীর্ঘজীবী পুত্র (সন্তান) লাভ হয়। এই সিদ্ধিযোগ শঙ্কর উক্ত সুতরাং কারো কোন অবিশ্বাসের কারণ নেই।

গৃহীত্বা শুভনক্ষত্রে ত্বপামার্গস্য মূলকম্
গৃহীত্বা লক্ষ্মণামূলং একবর্ণ গবাং পয়ঃ
পীত্বা সা বিভ্রতে গর্ভং দীর্ঘজীবিসুতো ভবেৎ

—শ্রীদত্তাত্রেয় তন্ত্র

শুভনক্ষত্রে অপামার্গের মূল ও লক্ষণামূল উত্তোলন করে একবর্ণা গাভীর দুধের সঙ্গে বেটে পান করলে সেই রমণীর গর্ভস্থ পুত্র (সন্তান) দীর্ঘজীবী হয়। এই ওষুধ সেবনের আগে "ওঁ পরমং..." ইত্যাদি মন্ত্রটি একশো আটবার জপ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা

অথবা

ওঁ মুক্তা পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্যেন রশ্চয়ঃ
মুক্ত সর্বভয়াদগর্ভ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা

এর যে কোন একটি মন্ত্রে কিছুটা জল অভিমন্ত্রিত করে সেই জল গর্ভিণীকে পান করালে খুব তাড়াতাড়ি প্রসব হয়। মন্ত্র আটবার পাঠ করা কর্তব্য।

প্রসব বেদনা শুরু হবার পর প্রসবের অনেক দেরি হলে দশমূলের ইষৎ উষ্ণ ক্বাথ প্রথম মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে গর্ভিণীকে পান করালে খুব শীঘ্রই যন্ত্রণাহীন প্রসব হবে।

"অং অঁ হাং নমস্ত্রিমূর্তয়ে" এই মন্ত্র আতুড়ঘরে বসে জপ করলে (একশো আটবার) প্রসূতি বেদনাহীন অবাধ প্রসবে সমর্থ হয়।

পারাবত শকৃৎ পীতং সিততণ্ডুলবারিণা
গর্ভপাতানন্তরোত্থং রক্তশ্রাব নিবারণং

পায়রার বিষ্ঠা শালি ধানের চাল ধোয়া জলের সঙ্গে পান করালে প্রসবকালে অধিক রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

কদম্বমূলকল্কঞ্চ খদিরাঙ্গমিশ্রিতং
মাংস নারী পিবেৎ কালে যোনিশূলনিপীড়িতা

কদম্বীমূলের কল্ক খদির কাঠের কয়লা সহযোগে একমাস সেবন করালে যোনিশূল নিবারিত হয়।

রসাজনং তণ্ডুলীয়স্য মূলং ক্ষৌদ্রান্বিতং তণ্ডুলতোয়পীতং
অসৃগ্দরং সর্বভবং নিহন্তি শ্বাসঞ্চ ভার্গীসহ নাগরেণ

—প্রয়োগ চিন্তামণি তন্ত্র

রসাঞ্জন ও চাঁপানটের মূল একত্রে পিষে রোগিণীকে সেবন করালে যাবতীয় প্রদর রোগ সেরে যায়। বামন আটি ও শুন্টি একসঙ্গে পিষে খেলে ঐ একই কাজ হয়।

লোধ্রতুম্বীকলালেপাৎ যোর্নেদাঢ্যং করোতি চ

লোধ ও লাউ একসঙ্গে বেটে যোনিতে প্রলেপ দিলে শিথিল যোনি দৃঢ় হয়।

শালিতণ্ডুলচূর্ণন্তু সদুগ্ধং দুগ্ধকৃদ্ভবেৎ

শালি ধানের চালের গুঁড়ো দুধের সঙ্গে সেবন করলে প্রসূতির স্তনে নিশ্চয় দুধের সৃষ্টি হবে।

কুষ্ঠনাগ বল চূর্ণ নবনীত সমন্বিতং
তল্লোপা যুবতীনাঞ্চ কুর্যান মনোহর স্তনং

—গরুড় তন্ত্র

কুড় ও গোরক্ষাচাকুলে গুঁড়িয়ে মাখনের সঙ্গে মিশিয়ে স্তনে নিয়মিত প্রলেপ দিলে যুবতীদের স্তন সুন্দর, আকর্ষণীয় ও মনোহর হয়।

শূলরোগ প্রতিকার

"ওঁ অদ্যোত্যাদি অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্মণঃ শূলরোগ প্রতিকার কামনায় অমুক মন্ত্রং সহস্রং (অযুতং লক্ষং বা) জপহমং করিস্যামি" এই মন্ত্র পাঠের পর সংকল্প করে শিবলিঙ্গে ত্র্যম্বকপূজাপদ্ধতির বিধানে যথাশক্তি পূজা করে "ওঁ মীঢুষ্টমঃ শিবতমঃ শিবো নঃ সুমনা ভব পরমোব্রহ্মা আয়ুধান্নিধায় কৃত্তিং বসান আচারপিণাকং বিভ্রদাগহি" এই মন্ত্র একাগ্রচিত্তে সংকল্প মত সংখ্যা জপ করলে শূল রোগ নিরাময় হয়।

কশোরু শৃঙ্গাটক জীবনীয় পদ্মোৎপলৈরও শতাবরীভিঃ
সিদ্ধং নয়ঃ শর্করয়া বিমিশ্রং সং স্থায়াদ্ গর্ভমুদীশূলং

কেশুর, পানিফল, জীবনায়গণ, পদ্ম, নীলোৎপল, এরেণ্ডার মূল ও শতাবরী এই দ্রব্যগুলি একসঙ্গে গুঁড়ো করে দুধে মিশিয়ে চিনি দিয়ে পাক করে সেবন করলে শূলবেদনা ও গর্ভিণীদের শূলবৎ বেদনাও প্রশমিত হয়।

আমলকী বেটে চন্দনের মত করে নাভির নীচে প্রলেপ দিলে এবং ঠাণ্ডা জলে চার পাঁচ ফোটা রসুনের রস মিশিয়ে খেলে শূল বেদনা উপশম হয়।

মুথা, কুড়চী, আকন্দ, রেড়ী, হরীতকী সমপরিমাণে মিশিয়ে বেটে খেলে শূল বেদনা আরোগ্য হয়।

বাতব্যাধি বিনাশ

ত্রিবর্ষীয়ং সমানীয় দেশিমানঞ্চ পার্বতি
ক্ষতং কৃত্বা ততো লেপাদ গ্রন্থিবাত হরং পরং

—শিবতন্ত্র

শিব বলছেন হে পার্বতি তিন বছরের পুরোনো দেশী মানকচু বেটে বাতগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিলে গেঁটে বাত সেরে যায়।

হরিদ্রা চেক্ষুগুড়শ্চ যুতং শীতপিতাপহং

—প্রয়োগ চিন্তামনি তন্ত্র

কাঁচা হলুদ পিষে আখের গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে আমবাত (শীতপিত্ত) রোগ সেরে যায়।

বচাবাসাপটথানং নিম্বস্য কলিত্বচঃ
কষায়ো মধুনা পীতো বাতহৃদ্বৃংহণঃ পর

—গরুড় তন্ত্র

বচ, বাসক, পলতাপাতা, নিমগাছের ও বহেড়ার ছালের রস (কষায়) মধু দিয়ে

মেড়ে নিয়মিত সেবন করলে ব্যাতব্যাধি বিনাশ হয় ও দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

নিশ্চিন্দার পাতা ও আকন্দ পাতা একত্রে বেটে প্রলেপ দিলে বাত আরোগ্য হয়।.

তিনটে কোয়া রসুন বাটা নিয়মিত খালিপেটে চিবিয়ে খেলে ও রসুন তেল মালিশ করলে বাত সেরে যায়।

নিচিন্দা পাতা ও আধ চামচ আখের গুড় জল দিয়ে সেবন করে বাত উপশম হয়।

গাঁদালের পাতার রস ও একটি কোয়া রসুন মিশিয়ে তিন চারদিন খেলে বাত সেরে যায়।

হংসতক ভাতে সেদ্ধ করে সন্ধক লবণ দিয়ে কিছুদিন খেলে বাত ভাল হয়।

বাতের রোগীকে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে রোগীর মেরুদণ্ডে মুখ দিয়ে মন্ত্র পড়ে বার বার ফুঁ দিয়ে রোগীর পিঠে ঘা মেরে মেরে বাত রোগ সারানো হয়। এই মন্ত্র মিশ্রভাষায় রচিত। বাংলা অনুবাদ এই রকম।

হে নারায়ণ তুমি শোনো এই বাত ব্যথার কাহিনী

শিবঠাকুরের চেলা নন্দী এক সময় কঠিন বাত বেদনায় আক্রান্ত হয়েছিলো

সে খবর পেয়ে স্বয়ং শিব নন্দীর গায়ে ত্রিশূলের ঘা মেরেছিলেন

পার্বতীও ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করেছিলেন

সেই ঘা খেয়ে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই চৌষট্টি রকমের বাত আরোগ্য হয়েছিলো

তারপর থেকে বেতো রোগী নন্দীকে আর কোন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি

কে আমায় আঘাত করার আদেশ দিয়েছে তুমি জানতে চাইছ ?

তবে জেনে রাখো স্বয়ং শিব দুর্গা আমায় এ আদেশ দিয়েছেন

রাতকানা রোগ আরোগ্য

অজস্য কৃষ্ণ মাংসান্তঃ পিপ্পলি মরিচং ক্ষিপেৎ
করায়িত্বা ঘৃতে পাচ্যং ঘটিশান্তে সমুদ্ধারেৎ
মধ্বাজ্য স্তন্য সংপিষ্টং রাত্রান্ধ্যঘ্ন সমঞ্জনং

ছাগলের মেটের (কৃষ্ণ মাংস খণ্ড) ভেতর মরিচ পুরে এক প্রহর গাওয়া ঘিতে পাক করে মধু, ঘি ও স্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে পিষে চোখে কাজলের মত প্রদান করলে রাতকানা রোগ সেরে যায়।

ভূতোন্মাদ রোগ প্রশমন

কৃষ্ণমরিচনিষ্কুখমধু গোপিত্ত নির্মিতং
অঞ্জনং সর্বভূতোন্মাদ বিনাশং

—প্রয়োগ চিন্তামনি তন্ত্র

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধক লবণ মধু ও গোরোচনা এই পঞ্চদ্রব্য সমান ভাগে পিষে কাজল তৈরি করে চোখে দিলে যাবতীয় ভূতোন্মাদ রোগ সেরে যায়।

অর্শরোগ নিরাময়

একটি নতুন মাটির পাত্রে জল রাখতে হবে অর্ধপ্রহরকাল তারপর

এহি এহি ভামিনি ভগমালিনি
দুর্নামনাশিনি নাশয় নাশয় ফট্ স্বাহা

—যোগশাস্ত্র তন্ত্র

এই মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করে সাতদিন পান করলে অর্শরোগ নিরাময় হয়।

বিদ্ধি তচ্ছার্কাসো ঘ্নস্ত তক্রং নবোদ্ধতঞ্চ যৎ

—গরুড় তন্ত্র

নিয়মিত টাটকা ঘোল পান করলে অর্শের উপশম হয়।

হলুদ, গুড় ও সিদ্ধি সমপরিমাণে বেটে মটর দানার মত বটিকা তৈরি করে সকাল দুপুর ও রাত্রে ১টি করে দানা কয়েকদিন সেবন করলে অর্শরোগ নিরাময় হয়।

শুঁঠ, হরিতকী, পিপুল ও ডালিম-এর যে কোন একটি চূর্ণ করে পুরাতন আখের গুড় সহ সকাল সন্ধ্যা গ্রহণে অর্শ সেরে যায়।

একভাগ আফিং, চারভাগ কর্পূর, আটভাগ সাজিক্ষার একত্র পেষণ করে গব্যঘৃত মিশিয়ে নিয়মিত প্রলেপ দিলে অর্শের যন্ত্রণা সেরে যায়।

মূলো ও দাড়িমের রসের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে কয়েক দিন সেবন করলে অর্শ ভাল হয়।

চিরেতা, রক্তচন্দন, জবাসা, নাগর, মোথা প্রতিটি ২ গ্রাম পরিমাণ আধকিলো জলে সিদ্ধ করে সিকি পরিমাণ থাকতে থাকতে নামিয়ে কাপড়ে ছেঁকে মধুর সঙ্গে সেবনে অর্শ রোগ নিরাময় হয়।

এক চামচে পেঁয়াজের রস খালিপেটে সকালে ঠাণ্ডা জল সহ ৭ দিন পান করলে অর্শরোগ ভাল হয়।

একটি কাঁঠালী কলার মধ্যে জ্যান্ত একটা ছারপোকা ঢুকিয়ে দিয়ে সকাল বেলা

ওঁ ভো ভো হুম্ হুম্ ফট্ স্বাহা

এই মন্ত্রে তিনবার অভিষিক্ত করে গিলে খেলে অর্শরোগ নিরাময় হয়। কলা গেলার সময় খুব সাবধানতা নেওয়া দরকার যাতে কলায় দাঁত না স্পর্শ করে।

সে ব্যক্তি জীবনে আর কলা খেতে পারবে না।

কামলা রোগ আরোগ্য

ত্রিফলা গুড় সংযুক্তা গুড়মার্দ্রকসংযুতং
দ্যাজাং প্রভাতে দেবেশি ক্ষণাৎ কামলানাশনং

প্রভাতকালে ত্রিফলাচূর্ণ অথবা আদা, আখের গুড়ের সঙ্গে মেড়ে কয়েকদিন সেবন করলে কামলা রোগ সারে।

শর্করা চ যষ্টিমধু বাসকস্য মধু
এত্য পীতং রক্তপিক্ত কামলা পাণ্ডুরোগলুৎ

মিছরি চূর্ণ, যষ্টিমধু, বাসক পাতার রস ও মধু একত্রে মিশিয়ে খেলে রক্তপিত্ত ও কামলা রোগ আরোগ্য হয়।

পুঁইশাক সেদ্ধ করে দিন কয়েক ভাতের সঙ্গে চটকে সেবন করলে কামলা রোগের বিনাশ হয়।

দন্তরোগ

উদ্ধদন্ত স্থিরকৃৎ কার্য বকুল-চর্বণং

বকুলের ছাল চিবিয়ে খেলে নড়বড়ে যন্ত্রণাদায়ক দাঁত শক্ত ও মজবুত হয়। আকন্দ, কণ্টিকারী, তলতা বাঁশের পাতা, নারকেল গাছের শেকড় একসঙ্গে বেটে খেলে ও দাঁতে প্রলেপ দিলে দাঁতের রক্তপড়া ও অন্যান্য রোগ নিরাময় হয়।

বকুল গাছের ছাল কিংবা পেয়ারা পাতা জলে সেদ্ধ করে সিকিভাগ থাকতে থাকতে নামিয়ে কুলকুচা করলে দাঁতের যন্ত্রণা সেরে যায়। অকালে দাঁত নড়লে শিরীষ গাছের মূলের ছাল কিংবা বকুল বীজের শাঁস গুঁড়ো গুঁড়ো করে দাঁত মাজলে নড়া দাঁত শক্ত হয় ও দাঁত পড়ে না।

কচি আম পাতা চিবিয়ে কয়েকদিন খেলে দাঁত নড়া বন্ধ হয় ও দাঁত পড়ে না।

হরিতকীর গুঁড়োর সঙ্গে করবী গাছের আঠা মিশিয়ে শুকিয়ে সেই মাজন দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের মাড়ির পূঁজ পড়া বন্ধ হয়।

কর্ণরোগ নিরাময়

মূষলীবাশুজী চূর্ণং খাদেদ্বাধির্ব শান্তয়ে

তালমূলী ও সোমরাজচূর্ণ নিয়মিত খেলে বধিরতা রোগ দূর হয়। তুলসী, আকন্দ, অপামার্গ ইত্যাদি পাতার রস কানে দিলে কানের যন্ত্রণা ও পূঁজ পড়া বন্ধ হয়।

পেঁয়াজের রস গরম করে কানে দিলে অথবা নিশ্চিন্দা পাতার রস সর্ষের তেলের সঙ্গে ফুটিয়ে অথবা পানের রস কানে দিলেও নানারকম কানের রোগের উপশম হয়।

চোখের ছানি বিনাশ

শম্বুকং বা বরাটক্যা দগ্ধং শুষ্কং বিচূর্ণিতং
অনুওয়েন্নবনীতেন হস্তি পুষ্পং চিরন্তনং

শামুক অথবা কড়িভস্ম চূর্ণ করে মাখনের সঙ্গে মিশিয়ে চোখে কাজলের মতো প্রলেপ দিলে চোখের ছানি রোগ সেরে যায়।

যকৃৎ, প্লীহা ও উদরের রোগ আরোগ্য

প্লীহা ও উদরের নানারকম রোগে—রোগীর পেটের ওপর একটা পান রেখে পানটি আট পর্দা কাপড় দিয়ে ঢেকে একটি বাঁশের চটা রাখতে হবে। তারপর চকমকির আগুনে একটি কুলকাঠের লাঠি গরম করে বাঁশের চটার ওপর রেখে "দোষো হনুমন্ত ফলফলতি ধগধগিত আয়ুরাষরূঢ়াহেতি" (মন্ত্রমহোদধি তন্ত্র)। এই মন্ত্র পাঠ করলে প্লীহা ও উদরের বহুরোগ ভাল হয়।

পুলঞ্চ, শিমূল, আকন্দ, শালিঞ্চে, ঘৃতকুমারী, গিমেশাক প্রভৃতি বেটে খেলে প্লীহা রোগ নির্মূল হয়।

ঘৃতকুমারী, গুলঞ্চ, চিরেতা, গিমেশাক, শেফালিকা, বেতোশাক ও কালমেঘ ইত্যাদির রস যকৃৎ রোগে হিতকর।

থানকুনি, ইসবগুল, কুড়চি, মুথাগাব, আমড়া গাছের ছাল, বট গাছের পাতা ইত্যাদির রসে আমাশয় রোগ বিনাশ হয়। জামপাতা, দূর্বা ঘাস বেটে সেই রস কাঁচা দুধ মিশিয়ে কয়েকদিন সেবন করলে আমাশয় রোগ নিরাময় হয়।

তেঁতুলপাতা কম জলে সেদ্ধ করে চটকে ছেঁকে নিয়ে সেই জলে জিরে ফোড়ন দিয়ে ২।৩ দিন সেবন করলে আমাশয় ভাল হয়। তেলাকুচো পাতার রস মিছরি দিয়ে জলে মিশিয়ে (সেই জলে লোহা গরম করে ডুবিয়ে) সেবন করলে রক্ত আমাশা ভাল হয়। আমলকী বাটা নাভির নীচে প্রলেপ দিলে ও ঠাণ্ডা জলে কয়েক ফোঁটা রসুনের রস মিশিয়ে খেলে আমাশা সেরে যায়।

জলের মত দাস্ত হলে কাঁচকলা সেদ্ধ জলে কর্পূরের রস মিশিয়ে পান করলে পায়খানা বন্ধ হয়। পেটে বায়ু থাকলে এলাচি গুঁড়ো করে খেলে উপকার হয়।

পাথরকুচি পাতার রস নুন দিয়ে অথবা গাঁদাল পাতার রস অথবা ডালিমের খোসা গুঁড়ো করে মধু দিয়ে মেড়ে খেলে পাতলা পায়খানা বন্ধ হয়।

অজীর্ণরোগ

বতোপিত্তর্ক্ষিতা যেন পীতো মহোদধিঃ
যন্ময়া খাদিতং তং তস্মোহসস্ত্যদরিষ্যতি

দুবেলা আহারের পর আচমনান্তে পেটে হাত বুলিয়ে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করলে ভুক্ত খাদ্যবস্তু সহজেই হজম হয়ে যায়। নিয়মিত এই প্রক্রিয়া ও মন্ত্রপাঠ অজীর্ণ রোগ প্রতিষেধক।

শুঁঠ ও কলমি শাকের রস গাওয়া ঘি মিশিয়ে অথবা, পিপুল, হর্তুকী, বীট লবণ

সম পরিমাণে গুঁড়ো করে মিশিয়ে গরম জলের সঙ্গে সেবন করলে অথবা যব সেদ্ধ করা জলের সঙ্গে পাতি লেবুর রস ও সৈন্ধব নুন মিশিয়ে পান করলে অজীর্ণ রোগ প্রশমিত হয়।

পিপুল, বচ, হিং, জোয়ান, চূণ ইত্যাদি অজীর্ণ রোগ নাশক। হর্তুকীর ছাল চূর্ণ, পিপুল, চিতা, সৈন্ধক লবণ একত্রে চূর্ণ করে পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে এক চা চামচ মাত্রা জলের সঙ্গে সেবনে অজীর্ণ রোগ ভাল হয়।

অম্লরোগ প্রতিকার

বীটলবণ, নারিকেল ভাল করে বেটে নিয়ে চুনের জলের সঙ্গে মিশিয়ে আহারের পর নিয়মিত পান করলে অম্লরোগ সেরে যায়।

কচি এরণ্ডার (রেড়ি) পাতা সিদ্ধ করে সেই জল সেবনে অম্লশূল বিদূরিত হয়।

ছাঁচিপান, হর্তুকী, সৈন্ধব লবণ, চুন, জোয়ান, বীটলবণ, সর্ষে একত্রে মিশিয়ে ভাল করে বেটে খেলে অম্লরোগ ভাল হয়।

ক্রিমিরোগ

নিমপাতা গুঁড়ো করে জলের সঙ্গে অথবা কালমেঘ পাতা চিবিয়ে (সকালবেলা খালিপেটে) কয়েকদিন খেলে ক্রিমি বিনাশিত্ত হয়।

১ কোয়া রসুন ১৫ ফোঁটা কাচা হলুদের রস, ১ চামচ বাসক পাতার রস, ডালিম ছালের সঙ্গে চুনের জলে মিশিয়ে খেলে ক্রিমি রোগ উপশম হয়।

সকাল বেলা খালিপেটে নিয়মিত চুনের জল সেবনেও ক্রিমি নাশ হয়।

আনারসের রস নুন দিয়ে খেলে ক্রিমি সেরে যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা

এক চামচ পেঁয়াজের রস ইষদুষ্ণ জলে মিশিয়ে অথবা দু তিন দিন অন্তর এরেণ্ডার বীজ দিয়ে সুক্তো রান্না করে অথবা চালকুমড়োর রস গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে দাস্ত পরিষ্কার হয়।

আমলকী, হরিতকী ও বহেড়া (ত্রিফলা) চূর্ণ করে পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে রাত্রে ভিজিয়ে ভোরবেলা সেই জল পান করলে পায়খানা পরিষ্কার হয়।

সোনাপাতা জলে সেদ্ধ করে অথবা ইসবগুল বা ইসবগুলের ভুষি ভিজিয়ে সেই জল পান করলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়।

কিসমিস ভেজানো জল নিয়মিত পান করলে পেট পরিষ্কার ও সেই সঙ্গে ক্ষুধা ও হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় ও দেহ বলশালী হয়।

শিরঃপীড়া ও মাথাধরা

পবন নন্দন বীর হনুমান লঙ্কাপুরে গিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধান। লঙ্কাপুরে বসি হনুর মাথা নড়ে যক্ষ রক্ষ তারে দেখি পলাইল দূরে। অশোক কাননে সীতা ছিলেন বন্দিনী হনুরে দেখিয়া হরষিত তিনি। কি হইয়াছে বল হনু কেন মাথা নড়ে। হনু বলে জননীগো শিরঃপীড়া করে। কি উপায়ে জননী গো পাইব নিস্তার। শিরঃপীড়ার যাতনা সহে না যে আর। রাম কথা শুনি মাতার বিষাদ ঘুচল। হনুর মাথাব্যথা তাহে পলাইল। এই কথা যেইজন শোনে তিনবার। শিরঃপীড়া সেইক্ষণে ছাড়ি যায় তার। যারে মাথাব্যথা অমুকের শির ছাড়িয়া সাত সমুদ্রে ডুবে। তুই মড়ার মাথা খা। নাই আর অমুকের শিরঃপীড়া নাই। হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা পাই।

যার মাথা ধরেছে এই ঝাড়ন মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে তিনবার পাঠ করে 'অমুক'-এর স্থলে তার নাম উল্লেখ করে মাথায় তিনবার ফুঁ দিলে শিরঃপীড়া সেরে যায়।

পেঁয়াজ বা রসুন ছেঁচে খুব জোরে কয়েকবার ঘ্রাণ নিলে মাথাধরা সারে।

সৈন্ধব লবণ গুঁড়িয়ে পুঁটলিতে বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে সেই জল কপালে ঘষলে মাথাধরা ভাল হয়।

পুরোনো আখের গুড় কর্পূর মিশিয়ে সেবন করলে মাথাধরা ও আধকপালী রোগ ভাল হয়।

ঘি, কর্পূর, পেঁয়াজ, রসুনের রস একত্রে মিশিয়ে একটা পানেব পাতায় রেখে মাথায় বেঁধে রাখলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

ফিক্ ব্যথার ঝাড়ন মন্ত্র

নন্দন বন কি চন্দন কাঠার খাং খাঙ্গরা খাঙ্গার
সাতশ দুরুয়া গড়কে কোই হু হু ব্যাথা কাটে কাটোই
হাত কাটে পা কাটে কটকটি ব্যাথা কাটে
কাটকুটকে করিষ্যো পার সাত সুমুদ্দুর লঙ্কা ধার
কার আজ্ঞে—ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞে
গুরুকো শক্তি কর পুকার ফিক্ বেদনা ছারখার

ফিক ব্যথাগ্রস্ত রোগীকে এই মন্ত্রে সাতবার ঝাড়লে ফিক বেদনার উপশম হয়। প্রতিবার পাঠের সময় 'বেদনা' স্থলে ফুঁ দিতে হবে।

স্মৃতিশক্তি হ্রাস

ব্রাহ্মী শাক, শতমুখি ও ডালিমের রস একত্রে বেটে মধু দিয়ে মেড়ে খেলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগ নিবারণ

মসী তু গজদন্তস্য ছাগী দুগ্ধং রসাঞ্জনং
বটপ্ররোহার্ক ঘৃষ্ট ইন্দ্রলুপ্তঘ্নমৌষধং

হাতির দাঁত ভস্ম ও রসাঞ্জন, ছাগলের দুধের সঙ্গে পিষে প্রলেপ দিলে (বেশ কিছুকাল) অথবা বটের কুঁড়ির আরক ঘষলে টাকে চুল গজায়।

পেঁয়াজ, রসুন, কমলালেবুর খোসা, কেশুত পাতা, আমলকী, মহাভৃঙ্গরাজ ও কুমড়ো একত্রে বেটে খাঁটি নারকেল তেলে গুলে সে তেল নিয়মিত মাথায় মাখলে ঘন কালো সুন্দর চুল হয় ও চুলপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

অনিদ্রারোগ প্রতিকার

ব্রাহ্মী শাক, থানকুনি শাক, সুশনি শাক, সর্বলঙ্কার শেকড় ইত্যাদি অনিদ্রা রোগে কাজ দেয়।

উন্মাদরোগ চিকিৎসা

অপক্কচটকক্ষীর পানাসুন্মাদনাশনং

---প্রয়োগচিন্তামণিতন্ত্র

চড়াই পাখির কাঁচা মাংস দুগ্ধ সঙ্গে পিষে খেলে উন্মাদ রোগ আরোগ্য হয়।

সর্বরোগহর মন্ত্র

ওঁ ক্রীং ক্ষং সং মং সঃ সঃ হং স

এই মন্ত্রে একশো আটবার গাওয়া ঘি অভিমন্ত্রিত করে শিশিতে রেখে দিতে হবে। ঐ মন্ত্রপূত গব্যঘৃত একমাস মধুর সঙ্গে ৮ তোলা পরিমাণ সেবন করলে যাবতীয় রোগ ব্যাধির বিনাশ হয়।

অধ্যাত্ম মনঃচিকিৎসা

এটি ধন্বন্তরী বাবার কাছে শেখা নয়। এই পদ্ধতিটি মোটামুটি আমারই উদ্ভাবিত।

এই পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটিয়ে তার ঈশ্বরমুখী চেতনা সঠিক খাতে প্রবাহিত করে সুপ্ত মানসিক ক্ষমতা বা সাইকিক পাওয়ার জাগরণ ও সেই শক্তির জোরেই মনোরোগ সমূহের বিনাশের একটা প্রয়াস।

এই প্রক্রিয়া অথর্ববেদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী, পাতঞ্জল যোগসূত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র নির্ভর ভাষ্য ও ক্রিয়াকলাপ একত্রিত করে গ্রথিত হয়েছে।

আমাদের 'নিউরো-সাইকো-ফিলসফিক্যাল সোসাইটি'তে অধ্যাত্ম মনঃচিকিৎসায় বহু ব্যক্তি উপকৃত হচ্ছেন ও দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

পঞ্চ 'ম'কার সাধন

তান্ত্রিকাচার্যের প্রসঙ্গে 'চিকন কালোরূপা সুন্দরী' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি; সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কালীর বিষয়ে ওঁর কাছে যা জেনেছিলাম ঐ অধ্যায়ে লিখেছি। এখানে তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে উনি যে রকম বলেছিলেন, মোটামুটি ওঁর ভাষা অবিকৃত রেখে উল্লেখ করছি।

"মথিতা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগম মহার্ণব" শিব বেদ ও আগম এই দুই মহাসমুদ্র জ্ঞানদণ্ডেব দ্বারা মন্থন করে সর্ব যোগ শ্রেষ্ঠ তন্ত্রসাধনার সৃষ্টি করেছেন। এটি কুলাণব তন্ত্রের কথা।

তন্ত্রসাধনা বিশেষতঃ তান্ত্রিক সম্পর্কে জনমানসে একটা বিরূপ মনোভাব আছে, তান্ত্রিকেরা দুশ্চরিত্র, ভোগী এবং ওরা ক্ষতিকারক, জনগণের মধ্যে এই ভাবটা এনেছে কিছু লম্পট ও ভণ্ড যারা সাধকের বেশ ধরে ভড়ংবাজি দেখায়। শুনলাম তারাপীঠের একজন তান্ত্রিক এখন ফিল্মমেকার হয়েছে। সে নাকি টালিগঞ্জের একটা স্টুডিওতে ঘর নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে তান্ত্রিকের ভেক ধরেই।

তন্ত্রের উদ্গাতা স্বয়ং শিব। যিনি নিজকণ্ঠে বিষ ধারণ করে বিশ্ববাসীকে অমৃত দান করেছেন, তিনি মানব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কোন বিধান দিতে পারেন না।

শিব যোগী ও সাধকদের কল্যাণের জন্য কলিযুগের পক্ষে একমাত্র উপযোগী প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি মার্গে উত্তরণের যে পদ্ধতির প্রচলন করেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত।

তন্ত্র সাধনার মূল লক্ষ্য অমৃতত্ব। ভিন্নার্থে ব্রহ্মসাজুয্য বা জ্ঞানমুক্তি। এ কোন অলীক কল্পনাবিলাস নয়। স্বর্গসুখ বা নশ্বর দেহকে চিরস্থায়ী করে রাখার কোন অলৌকিক প্রচেষ্টাও নয়। সঠিক নিয়মে তন্ত্রসাধনা মানুষের দেহ ও মনকে দুর্লভ অবস্থায় নিয়ে যেতে সক্ষম। দুঃখ, কষ্ট, পাপবোধ, অতৃপ্তি, অভাবব্যথা ইত্যাদির উর্ধ্বে পরম শান্তি ও চির আনন্দময় অনির্বচনীয় এক জগতে স্থিতিশীলতা ও নিরোগ দেহ মন এবং সুদীর্ঘ জীবনকে আত্মা তথা পরম সত্তার সঙ্গে মহামিলনের এক সার্থক প্রয়াস। এই মিলনকেই ভিন্নার্থে বলা হয়েছে চিরসঙ্গম সুখ।

এ সম্পর্কে আমার লেখা একটি কবিতার দুটি পংক্তি ঃ

অতৃপ্তি অভাব ব্যথা ইথারের মত বাষ্পীভূত
নিশ্চিদ্র অপার শান্তি কোটী রোমকূপে শিহরণ...

শিব তিনি লৌকিক বা অলৌকিক যাই হোন না কেন, শারীরবৃত্ত তথা মনস্তত্ত্ব এবং আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির উপর তাঁর প্রচণ্ড দখল ও প্রভাব ছিল একথা অনস্বীকার্য।

দুর্গার অনুপ্রেরণায় তন্ত্র সৃষ্টি করেছেন শিব কিন্তু তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী। কালীর সৃষ্টি দুর্গা থেকেই।

প্রধানাংশস্বরূপা সা কালী কমলালোচনা
দুর্গাললাটসম্ভূতা রণে শুম্ভনিশুম্ভয়ো
—দেবীভাগবতম্

প্রকৃতির প্রধান অংশস্বরূপিণী কমলনয়না কালী, দুর্গার ললাট হতেই শুম্ভনিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধকালে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। সচরাচর পূজিত কালীমূর্তি তান্ত্রিকপ্রবর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কল্পনা করেছেন।

তন্ত্র বেদসম্মত পদ্ধতি, শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঃ

দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্

যেমন দেবীসমূহের মধ্যে দুর্গা, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ তেমনি যাবতীয় শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ।

দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত, এবং যাঁর অনুরোধে শিব তন্ত্রসাধনা দিয়েছেন কলিযুগের অন্নগত প্রাণ স্বল্পায়ু মানুষদের মঙ্গলের জন্য, সেই মহামায়া দুর্গা যার শ্রোতা এবং যা ভগবান বাসুদেব কর্তৃক স্বীকৃত তা আগম ও দেবীশ্রেষ্ঠা পার্বতীর শ্রীমুখের বাণী যেটি শ্রবণ করেছেন শিব এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন বাসুদেব তা আগম নামে প্রসিদ্ধ। অবশ্য সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রকে আগম, নিগম ও যামল এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যামল শব্দের অর্থ শিবদুর্গার মিলন। মূল তন্ত্র চৌষট্টিটি যেমন নীলতন্ত্রম্, কালীতন্ত্রম্, কুমারীতন্ত্রম্ ইত্যাদি। এ ছাড়াও বামকেশরতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র, দেবীতন্ত্র ইত্যাদি বহু উপতন্ত্র আছে। মূল তন্ত্রশাস্ত্রের শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ পঁচিশ হাজার। মূল তন্ত্রশাস্ত্রের সংক্ষেপ করেছেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (তন্ত্রসার)।

তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে উদ্ভিদ জন্ম থেকে শুরু করে বহু জন্মান্তরের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজন্ম লাভ করা সম্ভব। এই মানবদেহকে আশ্রয় করেই তন্ত্রসাধনায় দেহাতীত লোকে যাওয়া যায়। এই দেহেই আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ ও মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। তন্ত্রে সেইজন্য মানবজন্মকে মোক্ষের সোপান হিসবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তন্ত্রে মানবদেহের গৌরব বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পুরুষার্থ লাভ করতে গেলে মানবদেহ ছাড়া গতি নেই। কিন্তু মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে তা ভুলে যায় ; সে তখন মায়াকবলিত। জীবদেহ ত্রিবিধ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহেরই আবরণ। দেহান্তরের পর মানুষ স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে। সূক্ষ্মদেহ মোক্ষলাভ অবধি স্থায়ী হয়। তবে স্থূল দেহ ত্যাগেব পর মানুষ আবার অন্য স্থূল দেহ কিংবা সূক্ষ্ম দেহ ধরবে এর কোন নিশ্চয়তা তন্ত্র দেয়নি। সুতরাং জন্মজন্মান্তর নয় এক জন্মেই সাধনা সিদ্ধির সহজতম উপায়, অর্থাৎ দেহরূপকে আশ্রয় করে দেহাতীত অরূপ রতন লাভের পদ্ধতি প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি অর্থাৎ ভোগ থেকে ত্যাগ—সম্ভোগ থেকে সমাধি, উদ্ভাবিত

হয়েছে শিবোক্ত তন্ত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তন্ত্র শব্দটি এসেছে তন্ ধাতু থেকে যার অর্থ তনু অর্থাৎ শরীর। যে প্রক্রিয়ায় শরীরের ত্রাণ হয় তাই তন্ত্র।

পুরুষ ও প্রকৃতি (নারী) অর্থাৎ শিব ও শক্তির সাধনাই তন্ত্র। আবার এই প্রকৃতিও স্বয়ং শিব, সুতরাং তন্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুই ভাবেই সাধন।

তন্ত্র নির্দেশিত পঞ্চমকার সাধনে বাহ্যিক ও আন্তরিক দুটি স্তর আছে। যতক্ষণ বাহ্যিক পঞ্চ 'ম'-কার প্রকট অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গ তখন দ্বৈতভাব এবং যখন বাহ্যিক স্তর পেরিয়ে আন্তরিক পঞ্চ 'ম'-কারে প্রবেশ তখন অদ্বৈত ভাব ও নিবৃত্তি মার্গ। প্রবৃত্তি মার্গকে দক্ষিণাচার ও নিবৃত্তি মার্গকে বামাচার সাধনও বলা হয়। "মদ্যং মাংসং তথা মৎস্য মুদ্রা মৈথুননেব চ" মদ্য, মাংস, মৎস, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ 'ম'-কার।

বাহ্যিক ভাবে এদের স্বরূপ।

মদ্য—গৌড়ী (গুড় থেকে প্রস্তুত খাদ্য), পৈষ্টী (পিষ্টক থেকে যে মদ্য তৈরি) ও মাধ্বী (মধু থেকে যে মদ্য প্রস্তুত)—এই তিন জাতের সুরাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এই জাতীয় মদ তাল, খেজুর ও অন্যান্য রসদ্রব্যে আপ্লুত। দেশ ও দ্রব্য অনুযায়ী বহু ধরনের সুরা হতে পারে। দেবীঅর্চনার ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সুরাই প্রশস্ত। এই সুরা যে ভাবেই প্রস্তুত হোক, যে লোক দ্বারা বাহিতই হোক না কেন, তাকে শোধিত করলে কার্যসিদ্ধি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মদ্য শোধন করলে 'কারণ'-এ পরিণত হয়। সেই কারণই তন্ত্র সাধনায় নিবেদন ও সেবন করা হয়। মদ্যর বিকল্প নারিকেলের জল বা দুধ। আদ্যতন্ত্রের লক্ষণ স্বরূপ বলা হয়েছে এই মদ্য (কারণ) মহৌষধি স্বরূপ। কারণ সেবন করে জীবগণ যাবতীয় দুঃখ কষ্ট ভুলে যায় ও তাদের আনন্দ বৃদ্ধি হয়। তবে মদ্য ঠিকমত শোধন না হলে তার থেকে মোহ ও ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। মদ্যপানের সময় মনের মধ্যে যে ভাব জাগরিত থাকে তাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও উচ্ছ্বসিত হয়। মদ্যপানে মনঃসংযম বাড়ে ও সাধনার সুবিধা হয়।

আরাধ্য দেবদেবীর ধ্যানে একাগ্রতা আনার উদ্দেশ্যে ধ্যান রূপের আগে মদ্যপান সেবন কর্তব্য। ফুর্তি, মজার জন্য পান করলে মানুষ নরকে যায়। এমন মাত্রায় কারণ সেবন করতে হবে যাতে দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয়। সেই মদ্য সাধকের কুণ্ডলিনীর মুখে পতিত হলে তিনি উদ্বোধিত হন তবে আগে তাকে মন্ত্রপূত করে নিতে হয়। কুণ্ডলিনীকে জাগ্রতর করার জন্য সুষুম্না পথে এ কারণ ঢালতে হবে। এই কার্য 'যোনিমুদ্রা' অবলম্বন করে করতে হবে।

মাংস—জলচর, ভূচর ও খেচর এই তিন ধরনের প্রাণীরই মাংস তন্ত্রে নিবেদন করা যেতে পারে। যে প্রাণীর মাংস যে সাধকের কাছে তৃপ্তিদায়ক, সাধক সেই মাংসই ইষ্ট দেবীকে উৎসর্গ করবে। পুরুষ পশু বলি দেওয়া কর্তব্য, স্ত্রী পশু বলিদান নিষেধ। মাংসের বিকল্প নুন, আদা, তিল, যব বা পেঁয়াজ। এই পঞ্চদ্রব্যের মিশ্রণও মাংস।

মৎস্য—শাল, বোয়াল ও রুই (রোহিত) এই তিন জাতের মাছকে তন্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া যে সমস্ত মাছ কাঁটাবিহীন (চিংড়ি মাছ ছাড়া) সেগুলি মধ্যম

ও কাঁটাযুক্ত মাছ অধম। তবে শেষোক্ত শ্রেণীর মাছ যদি খুব ভালভাবে ভাজা হয় (খাঁটি সরষের তেলে) তবেই তা দেবীকে উৎসর্গ করা চলে। মৎস্যের বিকল্প বেগুন, মূলা বা পানিফল। মৎস জলজ, জীবশক্তি ও সুখবৃদ্ধি কারক।

মুদ্রা—চন্দ্রের মত শুভ্র শালি ধান বা যব-গোধুম দ্বারা তৈরি ঘৃতপক্ক ও সুস্বাদু এইরকম মুদ্রা উত্তম পদবাচ্য। যেগুলি খৈ-মুড়কি (ভৃষ্ট ধান্য) থেকে উৎপন্ন সেগুলি মধ্যম ও যা অন্য শস্য ভর্জিত সেগুলি অধম।

এই ততত্ত্ব সহজলভ্য ও ভূমিজাত। মুদ্রা জীবের জীরন ও আয়ুস্বরূপ। মুদ্রার বিকল্প বিশেষ ভঙ্গিতে (মুদ্রায়) পুষ্পাঞ্জলি।

মৈথুন—

মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্
অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষততত্ত্বস্য লক্ষণম্

এই শেষ (পঞ্চম) ততত্ত্ব মহাআনন্দদায়ক, প্রাণ সৃষ্টির কারণ স্বরূপ এবং আদি ও অন্তহীন জগতের মূল। মৈথুনের বিকল্প গন্ধপুষ্পের মালা। তন্ত্রোক্ত সাধনায় সাধক নারীর সঙ্গে সহবাসে ও ক্রমাগত নারীর চিন্তা ও ধ্যানে মহাযোগীতে পরিণত হতে পারে।

পঞ্চাচারেণ দেবেশি কুলশক্তিং প্রপূজয়েৎ
নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা
ব্রাহ্মনী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালক কণ্যা
মালাকারস্য কণ্যা চ নবকণ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা

—গুপ্ত সাধনতন্ত্র

নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতিনী, ব্রাহ্মণী, শূদ্র, গোপ ও মালাকার কন্যা—এদের নবকন্যা বলে।

মৈথুন তত্ত্বে ভৈরবী সাধনে এই নয় প্রকার কন্যা উৎকৃষ্ট। এ ছাড়াও,

বিশেষবৈদগ্ধযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ
রূপযৌবন সম্পন্না শীলসৌভাগ্যশালিনী

বিশেষতঃ যারা প্রভৃত গুণবতী এইরকম সর্বশ্রেণীর রূপবতী, যুবতী, সুশীলা সৌভাগ্যশালিনী কন্যাও কুলাঙ্গনা হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে বলছেন, "ঐ সমস্ত মেয়েদের যত্ন সহকারে পূর্জাচনা করলে সাধকের নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হবে। হে দেবি, আমার এই কথা সত্য বলে জানবে, কোন রকম সংশয় করবে না।"

তন্ত্রসাধক স্বীয় বা পরশক্তি (স্ত্রী, কন্যা) দীক্ষিতা নবযৌবনপ্রাপ্তা বহু গুণেব অধিকারিণী, রূপবতী, ঘৃণালজ্জাবিবর্জিতা মেয়েকে নিজ সজ্জায় (আসন) এনে পাদ্যাদি নানারকম উপহার প্রদান করে ভক্তিভরে অর্চনা করবে।

এইভাবে, পঞ্চাকার চক্রে সেই শক্তিকে নির্দিষ্ট আচারে, পূজা ও অর্চনা করে সেই কন্যার মস্তকে, কপালে, সিঁথিতে (সিঁন্দুর মণ্ডল), মুখে, কণ্ঠে ও হৃদয়ে শতবার, স্তনদ্বয়ে দ্বিশতবার, নাভিতে শতবার ইষ্ট দেবী মন্ত্র জপ করবে। তারপর সাধক অত্যন্ত

একাগ্রচিত্ত হয়ে তার যোনিপীঠে শতবার ইষ্ট মন্ত্র জপ করবে (যোনিপীঠে শতং জপ্তা স্থিরমানসঃ—গুপ্তসাধন তন্ত্র)। অতঃপর নিজের ও ভৈরবীর (কন্যা) মুখে সুগন্ধী তাম্বুল (পান) দিয়ে সেই নারীর (শক্তি) অনুগ্রহ নিয়ে মূলগ্রন্থের লিখিত বিধি অবলম্বন করে শাস্ত্রমতে সাধনা করবে।

যোগীশ্রেষ্ঠ শিব-ক্রোড়ে যেমন দুর্গা তেমনি তান্ত্রিক সাধকের কোলে পঞ্চমকার তত্ত্ব। তন্ত্রসাধক নিজেকে শিব ও কন্যাকে (ভৈরবী) দুর্গা কল্পনা করবে।

অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়ং বৈষ্ণবা মতাঃ
নানাবেশধরাঃ তান্ত্রিক বিচরন্তি মহীতলে
—কালিতন্ত্র

অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভাস্থলে বৈষ্ণব এই রকম বহু বেশধারী তান্ত্রিক পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

তন্ত্রসাধক তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী দিব্য, বীর ও পশু এর মধ্যে যে কোন একটা ভাবে (মানসিক ধর্ম) সাধনা করবে। সত্ত্বগুণী সাধকদের জন্য দিব্যভাব। রজোগুণী সাধকদের জন্য বীরভাব ও তমোগুণী সাধকদের জন্য পশুভাব। শাস্ত্রমতে প্রথমে পশুভাব থেকে শুরু করে সাধন বলে ক্রমশঃ বীরভাব ও তারপর দিব্যভাবে উন্নীত হতে হবে এবং সেই ভাবেই পঞ্চমকার সাধনায় পরমতত্ত্বে লীন হওয়া সম্ভব।

যথা জলং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরি
তথৈব তত্তত্ত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি
—গুপ্তসাধন তন্ত্র

জল যেমন জলেতে লয় পায়, হে পরমেশ্বরি, ঠিক তেমনই পঞ্চতত্ত্বে সাধক পরমাত্মায় বিলীন হয়।

বাহ্যিক পঞ্চমকার (প্রবৃত্তি)-এ সাধনের পর সাধককে আন্তরিক পঞ্চমকার (নিবৃত্তি)-এ আসতে হবে। আন্তরিক পঞ্চমকার বুঝতে গেলে 'ষট্‌চক্র' সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার

গুদস্য পৃষ্ঠভাগেহস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভৃৎ
দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধিন পর্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে
—উত্তর গীতা

দেহের পিছন দিকে মূলাধার থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত বীণাদণ্ডের মতো যে একখানি দীর্ঘ অস্থির অবস্থান তাকে মেরুদণ্ড বলে। শাস্ত্রমতে একে ব্রহ্মদণ্ডও বলা হয়।

সেই মেরুদণ্ডের নিম্ন থেকে উর্ধ্ব পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ছয়টি পদ্মের (চক্র) অবস্থান। যোগশাস্ত্রে এইরকম কল্পনা করা হয়।

মেরুদণ্ডের একেবারে নীচে ত্রিকোণাকৃতি স্থানে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে (শ্বেত সর্প) নিজ মুখ ও লাঙ্গুল একত্রিত করে বামাবর্তে সাড়ে তিন পাক বেষ্টনে সুষুম্নাদ্বার রুদ্ধ করে তমসায় নিদ্রিতা (সুষুম্না একটি ফাঁপা নাড়ি, মূলাধার থেকে মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ডান দিকে পিঙ্গলা ও বাম দিকে ইড়া নাড়ি। যোগশাস্ত্রে ইড়াকে

গঙ্গা, পিঙ্গলাকে যমুনা ও সুষুম্নাকে সরস্বতী আখ্যা দেওয়া হয়েছে)।

মূলাধার—মূলাধার পদ্ম গুহ্যদেশের নিকট অবস্থিত। এখানে পৃথিবী চতুষ্কোণ চক্র আছে। এই পদ্মে ডাকিনী নাম্নী দেবী বিরাজ করছেন ও স্বয়ম্ভু লিঙ্গ শিব রয়েছেন।

স্বাধিস্থান—এই চক্রের (পদ্ম) অবস্থান লিঙ্গমূলে। এখানে জলের আধিক্য বেশি। এই চক্রে রাকিনী দেবী (শক্তি) বিরাজ করছেন ও বৃদ্ধরূপী রুদ্রমূর্তি শিব আছেন।

মণিপুর—নাভিকুণ্ডে মণিপুর পদ্মে লাকিনী দেবী রয়েছেন ও এখানে ঈশ শিব অবস্থিত।

অনাহত—হৃদয়ে অনাহত পদ্ম। এই চক্রে কাকিনী দেবী ও বাণ লিঙ্গ শিবের অবস্থান।

বিশুদ্ধী (বিশুদ্ধ)—কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধী চক্রে শাকিনী দেবী ও শুদ্ধ শিব অবস্থিত।

আজ্ঞা—ভ্রূ-যুগলের মধ্যে আজ্ঞা চক্র। এখানে হাকিনী দেবী ও ইতর শিব বিরাজ করছেন।

সহস্রার (সহস্রদল পদ্ম)—এই পদ্মের অবস্থান মস্তিষ্কে। এখানে যাকিনী দেবী ও জ্যোতির্লিঙ্গ শিব অবস্থিত। আগেই বলেছি কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে তমসায় নিদ্রিতা আছেন। এই কুণ্ডলিনী দেবী ঃ

সহস্রাবদনাং নিত্যাং ক্ষীণমধ্যাং শিবাম গুরুম্
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাম্
রক্তকঙ্কণ পাণিঞ্চ রত্ননূপুরশোভিতাম্
শরদিন্দুপ্রতীকাশবক্ত্রোদ্ভাসিত কুণ্ডলাম্
স্বনাথ বামভাগস্থং বরাভয়করাম্বুজাম্

এই দেবী সহস্রাবদনা ও নিত্যা (উৎপত্তি বা বিনাশ নেই)। ইনি শিবশক্তি স্বরূপিণী। এঁর ক্ষীণ কটিদেশ, পদ্মরাগ মণির মত দেহকান্তি, রক্তবস্ত্র পরিধান শোভিতা। দুই করে রত্নকঙ্কন ও চরণ যুগলে রত্নখচিত নূপুর। ইনি নিজ নাথের বাম পার্শ্বে অবস্থিতা থেকে দু হাতে বর ও অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করছেন।

এই রকম ধ্যানের দ্বারা কুণ্ডলিনী দেবীকে রজোগুণের আলোয় সত্ত্বগুণে বোধন করলে উনি জাগরিতা হবেন ও ক্রমশঃ এক একটি পদ্ম (ভেদ) করে মূলাধার থেকে সহস্রারে পরম শিবের সঙ্গে মিলিত এবং সেই সাধনার ফলে ষড় রিপু ও অষ্টপাশ যুক্ত বদ্ধ জীব রিপু ও পাশমুক্ত হয়ে পরমাত্মায় বিলীন হবেন।

এইব্যর আন্তরিক পঞ্চমকার প্রসঙ্গে আসা যাক,

সোমধারা ক্ষয়েদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ

কুলকুন্ডলিণী দেবী (শক্তি) জাগরিত হয়ে ষট্‌চক্র ভেদ করে করে মস্তিষ্কের মণিকর্ণিকায় পরম শিবের সঙ্গে মিলিত হলে সহস্রদল পদ্ম থেকে অমৃতধারা ক্ষরিত হবে। সেই সোমরসই মদ্য। এই ধারা যিনি পান করেন তিনিই মদ্যসাধক।

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধকঃ

হে রসনাপ্রিয়ে, 'মা' রসনা শব্দেরই ভিন্ন নাম। বাক্য তদ্ অংশসম্ভূত যে জন সর্বদা

ভক্ষণ করেন (বাক সংযম) তিনিই মাংস সাধক।

গঙ্গায়যমুনয়োর্মধ্যে মৎসৌ দ্বৌ চরতঃ সদা

তৌ মৎসৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ

গঙ্গা ও যমুনায় দুটি মাছ (মৎস্য) সর্বদা বিচরণশীল। যিনি মৎস্যদ্বয়কে ভোজন করেন তিনিই মৎস্য সাধক।

ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুটি নাড়িকে যোগশাস্ত্রে গঙ্গা ও যমুনা কল্পনা করা হয়েছে। শ্বাস ও প্রশ্বাস দুটি মাছ। যিনি প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে কুম্ভকের পুষ্টি উৎপাদনে সমর্থ তিনিই মৎস্য সাধক।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতাচরেৎ

আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ

সূর্যকোটিপ্রতীকাশশ্চন্দ্রকোটি সুশীতলঃ

অতীব কমনীয়শ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতঃ

যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে

মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মে মুদ্রিত মণিকর্ণিকার অভ্যন্তরে শুদ্ধ পারদবৎ আত্মা অবস্থান করছেন। যদিও এই আত্মার জ্যোতিঃ কোটি সূর্যের মত কিন্তু ইনি কোটি চন্দ্রসম স্নিগ্ধ। এই পরম পদার্থ অতীব মনোরম ও কুণ্ডলিনী শক্তিযুক্ত। যাঁর এই মহাজ্ঞানের উদয় হয়েছে তিনিই 'মুদ্রা' সাধক।

মৈথুনং পরমং ততত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যান্তকারকম্

মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধিব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্

মৈথুনকে তন্ত্রশাস্ত্রে পরম ততত্ত্ব বলা হয়েছে! মৈথুন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। মৈথুন ক্রিয়াতে সিদ্ধি ও দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু সেই মৈথুনের স্বরূপ কি রকম এখানে উল্লেখ করছি।

রেফাস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ

মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযানৌ স্থিতঃ প্রিয়ে

অকার হংসমারুহ্য একতা চ সদা ভবেৎ

তদা জাতো মহানন্দো ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্

কুমকুমবর্ণ কুণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে 'রেফ'। 'ম'-কার বিন্দুরূপে অবস্থিত আছে মহাযোনিতে। এই দুজনের মিলন হয় 'অ'-কার রূপী হংসের দ্বারা। তবেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব। যিনি যোগবলে ঐ মিলন ঘটাতে সক্ষম তিনিই 'মৈথুন' সাধক।

তন্ত্রযোগে তত্ত্বাদিন্যাসকে আলিঙ্গন, ধ্যানকে চুম্বন, আবাহনকে শীৎকার, নৈবেদ্যকে অনুলেপন, জপকে রমন ও দক্ষিণাবস্তুকে রেতঃপাত আখ্যা দেওয়া হয়েছে (আলিঙ্গন, চুম্বন, আবাহন, শীৎকার, অনুলেপন, রমন ও রেতঃ কিংবা বীর্য বা শ্রোণিত পাত এই সাতটি স্তর নরনারীর যৌন মিলন বা মৈথুনের সময় অতিক্রম করতে হয়)। পরিশেষে পঞ্চমকার বা পঞ্চততত্ত্ব সাধনা সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ উদ্ধৃতিটি দিলাম।

পঞ্চমে পঞ্চমাকারঃ পঞ্চানন সমান ভবেৎ

পঞ্চমকার সাধনায় সাধক শিব (পঞ্চানন) তুল্য হন।

দুর্গা

স্বামী দুর্গাচৈতন্যের হদিস গ্রামবাসীরা দিতে পারল না। চব্বিশ পরগণার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে এসেছি দুর্গাচৈতন্য মহারাজের খোঁজে। উনি তান্ত্রিক ও দুর্গার উপাসক। জেনেছিলাম আর এক তান্ত্রিকের কাছ থেকে। আমি নিজেও তন্ত্রসাধক ও আমার আরাধ্যাও দুর্গা তাই খুব উৎসাহ নিয়ে দুর্গাচৈতন্যের খোঁজে এসে একেবারে হতাশার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন "দুগ্‌গা দুগ্‌গা" বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরতি পথের দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় একজন ছোকরা গোছের বলল "আপনি কি দুগ্‌গা সাধুকে খুঁজছেন?" বলে যে রকম বর্ণনা দিল তাতে বুঝতে অসুবিধে হল না যে তিনিই দুর্গাচৈতন্য।

"সে তো অনেকটা পথ ফেলে এসেছেন" এই বলে গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে বিপুল উৎসাহে এদিক, ওদিক, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে পিছনে, ঈশাণ কোন, উত্তর পূর্ব দিক, ক্রোশ, বশি এই সমস্ত মিলিয়ে মিশিয়ে দুর্গাচৈতন্য নিবাসের যে নিশানা দিলেন তার মাথামুন্ডু এক বর্ণও বোধগম্য হল না। উদভ্রান্তের মত হাঁটতে হাঁটতে দিন শেষে অপরাহ্নে 'দুর্গামন্দির'-এ এলাম।

নামেই 'মন্দির', আসলে টিপিক্যাল একটা গ্রাম্য চালাঘর। সামনে ছোট সুন্দর বাগানে নানারকম গাছপালার জঙ্গলে অজস্র ফুল। ঘরের মধ্যে ছোট একটি মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তি সযত্নে সাজানো। ছিমছাম চমৎকার জায়গা। পরিবেশই মন ভরিয়ে দেয়।

"তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তো কালী। আপনি দুর্গার উপাসনা করেন কেন?" আগের অভিজ্ঞতা ('দশ মহাবিদ্যা' অধ্যায়) স্মরণ করে ভাবলাম এবার বোধহয় উনি দারুণ চটে যাবেন। কিন্তু ধীর, স্থির, শান্ত মানুষ স্বামী দুর্গাচৈতন্য কিছুক্ষণ আপন মনে হেসে বললেন "তোমাদের এই ধারণাটাই মস্ত ভুল। তা ছাড়া দুর্গা, কালী, তারা এঁদের মধ্যে প্রভেদ করতে যাও কেন? ভগবতী মহামায়া এক ও অদ্বিতীয়া। প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় উনি নানা রকম রূপ ধরেছেন।"

"আচ্ছা উনি এখন আর রূপ ধরছেন না কেন! প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে?" দুর্গাচৈতন্য আবার হাসলেন, "বড় ছেলেমানুষী প্রশ্ন তোমার। পরব্রহ্ম নিরাকার। ওঁর নানা রকম রূপ নিছক কল্পনামাত্র।"

স্বামী দুর্গাচৈতন্যের কাছে আমার দুর্গা সম্পর্কেই জিজ্ঞাস্য ছিলো। কম কথার মানুষ। অত্যন্ত সংক্ষেপে দুর্গা বিষয়ে যা বলেছেন ঠিক সে ভাবেই লিখছি।

দেবীভাগবতম্ বলছে, পরম ব্রহ্মরূপিণী প্রকৃতি পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করেছিলেন যেমন দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী। আবার এই প্রকৃতির অংশস্বরূপিণী যাঁরা তাঁরা হলেন গঙ্গা, তুলসী, মনসা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচন্ডী, বসুন্ধরা ও কালী।

দুর্গা হচ্ছেন মূল শক্তি। আদিতে তন্ত্রসাধকেরা দুর্গা মূর্তিই আরাধনা করতেন। কালী,

তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এগুলি দুর্গার বিভিন্ন রূপ যা দশ মহাবিদ্যা নামে খ্যাত।

মূল দুর্গা ও তাঁর যে কোন মহাবিদ্যার রূপই তন্ত্রমতে উপাস্য। কালক্রমে যে কারণেই হোক ওঁর মহাকালী রূপটিই তান্ত্রিকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে। কালীর জনপ্রিয়তার মূলে হয়তো দুটি কারণঃ উনি উগ্রবীর্যা ও সহজপূজ্যা। দুর্গা পূজা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং তন্ত্রে কালীসাধনা অনেক পরে এসেছে। আগে তো কালীর নির্দিষ্ট কোন রূপ ছিল না। এখন শিবের বুকের উপর দন্ডায়মানা লোলজিহ্বা যে কালীমূর্তি দ্যাখো ঐটি সৃষ্টি করেছেন তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা, বৈষ্ণব শব্দটি বিষ্ণু থেকে এসেছে। বৈষ্ণবেরা মূলত গরুড়-বাহন বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, পরে আবার কোন কারণে ওরা বিষ্ণুমূর্তি পরিহার করে বিষ্ণুর অংশসম্ভূত তাঁরই এক অবতাররূপ কৃষ্ণবন্দনা শুরু করলেন। এখনও বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণেরই উপাসক।

তন্ত্রসাধনার মূল তিনটি জিনিস তন্ত্র, মন্ত্র ও যন্ত্র। তন্ত্র স্বয়ং শিব কর্তৃক উদ্ধৃত পদ্ধতি যে প্রক্রিয়ায় শরীরের ত্রাণ হয়, কারণ দেহাতীত লোকে যেতে গেলে দেহকে আশ্রয় করেই যেতে হবে। মন্ত্রে মনের পরিত্রাণ হয় আর যন্ত্র একটি রূপ, যেটিকে কল্পনা করে তন্ত্রসাধক সাধনা করবেন।

ধর্মরাজ নচিকেতাকে শ্রেয় ও প্রেয় সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন কঠোপনিষদে। শ্রেয় হচ্ছে চরম শান্তি। যাবতীয় কামনা বাসনা ও বন্ধন থেকে মুক্তি। প্রেয় হলো ইহলোকের ভোগ জাগতিক বৃত্তি, প্রবৃত্তি সমূহের চরিতার্থতা, মানুষ যার মধ্য থেকে সুখ শান্তি আশা করে। প্রেয়র চরিতার্থতা ভোগে ও শ্রেয়র পূর্ণতা ত্যাগে। তন্ত্রসৃষ্টির বীজ প্রেয়র কামনার মধ্যেই নিহিত আর যথার্থ তন্ত্রসাধনার দ্বারা ক্রমশঃ প্রবৃত্তি (ভোগ) থেকে নিবৃত্তিতে (ত্যাগ) উত্তরণেই তন্ত্রসাধনার চরিতার্থতা।

শিবোক্ত তন্ত্র অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তববাদী। বস্তুতন্ত্রকে স্বীকার করে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভোগ ও ত্যাগ একসঙ্গে চরিতার্থ করার গুহ্য সাধনপদ্ধতি দিয়েছে তন্ত্র। শিব দুর্গাকে বলছেন— ভোগো যোগায়তে সাক্ষাদ্ দুষ্কৃতি সুকৃতায়তে, মোক্ষায়তে হি সংসারঃ কুলধর্মে মহেশ্বরি। অর্থাৎ হে দেবী, এই ভোগ ও যোগের সাধনায় দুষ্কৃতকারীও সুকৃতি এবং সংসারে থেকেও মোক্ষলাভ করে। সুতরাং তন্ত্রসাধন পদ্ধতিতে ভোগকে আশ্রয় ও আস্বাদন করে তাকে অতিক্রমের পর যোগের জগতে প্রবেশ করতে হবে। তান্ত্রিক সাধনা যৌগিক সাধনার সমান ফল দেয়; আরও অনেক সহজে ও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মোক্ষ ও মুক্তি লাভ সম্ভব যদি সাধক নিরাসক্ত হয়ে সাধনা করেন।

যাই হোক এবার দুর্গার প্রসঙ্গে আসছি।

দেব্যাহতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্

কাত্যায়নীং তুষ্টু বুরিষ্ট লব্ধা
দ্বিকাশিব বজ্রস্তু বিকাশিতাশাঃ

— শ্রীশ্রীচণ্ডী

মহাশক্তিশালী অসুর সুরেন্দ্র নিহত হবার পর দেবতারা ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিতভাবে অগ্নিকে পুরোহিত করে কাত্যায়নী দেবীর স্তব করলেন। তখন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁদের পুনর্বার রাজ্য ও সম্পত্তি ফিরে পাবার আশার আলো দেখা গেল এবং মুখমন্ডল প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

দুর্গাপূজা কারা কারা করেছিলেন সে সম্পর্কে দেবীভাগবতম্-এ উল্লেখ আছে,

প্রথমে পুজিতা স চ কৃষ্ণেন
মধুকৈটভ ভীতেন ব্রহ্মনা দ্বিতীয়ত
ত্রিপুর প্রোষিতেনৈব তৃতীয়া স ত্রিপুরারিণা
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেদ্রেণ চতুর্থে পূজিতা দেবী

প্রথমে কৃষ্ণ, দ্বিতীয় বার মধুকৈটভের ভয়ে ভীত ব্রহ্মা, তৃতীয়বার ত্রিপুরারী মহাদেব ও চতুর্থবারে স্বর্গরাজ্যচ্যুত দেবরাজ ইন্দ্র দুর্গা পূজা করেছিলেন।

তা ছাড়াও শ্রীরামচন্দ্র, রাজা সুরথ, বৈশ্য সমাধি (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ), বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ, মেধস, কাত্যায়ন ও কশ্যপ মুনি প্রমুখ দুর্গাপূজা করে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিলেন।

পুরাকালে মহাবলবান মহিষাসুর ব্রহ্মার বরে অজেয় হয়ে উঠেছিলেন। তবে দেবতারা যখন বর দেন তখন ঠিক একটা ছিদ্রও রেখে দেন। মহিষাসুর একমাত্র নারীর হাতেই বধ্য হবে—এই চাতুরীর ছিদ্রপথ ধরেই এক দেবী মূর্তির সৃষ্টি করে মহিষাসুর নিধন সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য অনেক কষ্টে। ব্রহ্মার বরে অজেয় মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে দেবতাদের বিতাড়িত করল। রাজ্যচ্যুত অমরাবৃন্দ ব্রহ্মার কাছে গেলে উনি জানালেন মহিষাসুর যেহেতু তাঁরই বলে বলীয়ান সুতরাং তার পক্ষে ঐ অসুরের নিধন সম্ভব নয়। ব্রহ্মা দেবতাদের বিষ্ণুর কাছে নিয়ে এলেন, বিষ্ণু তখন দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে আলাপ-নিরত ছিলেন।

দেবতারা যখন সেই ভয়ঙ্কর অসুরের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন সেই শুনে শান্ত যোগীশ্রেষ্ঠ শিব ক্রোধে উন্মত্ত হয় উঠলেন। তাঁর শরীর থেকে মহাতেজ নির্গত হতে লাগল এবং সেই সঙ্গে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার দেহনির্গত তেজ মিলিত হল। তারপর দেবতাগণের তনু-নির্গত তেজপুঞ্জ একত্রিত হয়ে এক অপরূপ নারী মূর্তির সৃষ্টি হল। এই মহাদেবীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে বিভিন্ন দেবতার তেজ আশ্রয় করে।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তুযোকত্রয়ং ত্বিষা
যদভূচ্ছাভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্
যাম্যোন চাভাবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা

সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবক তেজসা
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যায়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবমতেজসাং শিবা

— শ্রীশ্রীচণ্ডী

অতঃপর সর্বদেবতার দেহসঞ্জাত ত্রিভুবনে বিস্তৃত তেজঃরাশি একসঙ্গে মিলিত হয়ে একটি নারী মূর্তির রূপ নিল। সেই পরমাসুন্দরী দেবীর মুখ সৃষ্টি হল শম্ভুর তেজে, কেশরাশি যমের তেজে, বাহুসমূহ বিষ্ণুর তেজে, স্তনযুগল চন্দ্রতেজে, শরীরের মধ্যভাগ ইন্দ্রতেজে, জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় বরুণতেজে, নিতম্ব পৃথিবীর তেজে, পদযুগল ব্রহ্মার তেজে, পদাঙ্গুলিসমূহ সূর্যের তেজে, করাঙ্গুলিসমূহ অষ্টবসুর তেজে, নাসিকা কুবেরের তেজে, দন্তসকল দক্ষ ইত্যাদি প্রজাপতিগণের তেজে, তিনটি নয়ন বহ্নির তেজে, ভ্রূযুগল সন্ধ্যার তেজে, কর্ণদ্বয় বায়ুর তেজে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বকর্মা ইত্যাদির তেজও মিলিত হয়ে শিবার (দুর্গাদেবী) উৎপত্তি।

এক এক দেবতার গাত্রবর্ণ এক এক রংয়ের। যে দেবতার যে রকম বর্ণ, বৈকৃতিরহস্যের মতে, দুর্গার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণও নানাবর্ণে রঞ্জিত ছিল।

দেবতাগণের তেজঃরাশি সৃষ্ট দেবীকে (দুর্গা) দেবতারা অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার ও অন্যান্য উপাদানে সুসজ্জিত করলেন মহিষাসুর বধের নিমিত্ত।

শিব নিজ ত্রিশূল থেকে আর একটি শূল (শূলান্তর) উৎপাদন করে দেবীর হাতে দিলেন, ঠিক তেমনি ভগবান বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র থেকে চক্রান্তরে অপর একটি চক্র দিলেন। বরুণ দিলেন শঙ্খ, অগ্নি দিলেন শক্তি, পবন দিলেন একটি ধনু ও দুটি বাণপূর্ণ তূণীর, ইন্দ্র দিলেন বজ্র এবং ঐরাবতের গলার ঘন্টা, যম দিলেন কালদন্ড, বরুণ দিলেন পাশ, ব্রহ্মা দিলেন রুদ্রাক্ষের মালা ও কমন্ডলু, সূর্য দিলেন কিরণরাজি, কালভামিনী দিলেন খড়্গ ও ঢাল, ক্ষীরসমুদ্র দিলেন মুক্তাহার ও চিরনূতন দুটি বস্ত্র, দিব্যচূড়ামণি, দুইটি কর্ণকুন্তল, হস্ত সমূহের বলয়, শুভ্র ললাটভূষণ, সমস্ত বাহুতে অঙ্গদ, নির্মল নুপূর, অতি সুন্দর কণ্ঠভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলির জন্য শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরী। বিশ্বকর্মা দিলেন কুঠার সহ বহুপ্রকার অস্ত্র ও অভেদ্য কবচ, সমুদ্র দিলেন অম্লান পদ্মের মালা ও পদ্ম, গিরিরাজ হিমালয় দিলেন দেবীবাহন সিংহ ও প্রচুর রত্ন, কুবের দিলেন সদা সুরাপূর্ণ একটি পানপাত্র, বাসুকি দিলেন মণিকাঞ্চনখচিত নাগহার, এছাড়াও অন্যান্য দেবতারা দুর্গা দেবীকে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিতা করলেন।

মহাশক্তিমান মহিষাসুর ইন্দ্রজালবিদ্যা পারঙ্গম ছিল, সে বার বার রূপ বদল করে

দেবীকে বিপর্যস্ত করতে লাগল, দুর্গাও মহিষাসুরকে হত্যার নিমিত্ত নানা ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে শেষে অসুরের বুকে ত্রিশূল বিদ্ধ করে তার বিনাশে সমর্থ হয়েছিলেন।

কোথাও কোথাও এইরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে দেবী দুর্গা যখন দেখলেন মহিষাসুরকে হত্যা করা প্রায় অসম্ভব তখন তিনি নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জা পরিত্যাগ করে অসুরের সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেন। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা দুর্গার মনোমুগ্ধকর ভুবনমোহিনী নগ্ন রূপ দেখে অসুর সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হল, সেই সুযোগে দেবী মহিষাসুরকে বধ করলেন।

কিন্তু মার্কন্ডেয় পুরাণ, শ্রীশ্রীচন্ডী, দেবীভাগবতম্ বা অন্যত্র কোথাও এই ধরনের কোন ঘটনার কথা লেখা নেই।

দুর্গা সংসারসাগর ত্রাণকারী তরণীস্বরূপা। তিনি কর্ণধারের মত অজ্ঞ সেই জন্যে অসঙ্গা, অদ্বিতীয়া, দুর্জ্ঞেয়। তিনি স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী ও নারায়ণী বা অয়ণ কর্ত্রী (শ্রী শ্রীচন্ডীতে ভিন্ন অর্থে তাঁকে নারায়ণী ও বৈষ্ণবী শক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে সুতরাং শিবশক্তি ও বিষ্ণুশক্তিকে একই শক্তি কল্পনা করা হয়েছে), ত্রিগুণ দেবী আশ্রিতা সে জন্য তিনি ত্রিগুণময়ী, বৈপ্রচিত্ত দানব বধের পর তাঁর নাম হয়েছিল রক্তদন্তিকা, তিনি অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি দানে সমর্থা তাই তাঁর নাম শতাক্ষী, দেবীর দেহ থেকে শাক উৎপন্ন হয়েছিল সে জন্য ওঁর নাম শাকম্ভরী, হিমালয়ে মুনি ঋষিদের দৈত্য দানবের হাত হতে রক্ষা করেছিলেন তাই তিনি ভীমাদেবী। অরুণাক্ষ দানবকে ভ্রমর রূপে বধ করেছিলেন তাই তিনি ভ্রামরী। মহাবলবান দৈত্যদ্বয় শুম্ভ নিশুম্ভের অনুচর চন্ডমুন্ড বধ করে উনি হলেন চামুন্ডা, কাত্যা জাতি দ্বারা পূজিতা সে জন্য কাত্যায়নী, শবর জাতি কর্তৃক পূজিতা তাই তাঁর আর এক নাম শবরী, পার্বতীর কেশ হতে উৎপন্না ও পর্বতকন্যা (হিমালয়ের কন্যা) তাই তিনি কৌষিকী ও পার্বতী, ওঁর গাত্রবর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল সেজন্য হৈমবতী, কোন আবরণ (পর্ণ) তিনি দেহে রাখেন না সে জন্য উনি অপর্ণা বা নগ্না (অন্য অর্থে), এবং দুর্গম অসুরকে বধ করেছিলেন তাই তিনি দুর্গা। কারো কারো মতে দুর্গা শব্দটি দুর্গ থেকে উৎপন্ন। দেবী তাঁর আশ্রিত ভক্তগণকে দুর্গের মত দশদিক দিয়ে রক্ষা করেন। তন্ত্রে 'আত্মদুর্গ' কথাটির প্রচলন আছে অর্থাৎ নিজ দেহরূপ দুর্গের মধ্যেই দুগার অবস্থান। সাধন বলে তাঁকে দেহাতীত চৈতন্যে উত্তরণ করতে হবে।

ঐতিহাসিকদের মতে দুর্গা মানবসভ্যতার বিভিন্ন ক্রমবিকাশের কল্পিত মূর্তি। অরণ্যচারী মানুষ যখন কিছুটা সভ্য হয়ে শস্য উৎপাদনের চেষ্টা করেছে, তখনই পশুশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধিমুখী হয়েছে।

আর্যরা মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। মূর্তিপূজা দ্রাবিড় (অনার্য) সংস্কৃতিজাত। প্রথমে ওরা পুষ্প চয়ন (পু-পুষ্প, চে-চয়ন) করে দেবদেবীদের নিবেদন করত। মূল সংস্কৃতে পূজা শব্দটি নেই, পরে 'পুচে' শব্দের অপভ্রংশই 'পূজা' রূপ নিয়েছে। দুর্গাও মূলতঃ অনার্য ও বন্য জাতি পূজিতা, এদের শবর বলা হত।

শবরৈর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা

কুক্কুটৈশ্চাগলৈর্মেষৈঃ সিংহৈ ব্যাঘ্রৈঃ সমাকুলা
সুরামাংস বলিপ্রিয়া

—মহাভারত (বিরাটপর্ব)

দেবী পর্বত নিবাসিনী। শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি বন্য ও অনার্য জাতি কর্তৃক পূজিতা। তিনি যেখানে অবস্থান করেন তার চারপাশে থাকে মোরগ মুরগি, ছাগল, ভেড়া, বাঘ, সিংহ। দুর্গাদেবী শবরী, পর্ণশবরী ও নগ্নশবরী এই ত্রিরূপে শবর জাতীয় ইষ্টদে... ও মাংস দেবীর প্রিয় পানীয় ও খাদ্য। উনি বলি পছন্দ করেন। এছাড়াও শব... বনদুর্গা ও জয়দুর্গার্র পূজাবও প্রচলন ছিল।

শবরদের দুর্গা পূজায় বন্য ও অশ্লীল ভাবের ছড়াছড়ি। এর মধ্যে মদ, মাংস আহার যুবক যুবতীদের সম্মিলিত নগ্ন নৃত্য এবং অশ্লীল গালিগালাজ ইত্যাদি পূজার প্রধান অঙ্গবিশেষ। কালক্রমে দুর্গাদেবী বিভিন্ন রূপান্তরের স্তর পেবিয়ে বর্তমানের মহাঐশ্বর্যরূপিণী মূর্তিতে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক ইত্যাদিরাও ঠাঁই পেয়েছেন। দুর্গা সম্মিলিত ঐশী শক্তি। লক্ষ্মী ঐশ্বর্যদায়িনী শক্তি ও বৈশ্য। সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী শক্তি ও ব্রাহ্মণ, গণপতি গণশক্তি ও শূদ্র এবং কার্তিক শস্ত্রশক্তি ও ক্ষত্রিয়।

আদিতে দুর্গাপূজা হতো বাসন্তী রূপে বসন্তকালে। ঐ সময় উনি জাগবিতা থাকেন। শরৎকালে ওঁর নিদ্রার সময়। রাবণবধের মানসে শ্রীরামচন্দ্র অসময়ে দেবীর নিদ্রা ভঙ্গ করে (অকাল বোধন) ওঁর পূজা করেছিলেন। জনশ্রুতি এই, তারপর থেকেই শরৎ কালে দুর্গাপূজার ব্যাপক চল হয়েছে। কিন্তু বাল্মিকী রামায়ণে অকাল বোধনের উল্লেখ নেই। এটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে কৃত্তিবাসের রামায়ণে। এর কিছুটা কৃত্তিবাসের কল্পনাপ্রসূত আর কিছুটা কালিকা পুরাণ থেকে আহরিত। দুর্গাদেবীর পূজা করতে হয় ষোড়শ উপচারে (ষোডশোপচার) এই ষোলটি উপাচার হল পাদ্য (পা ধোবার জল), অর্ঘ্য (চন্দন, ধান, দূর্বা, মালা ইত্যাদি), আচমনীয় (হাত মুখ ধোবার জল), স্নানীয় (স্নানের জল), বসন, ভূষণ, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, পুনরাচমনীয়, অমৃত (প্রকৃষ্ট দেবভোগ্য বস্তু), তাম্বুল, তর্পণ ও নমস্কার।

দুর্গাপূজায় যে নবপত্রিকার প্রয়োজন হয় সেগুলো হলো কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান। এইগুলির অধীষ্ঠাত্রী দেব দেবী যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, কালী, দুর্গা, কার্তিকী, শিব, রক্তদন্তিকা, শকররহিতা, চামুণ্ডা ও লক্ষ্মীকে এই নয়টির সমন্বয়। দুর্গারূপ কল্পনা করা হয়।

দুর্গাপূজার মহাস্নান পর্বটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই স্নানে যে সমস্ত উপাচার লাগে সেগুলি হল ঠাণ্ডা জল, গরম জল, গঙ্গাজল, শঙ্খজল, সাগর জল, সরস্বতী নদীর জল, বৃষ্টির জল, ঝর্ণার জল, চন্দন জল, পঞ্চগব্য, পঞ্চমৃত, পঞ্চকষায়, চিনিপানা, হাতির শুঁড়ে খোঁড়া মাটি, শূকরের পায়ে খোঁড়া মাটি, ষাঁড়ের শিংয়ে খোঁড়া মাটি, উইপোকার ঢিবির মাটি, নদীর চড়ার মাটি, গঙ্গামাটি, নদীতীরের মাটি, সমুদ্রতীরের মাটি, চৌরাস্তার মাটি ও বেশ্যাদ্বারের মাটি।

দুর্গার বহু রূপ প্রচলিত আছে যেমন চন্ডী, জগদ্ধাত্রী, বিন্ধ্যবাসিনী, গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি, কিন্তু বাংলায় মহিষমর্দিনী রূপটির জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তন্ত্রশাস্ত্রে দুর্গাদেবীকে মহিষসাক্প্রিয়া হিসেবে বিশেষিত করা হয়েছে যার অর্থ দেবী মহিষের রক্ত পছন্দ করেন।

বৈদান্তিক বিচারে দুর্গা, দুর্গাদেবী বা শ্রীদুর্গা শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অকাল বোধনের সঙ্গে এই চিন্তাধারার একটি সামঞ্জস্য রয়েছে, বর্ষা ঋতুর পরই আসছে শরৎ। শস্যের সঙ্গে (বিশেষতঃ ধান) এই ঋতুর নিবিড় সম্পর্ক। বেদান্তে দুর্গা ও অন্নপূর্ণাকে একই দেবী হিসেবে ভাবা হয়েছে।

মনে হয় সূর্য পূজাই দুর্গা পূজা। সূর্যের বিভিন্ন রূপে অবস্থানকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি কল্পিত হয়েছে। কার্তিক যোদ্ধা। অজ্ঞতা রূপ অন্ধকারকে বিনাশ করেন। ওঁর বাহন ময়ূর কেকাধ্বনিতে প্রভাতের আগমন বার্তা জানিয়ে মানুষের আলস্য ভাঙ্গান। প্রভাত হয়েছে। বীণাবাদিনী দেবী সরস্বতী বীণার তালে ঝংকার তোলেন যা প্রতিফলিত হয় পাখিদের কণ্ঠে।

মধ্যাহ্নের সূর্য পীত বর্ণ, সৌজন্যে দুর্গাদেবীকে 'অতসীপুষ্প বর্ণাভাং' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি দশদিক আলোকিত করেন তাই দশভুজা। তিনি শক্তিরূপা ও বীরাঙ্গনা, তাই তাঁর বাহন অমিত তেজ পশুরাজ সিংহ। দেবী স্বয়ং ঐশী (দৈবী) শক্তি। তিনি পশুশক্তির সহায়তায় অসুর শক্তির বিনাশ করছেন। দুর্গাদেবী সত্ত্বগুণা। সিংহ রজোগুণ সম্পন্ন ও মহিষাসুর তমোগুণী সুতরাং সত্ত্বগুণ রজোগুণের সহায়তায় তমোগুণকে ধ্বংস করতে পারে।

অস্তকালীন সূর্যের রঙ লাল, এটি গণপতির রূপ। এই সময় তাঁর মূষিক বাহনেরা মাঠে নেমে পড়ে খাদ্য অন্বেষণে।

এর পরই প্রায় সন্ধ্যা লগ্নে লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব। সন্ধ্যার আগমন সানন্দে ঘোষণা করে নিশাচর পেঁচক। লক্ষ্মীদেবীর বাহন। পেঁচা শস্যের ক্ষতিকারক কীট, পতঙ্গ হত্যা করে ভক্ষণ করে। সেইজন্যে চাষীরা পেঁচাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে।

শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ভগবতী মহামায়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গা।

যদেয়ং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যা বিচিন্ত্যতে
যদ্ভাষা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী

—সামবেদ

যার দ্বারা এই বিশ্ব ভ্রমস্বরূপ মনে হয় যিনি যোগীদেরও চিন্তনীয়, যার তেজে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত, সেই জগন্ময়ী দেবী দুর্গাই পরম তত্ত্ব।